অবতরণিকা।

পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত লিখিব বলিয়া বহুদিন হইতে বাসনা ছিল অনুমান ছয় বৎসর অতীত হইল; একখানি ক্ষুদ্রাকারে জীবনী লিখিতও হইয়াছিল; কিন্তু ছাপা হয় নাই। সেই জীবনী খানি, কাশীর প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় দেখিয়া কাশী হইতে ছাপাইবেন মানসে গ্রন্থকারের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, কিন্তু বলিতে পারি না কি কারণে তাহা ছাপা হয় নাই। দুই বৎসর পরে সেই পাণ্ডুলিপি গুলি পুনরায় ফিরাইয়া লওয়া হয়; এতাবৎ কাল তাহা তদবস্থাতেই ছিল। সম্প্রতি বরিজহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্বচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের উৎসাহে আমরা এই গুরুতর কার্য্যে পুনরায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কৃতকার্য্য হওয়া না হওয়া ভগবানের ইচ্ছা।

জীবনবৃত্তান্ত লেখা কঠিন হইলেও অসাধ্য নহে। কারণ ঘটনাবলীর যথাযথ বিন্যাস করাই জীবনীর উদ্দেশ্য। কিন্তু পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত সেরূপ নহে. সাধুই হউন আর অসাধুই হউন, প্রত্যেক ব্যক্তি কোন প্রকার নিয়মে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কেহ সত্যবাদী কেহ বা হয় মিথ্যাবাদী, কেহ কপটী কেহ সরল অথবা কাহার জীবনে কোন কোন ভাব মিশ্রিত আছে। পরমহংসদেবের জীবনে সে প্রকার কোন বিষয় ধরিতে পাওয়া যায় না, তাঁহার কার্য্যকলাপ অতিশয় বিচিত্র প্রকার, সহজে কিম্বা অতিশয় চেষ্টা করিলেও তাহার প্রকৃত ভাব জ্ঞাত হওয়া যায় না। তাঁহার জীবনের যে দিক দেখা যায় সেই দিকেই আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহাতে কোন বিষয়ের অভাব ছিল না। যে ভাবে যে কেহ তাঁহার নিকট পরামর্শ চাহিয়াছেন সেই রূপেই তাঁহার দ্বারা সহায়তা লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কখন গভীর জ্ঞান সম্পন্ন গুরু রূপে, কখন বরদাতা ইষ্টদেবরূপে, কখন বৈজ্ঞানিক সাধুরূপে কখন ধী সম্পন্ন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরূপে, কখন স্নেহময়ী মাতারূপে কখন ন্যায়বান পিতারূপে প্রকাশ পাইয়াছেন।

তাঁহার এই ভাব-বৈচিত্র দেখিয়া, নিতান্ত সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমরা কোন কারণ বা ভাবান্তর বাহির করিতে পারি না

ব কি মন প্রাণ যে হরণ করিয়া লইতেন। কোন কার্য্য করিবার আর ধকার থাকিত না।

আমরা পাছে প্রতারিত হই, এ ভাবনা বিলক্ষণ ছিল। মনুষ্যের কর্ত্তব্য তাহাও এক প্রকার পাঁচজনের মত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। বিজ্ঞান, নাদি দ্বারা বিশুদ্ধ ভাব বিশিষ্ট যে প্রকারে ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা তাহাও নিয়া রাখিয়াছিলাম, কি করিতে আছে এবং কি করিতে নাই তাহাও জানা ম; কিন্তু কি করিব! ঈশ্বর নাই বলিয়াই বিশ্বাস ছিল এবং স্বভাব ব্যতীত ার কিছু স্বীকার করা না করা একই কথা বলিয়া ধারণা ছিল; তিনি সে কল বিকৃত করিয়া দিলেন। আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি আর তাঁহার নিকট ন পাইল না, পূর্ব্বে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম তাহা সম্পূর্ণ াত্মক বলিয়া ধারণা হইয়া গেল। তাঁহাকে যাহা বলিবার নয় আমরা হাও বলিয়া ফেলিলাম।

এই প্রকার জীবনী লেখাও কঠিন এবং পাঠ করাও কঠিন। পাঠক ঠিকাগণ! আপনারা যে প্রকার সাধারণ জীবন চরিত পাঠ করিয়া থাকেন, হা সে প্রকার নহে। আমরা যেমন প্রথমে পরমহংসদেবকে মনে করিয়া- লাম তাহার পর সে সংস্কার পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, আপনাদের দশাও ইরূপ হইবে। বর্ত্তমানকালে পরমহংসদেবের জীবনীর ন্যায় জীবনী কহ কস্মিন কালে আশাও করেন নাই এবং পাইলেও বিশ্বাস হইবে না। াজ কাল যেমন বাজার গ্রন্থকারেরা প্রায় সেইরূপে পরিচালিত হইয়া াকেন। সে স্থলে তাহাদের সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই গ্রন্থকার আপনার ম সফল জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং পুস্তকের সংস্করণের উপর সংস্করণ ইয়া যায়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যও তাহা নহে এবং আমাদের পাঠক াঠিকারাও তাহা আশা করিতে পারেন না।

জীবনী লিখিতে হইলে কাহারও মুখাপেক্ষা করা যায় না। যাহা ঘটনা াহার অপলাপ করিলে বিষম দোষ ঘটিয়া থাকে। এই নিমিত্ত অনেক গুহ্য কথাও আমরা ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছি।

পরমহংসদেবের সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইল তাহার কিয়দংশ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং কিয়দংশ তাঁহার শ্রীমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে পরমহংসদেবের আত্মীয় শ্রীহৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন আমরা সেইরূপই লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। এই

বিষয়টী সত্য কি না অবগত হইবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু মনমোহন মিত্র মহাশয় পরমহংসদেবের স্বদেশে গমন পূর্ব্বক, তথাকার লোকের নিকট সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ের কথাই পোষকতা করিয়াছেন।

পরমহংসদেবের কার্য্য কলাপের ধারাবাহিক বিবরণ লিখিবার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাহা পারিলাম না। তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা তিনি ভিন্ন অপরে কেহ জানেন না। এমন কি হৃদয় তাঁহার সহিত একত্রে থাকিয়াও, বিশেষ কিছুই অবগত নহেন। দক্ষিণেশ্বরের প্রাচীন ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি তাঁহারা কিছুই বলিতে পারেন নাই। পরমহংসদেব, দিন তারিখ মাস সন কাহাকে বলিত তিনি জানিতেন না। কোন সাধনের পর কি করিয়াছেন, তিনি আমাদের যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

তিনি আমাদের অনেক কথাই কহিয়াছেন কিন্তু তৎসমুদয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত করা অসম্ভব এবং সাধারণের সমক্ষে সে সকল গভীরতম কথা বলায় কোন ফল নাই। কার্য্যক্ষেত্র দেখিয়া ভবিষ্যতে একখানা কেন, বোধ হয় ভূরি ভূরি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

পাঠক পাঠিকাগণ! আপনাদের প্রতি আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। এই রামকৃষ্ণ চরিত পাঠ করিতে যদ্যাপি আপনাদের কোন স্থানে সন্দেহ কিম্বা জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা হইলে সেই বিষয় লিখিয়া পাঠাইলে আমরা অতি আনন্দের সহিত সে সম্বন্ধে বলিবার যে টুকু শক্তি থাকিবে তাহার ত্রুটি হইবে না।

কলিকাতা
১১নং মধুরায়ের লেন।
রথযাত্রা সন ১২৯৭ সাল।

ভক্তানুগৃহীত
শ্রীরামচন্দ্র দত্ত দাসস্য।

অশুদ্ধ সংশোধন।

—•—

পৃষ্ঠা		পংক্তি		অশুদ্ধ		শুদ্ধ।
৪	...	১৭	...	শূত্র	...	শূদ্র।
১১	...	১৯	...	বশ্লিষ্ট	...	বিশ্লিষ্ট।
১২	..	২৫	...	অধিক্যতা	...	আধিক্যতা।
২৬	...	৮	...	মদ্য,	...	(মদ্য,)
৩২	...	৪	...	দেবী	...	দেবীর।
৪৩	...	৪	...	মহাভবের	...	মহাভাবের।
৪৫	...	১৯	...	গুপ্তভাবে	...	গুপ্তভাবে।
৪৮	...	১৩	...	সমান্তরে	...	সময়ান্তরে।
৫৪	...	৯	...	রাখিয়া	...	রাখিয়াছিলেন।
৫৫	...	২১	...	পরিক্রম	...	পরিভ্রম।
৭১	...	১০	...	পারে	...	পারেন।
৮৩	...	২	...	ন্যাদ	...	ন্যায়।
৮২	..	৩২	...	যাত্রায়	...	যাত্রার।
৯২	...	২৩	...	রাজাবাহাদুরের	...	রাজাবাহাদুরকে।
৯৩	...	১২	...	কলিকাতায়	...	কলিকাতার।
৯৩	...	৪	...	দেবেকে	...	দেবকে।
৯৫	...	২	...	কুসস্কারের	...	কুসংস্কারের।
৯৮	...	২০	...	সেবা	...	সেবাৎ।
১০৮	...	১১	...	হৃদ	...	হ্রদে।
১৪৮	...	২	...	মথ্যে	...	মধ্যে।

পাঠক মহোদয়গণ অগ্রে গ্রন্থখানির অশুদ্ধ সংশোধন করিয়া লইয়া পশ্চাৎ অধ্যয়ন করিবেন নচেৎ রসভঙ্গ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। যে সকল মুদ্রিত প্রমাদ সহজে জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা প্রদত্ত হইল না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের

জীবন-বৃত্তান্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতি শ্রীপুর কামারপুকুর গ্রামে শ্রীখুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস ছিল। প্রবাদ আছে যে, এই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও প্রকৃত জাপক ছিলেন। তিনি এমন ভক্তি সহকারে তাঁহার ইষ্ট মূর্ত্তি রঘুবীরের পূজার্চ্চনাদি করিতেন যে, বাহিরের লোকেরা ঠাকুর যেন প্রত্যক্ষ হইয়া পূজা গ্রহণ করিতেছেন, এরূপ অনুমান করিত। আরও প্রবাদ আছে যে, তিনি একটি নির্দ্দিষ্ট সরোবরে প্রত্যহ স্নান করিতেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহার স্নান সমাপন না হইত, সে পর্য্যন্ত সেই পুষ্করিণীতে অন্য কোন ব্যক্তি পাদ নিমজ্জিত করিতে সাহস করিত না। তাঁহার তপঃ প্রভাবে তদ্‌পল্লিস্থ সকলেই বশীভূত ছিল এবং সহসা কেহই তাঁহার সমীপে অগ্রসর হইতে পারিত না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুশীলা ও সদ্‌গুণ সম্পন্না এক সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তাঁহার এমনই দয়ার্দ্র হৃদয় ছিল যে, কাহাকে ক্ষুধাতুর দেখিলে, গৃহে যে কোন দ্রব্য থাকিত, তাহা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভোজন না করাইয়া, তিনি কোন মতে স্থির হইতে পারিতেন না। তাঁহার গর্ভে তিন পুত্রসন্তান জন্মে। জ্যেষ্ঠ রামকুমার মধ্যম রামেশ্বর এবং পরমহংসদেব সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন।

১৭৫৬ শকাব্দার ১০ই ফাল্গুণ, শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া তিথি বুধবারে পরমহংস দেব ভূমিষ্ঠ হন। *

---

* রামকৃষ্ণের জন্ম এবং বাল্যকালের অবস্থা সম্বন্ধে আশ্চর্য্য কিম্বদন্তি আছে। "ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গয়াধামে গমন করিয়া একদিন রজনী যোগে স্বপনে দেখিলেন, যেন একটী চতুর্ভূজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী, তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন; "দেখ, আমি তোমার পুত্ররূপে জন্ম

গ্রহণ করিব।" চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল এবং মনে মনে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। যৎকালে তিনি গয়াধামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী একদিন নিজগ্রামের বাটীর সন্নিকটে অপর দুইটী প্রতিবাসিনীর সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন। ঐ বাটীর সন্নিধানে একটী শিবের মন্দির আছে। সেই শিবালয়ের দিক্ হইতে ঘনীভূত বায়ু তাঁহার উদর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ কথা সঙ্গিনীদ্বয়কে কহিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজনের নাম ধনি ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার গর্ভের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় বাটীতে আসিয়া এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, না স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ করিলেন, অথবা তাঁহার স্বপ্ন বৃত্তান্ত কাহাকেও খুলিয়া বলিলেন। গর্ভকালে রামকৃষ্ণের জননীর রূপলাবণ্যের ইয়ত্তা ছিল না। পাড়ার মেয়েরা বলিত, "মাগির শেষ বয়সে এমন রূপ হইল কেন? বোধ হয় এইবার মরিবে।" তিনি সকলের কাছে বলিতেন যে, "আমি কত রকমের দেবতা ঠাকুর দেখিতে পাই। এত সন্তানাদি হইয়াছে, কিন্তু এমন কখন দেখি নাই।" লোকেরা মাগি পাগল হইয়াছে বলিয়া উপহাস করিত। দশমাস দশদিন পূর্ণ হইলে রামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতা তাঁহার নাম গদাধর রাখিলেন, লোকে সেই জন্য গদাই বলিয়া ডাকিত। ইতিপূর্ব্বে ক্ষুদিরামের অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমার তখন উপযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দশকর্ম্মান্বিত ও সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার উদার প্রকৃতির জন্য অনেকে তাঁহাকেও পাগল বলিত। রামকৃষ্ণের জন্মকাল হইতে রামকুমারের উপার্জ্জনাদি অধিক পরিমাণে হইতে লাগিল। বাটীতে দ্রব্যাদির আর অভাব রহিল না। তিনি এইরূপ সহসা অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতে দেখিয়া সর্ব্বদাই কহিতেন যে, আমার বোধ হয় আমাদের বাটীতে কোন দেবতা আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহা না হইলে এ প্রকার সংসারে সুখ-স্বচ্ছন্দতা কি রূপে হইল। একদিন ক্ষুদিরাম এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিয়াছিলেন যে তোমরা একটা বিপদ না ঘটাইয়া ছাড়িবে না। যাহা হয় হইয়াছে, ওকথা কাহার নিকট বলিতে নাই।"

"রামকৃষ্ণ যখন চতুর্থ কিম্বা পঞ্চম মাসে উপনীত হইয়াছেন, একদিন তাঁহার মাতা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার শিশু সন্তান নাই একটি আট দশ বৎসরের বালক শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তিনি অতি ব্যস্তে চিৎকার করিয়া বাহিরে আসিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই চিৎকার শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিলে পর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন, এ সকল হইবে তাহা আমি জানি, তুমি গোলমাল করিও না। মাতার প্রাণ কি তাহাতে শান্তিলাভ করিতে পারে? তিনি পুনরায় কহিলেন যে, "তুমি রোজা আনাইয়া একটা উপায় কর, বালককে ভূতে পাইয়াছে।" রঘুবীর আছেন তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

পরমহংসদেব বাল্যকালে কিঞ্চিৎ কৃশকায় ছিলেন। তিনি দেখিতে উজ্জল গৌরবর্ণ সকলের প্রিয় এবং নিতান্ত মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহাকে সকলে গদাই বলিয়া ডাকিত; কিন্তু প্রকৃত নাম রামকৃষ্ণ ছিল। এই গ্রামে ধর্ম্মদাস লাহা নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার পুত্র গঙ্গাবিষ্ণু লাহা। ক্ষুদিরাম ইহার সহিত রামকৃষ্ণের সেঙ্গাৎ (পল্লিগ্রামের লোকেরা যাহার সহিত বিশেষ বন্ধুতা করেন তাহাকে কখন কখন সেঙ্গাৎ কহিয়া থাকেন) পাতাইয়া দেন। রামকৃষ্ণ সেই জন্য লাহাদের বাটীতে সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন। গঙ্গাবিষ্ণুর মাতা রামকৃষ্ণকে গদাধর বলিয়া ডাকিতেন। যখন তিনি যে দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন তিনি অগ্রে গদাধরকে খাওয়াইতেন এবং সর্ব্বদা বলিতেন "হ্যাঁরে গদাধর তোকে কেন এত ভালবাসি বল্ দেখি। তোকে না দেখ্‌লে প্রাণ চঞ্চল হ'য়ে উঠে। কখন কখন তোকে ঠাকুর বলে জ্ঞান হয়।" রামকৃষ্ণ একটু হাঁসিয়া চলিয়া যাইতেন।

এই লাহা বাবুদের অতিথিশালা ছিল। (শুনিয়াছি অদ্যাপি আছে) সুতরাং নানা ভাবের নানাবিধ অতিথি তথায় আসিতেন। রামকৃষ্ণ অতিথি-দিগের সহিত বসিয়া থাকিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে তিলকাদি পরাইয়া দিতেন এবং যে সকল ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করিতেন তাহা তাঁহাকে খাওয়াইতেন। মধ্যে মধ্যে অতিথিরা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণের পিতা মাতাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের বাটীতে যাইতেন: এক দিন রামকৃষ্ণ একখানি নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া অতিথিদিগের নিকট গিয়া-ছিলেন। তিনি তথায় যাইয়া সেই বস্ত্র খানিকে খণ্ড খণ্ড পূর্ব্বক আপনি কৌপিন পরিধান করেন এবং অপর খণ্ড হস্তে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জননীর নিকটে প্রদান করিয়া কহিলেন, "তোমরা দেখ কেমন আমি সাধু সেজেচি। আজ সাধুরা আমায় সাজিয়ে দিয়েছে, রুটি খাওয়াই-য়াছে, আমি ঘরে কিছুই খাব না।"

রামকৃষ্ণকে এইরূপে যে আদর করিয়া লইয়া যাইত, জাতি বিচার না করিয়া তাহারই প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিতেন। লেখা পড়া সম্বন্ধে একেবারে কিছুই আস্থা ছিল না। (তাঁহার হস্ত লিখিত একখানি রামায়ণ আছে তাহাতেই তিনি যে লেখা পড়া কিছু জানিতেন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।) এজন্য বাঙ্গালা ভাষাও ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই। যখন তাঁহাকে

পাঠশালায় প্রেরণ করা হয়, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, "লেখা পড়া শিখিয়া কি করিব? তাহার ফল ত কেবল চাল কলা; এমন বিদ্যা আমি শিখিব না।" তাঁহার মেধা শক্তি এত প্রবল ছিল যে, যখন কোন বিষয় শ্রবণ করিতেন, তাহা তৎক্ষণাৎ অভ্যাস হইয়া যাইত। এই রূপে যাত্রা, কীর্ত্তন, চণ্ডীর গীত ও নানাবিধ সঙ্গীতাদি তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। প্রতিবেশীরা তাঁহার নিকট সময়ে সময়ে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সুখী হইতেন। তাঁহার কণ্ঠ অতি সুমধুর ছিল। যাঁহারা তাঁহার বয়োবৃদ্ধ কালে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা বালক কালের অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে অনুমান করিতে পারিবেন।

রামকৃষ্ণের ভূমিষ্ঠকাল হইতে কিশোর কাল পর্য্যন্ত ধনি নাম্নি এক কর্ম্মকারের কন্যা তাঁহাকে লালন পালন এবং পুত্রাধিক স্নেহ করিত। ধনি স্নেহ বসে রামকৃষ্ণ যে ব্রাহ্মণ কুমার তাহাও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। ধনি যখন যাহা ভক্ষণ করিত তাহা রামকৃষ্ণকে না দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। রামকৃষ্ণের জ্ঞান হইলে পর, ধনি বলিয়াছিল যে "বাবা তোমার পৈতের সময় আমি তোমাকে ভিক্ষা দিব।" রামকৃষ্ণ স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে যখন উপনয়নের দিন উপস্থিত হইল রামকৃষ্ণ ধনির নিকট অগ্রে ভিক্ষা চাহিলেন। ধনি শূদ্র জাতি, ব্রহ্মচারিকে কি বলিয়া ভিক্ষা দিবে এই হেতু রামকুমার আপত্তি উত্থাপন করিলেন কিন্তু পরিশেষে রামকৃষ্ণের ইচ্ছাই ফলবতী হইয়াছিল। ধনি তদবধি রামকৃষ্ণের ভিক্ষা মাতা হইলেন।

কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক প্রায় সমুদয় ঘটনাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। সময়ে সময়ে রাখাল বালক ও অন্যান্য বয়স্যদিগের সমভিব্যাহারে মাঠে গমন করিতেন। তিনি নিজে কৃষ্ণ সাজিতেন এবং অন্যান্য বালকদিগকে শ্রীদাম সুবল ইত্যাদি নাম প্রদান করিয়া বৃন্দাবনের ভাব-ক্রীড়া করিতেন। যাঁহারা দূর হইতে সেই সকল অবলোকন করিতেন, তাঁহারা চমৎকৃত ও আনন্দে বিমোহিত হইয়া যাইতেন। দেবতা ঠাকুরের প্রতি রামকৃষ্ণের ভক্তি ছিল এবং স্বহস্তে মৃত্তিকার ঠাকুর গড়িয়া পূজা করিতেন ও সময়ে সময়ে তিনি তদ্ভাবে অচেতন হইয়া পড়িতেন। এই রূপে প্রায় দশ বার বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কলিকাতার অন্তঃপাতী ঝামাপুকুর নামক স্থানে একটি চতুষ্পাঠী ছিল। তিনি লেখা পড়ার উদ্দেশ্যে তথায় আসিয়া অবস্থিতি করেন। কিন্তু এ স্থানে আসিয়াও পাঠ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হন নাই। পাড়ার ভদ্র মহিলারা তাঁহাকে বিশেষ ভাল-বাসিতেন এবং তাঁহার নিকট গীত শ্রবণ করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন। একে ব্রাহ্মণ তাহাতে বালক, দেখিতে রূপবান্, মিষ্টভাষী এবং মধুর গীত গান করিতে পারিতেন; সুতরাং, পাড়ার প্রত্যেক হিন্দু মহিলার নিকট সমাদৃত হইতেন।

সন ১২৫৯ সালের আষাঢ় মাসে কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের অন্তঃপাতী জানবাজার নিবাসিনী মাড়-কুল-গৌরবা বিখ্যাত নামা রাসমণি দাসী দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে কালী ও রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিদ্বয় তাঁহার গুরুর নামে স্থাপন করিয়া, পরমহংসদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সুদক্ষ এবং সুপণ্ডিত জানিয়া, পূজাকার্য্যে বরণপূর্ব্বক দক্ষিণেশ্বরে প্রেরণ করেন। পরমহংসদেবও অগত্যা জ্যেষ্ঠের সমভিব্যাহারে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যে দিবস উক্ত দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত হন, সেই দিবসে তথায় জনাকীর্ণ হইয়াছিল। ধূমধামের ইয়ত্তা ছিল না। ভোজ্য পদার্থ অপরিমিত পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু পরমহংসদেব তাহা কিছুই স্পর্শ করেন নাই। তিনি সমস্ত দিবস অনাহারে থাকিয়া রাত্রিকালে নিকটস্থ এক মুদীর দোকান হইতে এক পয়সার মুড়্‌কী ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি কি জন্য যে মন্দিরের সামগ্রী স্পর্শ করেন নাই, আমরা তাহার কোন কারণ প্রদর্শন করিতে পারিলাম না।

দক্ষিণেশ্বর কলিকাতার উত্তর অনুমান তিন ক্রোশ দূর হইবে। ঠাকুর-বাটীর উদ্যান গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। প্রবাহিনী স্বভাবতঃই প্রীতি-প্রদ। বিশেষতঃ হিন্দুগণ যখন জাহ্নবীর তীরে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় ভক্তি ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সেই সঙ্গে দেব মন্দির। যাহার প্রকাণ্ড আকার,

শিল্প কার্য্য প্রভৃত মনোহর দৃশ্য ও গম্ভীর ভাব প্রত্যক্ষ করিলে, এমন কি ভিন্ন শ্রেণীর দর্শক মণ্ডলীরও চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া যায়। এই দেব উদ্যানের উত্তরাংশে জাহ্নবী-কূলে দীর্ঘকালব্যাপী অতি বিস্তীর্ণ একটি বটবৃক্ষ আছে। ইহার কাণ্ড প্রকাণ্ড, শাখা প্রশাখা দ্বারা অনুমান এক বিঘা জমি সমাচ্ছাদিত হইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে তাহার শাখাদিগের অবলম্বন স্বরূপ এক একটি ঝুরি লম্বমান্ হইয়া গুঁড়ী বিশেষ হইয়া গিয়াছে। ইহার দক্ষিণ ভাগে এক খানি কুটীর ছিল। এক্ষণে সে স্থানে ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ হইয়াছে। এই বটবৃক্ষের উত্তর পূর্ব্বাংশে একটি বেল গাছ আছে। এই বৃক্ষদ্বয় পরমহংসদেবের জীবন চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সেই জন্য উহারা উল্লেখিত হইল।

রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া, প্রথমে বেশকারী পরে রাধাকৃষ্ণ পূজায় ব্রতী হইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার লোকান্তর গমনে রাসমণি দাসী তাঁহাকে কালীপূজায় নিযুক্ত করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রামকৃষ্ণ যখন পঞ্চদশ কিম্বা ষোড়শ বর্ষে উপনীত হন, সেই সময়ে তাঁহার অভিভাবকেরা বিবাহের জন্য অনুষ্ঠান করেন। রামকৃষ্ণ বিবাহের কথা শুনিয়া, কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই; বরং তিনি তাহাতে আনন্দিত হইয়াছিলেন। বিবাহ কি, কেন বিবাহের প্রয়োজন তাহা তিনি কিছুই জানিতেন না। বিশেষতঃ ঈশ্বরানুরাগী ১৫।১৬ বৎসরের বালকের পক্ষে কখনই সম্ভবনীয় নহে।

রামকৃষ্ণের স্বদেশের নিকটস্থ জয়রামবাটী নামক গ্রামে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে তাঁহার পাত্রী স্থিরীকৃত করা হয়। পাত্রীর নাম শ্রীমতি সারদামণি দেবী। সারদামণির বয়ঃক্রম তখন আট বৎসর মাত্র।

বিবাহের দিন স্থির হইলে, রামকৃষ্ণ আনন্দচিত্তে দেশে শুভযাত্রা করেন এবং শুভলগ্নে বিবাহাদি সমাধা করিয়া, পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বিবাহের পর সময়ে সময়ে তাঁহার স্ত্রীর কথা মনে পড়িত। কখন কখন শ্বশুরালয়ে গমন করিবার জন্যও মনে বাসনা হইত; কিন্তু মনের সাধ মনে উঠিয়া, মনেই ক্রীড়া করিত এবং উহা মনেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যাইত।

রামকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে, মনুষ্যদিগের বিবিধ সংস্কার আছে। যথা, কর্ণবেধ, চূড়াকরণ, দীক্ষা, যজ্ঞোপবীত, বিবাহ ইত্যাদি। বিবাহ কালীন তাঁহার মনে মনে ঐ ভাব বলবতী ছিল। এই জন্যই বোধ হয়, পরিণয় কালে তিনি কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করেন নাই। বিবাহের পর যে শ্বশুরালয়ে গমনের অভিলাষ হইত, তাহার কারণ কিছুই তিনি জানিতেন না। বোধ হয়, ঠাকুর বাটীর অন্যান্য ব্যক্তিরা যখন ঐ সম্বন্ধে কথোপকথন করিত, তখনই তাঁহারও মনে শ্বশুরালয় উদ্দীপন হইয়া যাইত; কিন্তু তাঁহার আশা আর ফলবতী হয় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—*—

রামকৃষ্ণ পূজায় ব্রতী হইয়া, অতি বিচিত্র ভাবে তাহা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি নিতান্ত আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে দেবীর পূজা করিতেন। কখন তাঁহাকে সুবাসিত পুষ্প মাল্যাদির দ্বারা মনের সাধে সুসজ্জিত করিতেন, কখন বা দেবীর চরণ কমলে কমল কুসুম অথবা বিল্ব জবা স্থাপন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব চরণ শোভা সন্দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইতেন। কখন বা রামপ্রসাদী, কমলাকান্তের ও সময়ান্তরে নরেশচন্দ্র প্রভৃতি শক্তি সাধকগণ বিরচিত শক্তি বিষয়ক গীতগুলি গান করিতেন। কখন বা কৃতাঞ্জলী বদ্ধ হইয়া সরোদনে বলিতেন, "মা! আমায় দয়া কর মা, তুই মা রামপ্রসাদকে দয়া কর্‌লি তবে আমায় কেন দয়া কর্‌বি না মা! মা আমি শাস্ত্র জানি না, মা! আমি পণ্ডিত নই মা, মা! আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই জানিতে চাহি না, তুই আমায় দয়া কর্‌বি কি না বল্? মা আমার প্রাণ যায় মা, আমায় দেখা দাও; আমি অষ্ট সিদ্ধাই চাই না মা, আমি লোকের নিকট মান চাই না মা, লোক আমায় জানুক, মানুক, গনুক এমন সাধ নাই মা, তুই আমায় দেখা দে।" রামকৃষ্ণ এইরূপে

প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আরতী সমাপন করিয়া একাকী দেবীর সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেন এবং দর্শনের জন্য কতই প্রার্থনা করিতেন। যখন ভক্তেরা দেবদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে যে কি অপূর্ব্ব ভক্তির উদ্রেক হয় তাহা ভক্ত মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। উহা বাক্য অথবা শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা কথনই সাধ্যসঙ্গত নহে। এমন দেব-মন্দিরে দেবীর সম্মুখে, তাহাতে নির্জ্জন স্থান, আবার তদসহ বালকের সরল ও অকপট বিশ্বাস এবং অনুরাগ। যে যে অবস্থা অনুকূল হইলে ঈশ্বর দর্শন হয় অর্থাৎ অনুরাগ এবং অকপট বিশ্বাস রামকৃষ্ণের তাহাই হইয়াছিল। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁহার চরণে মনার্পণ করা প্রত্যেক ধর্ম্মের মূল কথা, রামকৃষ্ণও তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি দিবা রজনী মা কালীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। ক্রমে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যখন প্রাণ কাঁদিল, যখন ব্রহ্মময়ী দর্শনের জন্য প্রাণ ছুটিল, যখন জগতের সমুদয় বস্তু হইতে প্রাণ বিদায় গ্রহণ করিল, যখন প্রাণ মাতার দর্শনাভাবে ওষ্ঠাগত হইল, তখন অন্তঃর্যামিনীও তাহা জানিলেন। একদিন রামকৃষ্ণ দেবীর সম্মুখে উপবেশন করিয়া "মা আমায় দেখা দে মা" বলিয়া রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি সহসা উন্মত্তের ন্যায় হইরা পড়িলেন। মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় আরক্তিম হইল, চক্ষের দৃষ্টি বহির্জ্জগত হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল; অবিরাম নয়নধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যে স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই স্থান যেন প্লাবিত হইতে লাগিল। অন্যান্য লোকেরা তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া গেল। পর দিন দিবাভাগে নয়নোন্মীলন করিতে পারিলেন না। মুখে আহার তুলিয়া দিলে তবে ভোজন করিলেন। শৌচ প্রস্রাব অজ্ঞাতসারে হইয়া যাইত, কিন্তু কেবল মা বলিতে পারিতেন এবং মা মা করিয়া রোদন করিতেন। রামকৃষ্ণের এই অবস্থা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তাঁহার এই অবস্থাটি যেন মাতৃস্তনপায়ী বালকের ন্যায় হইয়াছিল। শিশু যেমন তাঁহার জননীকে না দেখিতে পাইলে মা! মা! বলিয়া চিৎকার করিয়া থাকে, রামকৃষ্ণকে দেখিলে অবিকল তাহাই মনে হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সেই সময়ে কি অবস্থা লাভ হইয়াছিল ও মনের ভাব কিরূপ ছিল তাহা আমরা কি জানিব এবং কি রূপেই বা বর্ণনা করিব। তবে বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া শাস্ত্রের সাহায্যে, সাধুদিগের বাক্য-

ক্রমে এবং গুরু প্রসাদে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, তিনি বিরহাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। কারণ একবার সেই সচ্চিদানন্দ-ময়ীর জ্যোতিঘন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, তাঁহার সুন্দর ছবি, অলৌকিক রূপলাবণ্য, অনির্ব্বচনীয় ভাব কান্তি, জগদানন্দের ঘনীভূত রূপ দেখিয়া তাহাতে বঞ্চিৎ হইবামাত্র বিরহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিরহাবস্থার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। ঈশ্বরকে দর্শন না করিয়া, তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি না করিয়া, তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান না পাইয়া, কেবল নাম শ্রবণ পূর্ব্বক যখন মনুষ্যগণের প্রবল অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে, তখন তাঁহাকে একবার দেখিলে, অথবা তাঁহার শক্তির বিশেষ কোন প্রকার প্রকাশ দেখিতে পাইলে, অনুরাগ যে পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, তাহার কিছুই বিচিত্র নাই। রামকৃষ্ণ ইতি পূর্ব্বে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ না পাইয়াই যখন অনুরাগের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তক্ষন দর্শনের পর কি কেবল চক্ষের দেখাতে তাঁহার প্রাণে তৃপ্তি লাভ হইতে পারে? আমরা যদ্যপি কোন মহাত্মার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হই তাহা হইলে তাঁহার অন্তত দুটো কথা না শুনিয়া কখনই স্থানান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা হইবে না। মহান্ হইতে মহান্ যিনি, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম যিনি, আনন্দ হইতে পরমানন্দ যিনি, সৎ হইতেও সৎ যিনি, মঙ্গল হইতে পরম মঙ্গল যিনি, তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিয়া রামকৃষ্ণ যে প্রেমাকাঙ্ক্ষী না হইবেন তাহা চিন্তা করিয়া সাব্যস্থ করিতে হইবে না। যে রূপ বিচারের অতীত, বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্যক্ রূপে যাঁহার বৃত্তান্ত দিতে পারে না; যাঁহার মহিমা অপার, অনন্ত এবং অতুল; যাঁহার সম্বন্ধে অগণন শাস্ত্র অগণন মত, অগণন ভাব বিভিন্ন অর্থে পরিচয় দিতেছে। বেদে যাঁহাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনাদি বলিয়া নিরস্ত হইয়াছে; যাঁহার দর্শন ষড়দর্শনে এক প্রকার অদর্শন করিয়া দিয়াছে। পুরাণে যাঁহার কত রূপের বর্ণনা করিয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁহার প্রেমের কাহিণীর স্রোত চালাইয়াছে; সেই জগৎপতি জগদীশ্বরকে দর্শন করিয়া মন মধ্যে যে কি প্রকার আনন্দ ও উৎসাহ সমুত্থিত হইবার সম্ভাবনা তাহা সাধারণ মনের সম্পূর্ণ বহির্ভূত কথা।

রামকৃষ্ণ এই উন্মত্তাবস্থায় ক্রমান্বয়ে ৬ মাস ছিলেন। শাস্ত্রে বিরহের যে সকল লক্ষণ উল্লেখিত আছে তদ্সমুদয়ই তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে তাঁহার এই অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে সাম্য হইয়া আসিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রামকৃষ্ণ উন্মত্তাবস্থা অতিক্রম করিয়া যখন সহজ ভাব প্রাপ্ত হইলেন তখন তাঁহার সাধন কার্য্য আরম্ভ হইল। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন যে, "ফুল না হইলে ফল হয় না কিন্তু অলাবু ও কুমড়াদির অগ্রে ফল বহির্গত হয়। তদনন্তর ফুল ফুটিয়া থাকে।" রামকৃষ্ণের অগ্রে ঈশ্বর দর্শন এবং তদনন্তর সাধন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল।

ঈশ্বর সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মনকে যেরূপে প্রস্তুত করিতে হয় রামকৃষ্ণ তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে উদয় হইল যে অভিমান বা অহঙ্কার ঈশ্বর পথের কণ্টক এবং আবরণ স্বরূপ। কারণ মনে যদ্যপি অহং জ্ঞান নিয়ত পরিপূর্ণ থাকে তাহা হইলে সে স্থানে ঈশ্বরভাব কখনই প্রবেশ করিতে পারিবে না। তিনি তন্নিমিত্ত প্রত্যহ সরোদনে মাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন "মা আমার অহং নাশ করিয়া দাও? আমার আমি বিলুপ্ত করিয়া তথায় তুমিই বর্ত্তমান থাক। আমি হীনের হীন, দীনের দীন এই বোধ যেন আমার সর্ব্বক্ষণ থাকে। ব্রাহ্মণ হউক কিম্বা ক্ষত্রিয় হউক, বৈশ্য হউক কিম্বা শূদ্র হউক অথবা সমাজ গণিত নীচ ব্যক্তি যাহারা হাড়ি, মুচি বলিয়া উল্লিখিত, তাহারাই হউক; কিম্বা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদিই হউক; সকলেই মা আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই জ্ঞান, এই বোধ, এই ধারণা হইয়া যাক্।" কখন বা এরূপ কার্য্য করিতেন, যাহাতে অন্যান্য লোকেরা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিত। তাহাতে তাঁহার মনে কোন প্রকার ভাবান্তর বা অভিমান আসিত না। তিনি কখন কখন মার্জ্জনী দ্বারা পায়খানা পরিষ্কার করিতেন কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মনে অভিমান হইত না। ইহা দেখিয়া লোকে কত কি বলিত। তিনি উপদেবতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া কেহ অনুমান করিত এবং কেহ বা তাঁহার উন্মাদ রোগ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল। এই সকল অকার্য্য দ্বারা রামকৃষ্ণ লোকের নিকট বিলক্ষণ তিরস্কার ভাজন হইতেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার গ্রাহ্য হইত না।

তাঁহার মনের প্রবল বেগের নিকট বন্ধুর উপদেশ, শত্রুর উপহাস, মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের তাড়না কিছুই স্থান পাইত না। তিনি যখন যে কার্য্য করিবেন মনে করিতেন তাহা যে পর্য্যন্ত সমাপ্ত না হইত, সে পর্য্যন্ত তাঁহার মনোযোগের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইত না।

রামকৃষ্ণ মা শব্দ এখন পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি যাহা করিতে যাইতেন তাহাই মাকে জানাইতেন এবং মা মা বলিয়া মধ্যে মধ্যে কতই রোদন করিতেন। তিনি কখন কখন গঙ্গার তীরে পতিত হইয়া উচ্চৈস্বরে মা! মা! বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার সেই মা বলা অতি অপূর্ব্ব ছিল। যিনি তাঁহার সে অবস্থা দেখিয়াছেন তিনিই বিমুগ্ধ হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়াছেন "বালক একেবারে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে, হয় ত উহার কোন প্রকার পীড়ায় অতিশয় যন্ত্রণা হইতেছে। সেই জন্য মা! মা! বলিয়া চিৎকার করিতেছে।" যখন তিনি মাকে ডাকিতেন তখন কাহার কোন কথায় প্রত্যুত্তর দিতে পারিতেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—*—

লোকের যে পর্য্যন্ত আমি এই জ্ঞান থাকে সে পর্য্যন্ত তাহার কোন কার্য্য করিবার অধিকার হয় না। রামকৃষ্ণ সে অভিমান অচিরাৎ দূর করিয়া লজ্জা, ঘৃণা এবং ভয় প্রভৃতি বিবিধ বন্ধন হইতে বিমুক্ত লাভ করিয়া মন সংযম সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে জড় জগতে যে সকল পদার্থ আছে তাহাদের বিশ্লিষ্ঠ করিয়া দেখিলে কামিনী এবং কাঞ্চন এই দ্বিবিধ আদি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কামিনী কাঞ্চন হইতেই সকল পদার্থের সম্বন্ধ আসিয়া থাকে। কামিনী দ্বারা আপনার উৎপত্তি এবং কামিনী হইতে সন্তানাদি জন্মিয়া বিবিধ সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

যেমন স্ত্রী দ্বারা পুত্র কন্যার জন্ম হয়। তাহাদের পরিণয়াদি হইলে কুটুম্বাদি বিস্তৃত এবং কালে তাহারা সন্তানাদি প্রসব পূর্ব্বক বংশের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। এই রূপে ক্রমে ক্রমে অতি বিস্তীর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় পতিত হইলে মনুষ্যদিগের মনের আর সমতা রক্ষা হইতে

পারে না। এ প্রকার ব্যক্তিদিগের মন খণ্ড খণ্ড হইয়া কোথায় চলিয়া যায় তাহা পরে অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কাঞ্চন সম্বন্ধেও তদ্রূপ। অর্থের জন্য বিদ্যালাভ করিতে হয়, অর্থের জন্য পরপাদুকা বহন করিতেও অপমান বোধ হয় না, অর্থের জন্য কার্য্য বিশেষে আত্ম সমর্পন করিয়া থাকিতে হয় এবং অর্থের জন্য সতত শশঙ্কিত ও চিন্তিত থাকিতে হয়। সুতরাং মনের আর বিরাম কাল থাকিল না।

যে ব্যক্তি অনন্ত ঈশ্বরকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার পার্থিব আশক্তি অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চনভাব বিবর্জ্জিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। একথা রামকৃষ্ণের হৃদয়ে আপনি উত্থাপিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন তাঁহার দিব্য জ্ঞান হইল যে সেই সর্ব্বসারাৎসার ঈশ্বরই ইহ জগতের একমাত্র অবলম্বনীয় বস্তু এবং কামিণীকাঞ্চন অসার ও ত্যজনীয় পদার্থ। তিনি তদনন্তর এক হস্তে রৌপ্য মুদ্রা ও অপর হস্তে এক খণ্ড মৃত্তিকা লইয়া মনকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেন "মন! ইহাকে বলে টাকা ও ইহাকে বলে মৃত্তিকা। মন, এক্ষণে ইহাদের বিচার করিয়া দেখ। টাকা রুপার চাকৃতি বা গোলাকার, ইহাতে বিবির মুখ অঙ্কিত আছে। ইহা জড় পদার্থ। টাকায় চাউল, বস্ত্র, বাড়ী, হাতী, ঘোড়া, দশজনকে ভাল ভাত খাওয়ান যায় এবং তীর্থযাত্রা দেবতা ও সাধু সেবাও হইয়া থাকে, কিন্তু সচ্চিদানন্দ লাভ হইবার উপায় নাই। কারণ অর্থের দ্বারা মনে অহঙ্কার উপস্থিত হয়। ইহার দ্বারা অহংভাব একেবারে বিনষ্ট হইতে পারে না। অর্থে কখনই আশক্তি বিহীন মন হয় না। সুতরাং দেবতা বা সাধুর উদ্দেশ্যে কার্য্য হইলেও তাহাতে রজ তমোভাবের প্রাধান্য হইয়া উঠে। রজ কিম্বা তমোতে সচ্চিদানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সচ্চিদানন্দের প্রতি যাহার মন বাধিত হইবে, যে কেহ পূর্ণব্রহ্মের প্রেমানন দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইবে, তাহার মনে কোন গুণের আধিক্যতা থাকিবে না। এমন ব্যক্তির গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বে গমন করা আবশ্যক। শুদ্ধ সত্ত্বে উপনীত হইলে তবে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণ তাহা জানিয়াছিলেন। তিনি ইহাও নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে টাকায় কিঞ্চিৎ মঙ্গল জনক কার্য্য হয় বটে কিন্তু ইহাতে যে পরিমাণ অহঙ্কার আসিয়া থাকে তদ্বারা সঞ্চিত পুণ্য অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ পাপের প্রাদুর্ভাব হইয়া যায়। অতএব

কিঞ্চিৎ পুণ্যের অনুরোধে পাপরাশি যে পদার্থ দ্বারা উপার্জ্জন করা যায় এমন দ্রব্যে আশক্ত হওয়া দূরে থাকুক তাহার সংস্পর্শ পর্য্যন্ত না রাখাই কর্ত্তব্য। তিনি একদা বলিয়াছিলেন যে, "কোন ব্যক্তির অতিথি শালা ছিল। যে কোন ব্যক্তি তথায় আসিত সকলেই আশ্রয় পাইত। একদা একজন কশাই একটী গাভী লইয়া যাইতেছিল। পথি মধ্যে গাভী লইয়া কশাই বিব্রত হইয়া পড়ে। কশাই যতই গাভীকে প্রহার ও তাড়না করিতে লাগিল সে কিছুতেই আর একপদ অগ্রসর হইল না। কশাই ক্ষুধা তৃষ্ণায় অতিশয় বিপন্নাবস্থায় পতিত দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ ঐ গাভী-টীকে একটী বৃক্ষে বন্ধন পূর্ব্বক সেই দাতার বাটীতে যাইয়া অতিথি হইল। অবারিত দ্বার, কশাই যাইবামাত্র অমনি উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিল। আহারান্তে বিলক্ষণ বল পাইয়া গাভীকে অনায়াসে আপন বাটীতে লইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। গাভী সংহার করিবার যে পাপ হইল তাহার অধি-কাংশ সেই দাতাকে অবলম্বন করিল। কারণ তাহার সহায়তা না পাইলে কশাই গাভীকে কোনমতে লইয়া যাইতে পারিত না।"

মৃত্তিকা লইয়া তিনি বলিতেন যে "ইহাও জড় পদার্থ। মৃত্তিকাতে শষ্য জন্মিয়া থাকে, তদ্দ্বারা জড় জীবন রক্ষা হয় বটে। মৃত্তিকায় গৃহাদি প্রস্তুত হয় এবং দেব দেবীর প্রতি মূর্ত্তি গঠিত হইয়া থাকে। অর্থের দ্বারা যাহা হয়, মৃত্তিকার দ্বারাও তাহাই হয়। দুই এক জাতীয় জড় পদার্থ এবং উভয়েরই পরিণাম এক প্রকার।" তিনি মনকে পুনরায় বলি-তেন "মন! ইহাদের লইয়া থাকিবে অথবা সচ্চিদানন্দের চেষ্টা করিবে?" তাঁহার মন অর্থ লইল না। অর্থকে অতি যৎসামান্য জড় পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হইল। নয়ন মুদ্রিত করিয়া "টাকা মাটি মাটি টাকা ২ ইত্যাকার বার ২ জপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল বিলম্বে তিনি টাকা ও মাটি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। তদবধি তিনি কখন টাকা স্পর্শ করিতে পারিতেন না। এমন কি কোন প্রকার মূল্যবান ধাতু স্পর্শ করিলে তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করিতেন। যদ্যপি কখন তাঁহার সমীপে কেহ অর্থের কথা বলিত তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ করিতেন। অর্থ লইয়া অনেকেই অনেক প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার মানসিক এবং শারীরিক অনাশক্তি পূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

অতঃপর রামকৃষ্ণ কামিনী লইয়া বিচার করিয়াছিলেন। মনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মন! কামিনী সম্ভোগ করিবে? কামিনী কাহাকে বলে অগ্রে বুঝিয়া লও। ইহা একটী হাড়ের খাঁচা। মাংশ ও তদুপরি চাম্‌ড়া দ্বারা আবৃত। মুখকে চন্দ্রের সহিত কবিরা তুলনা করেন কিন্তু সেই জ্যোতি কাহার? চাম্‌ড়া স্বতন্ত্র করিলে কি বহির্গত হইবে? মাংশ শোনিত এবং বসা ইত্যদি। তাহা লইয়া কি সম্ভোগ করিতে পার? কামিণীদিগের শরীরে যে সকল ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য আছে। শারীরিক পুষ্টি সাধনের জন্য কোন ছিদ্র দ্রব্য সামগ্রী লইয়া যইবার প্রণালী স্বরূপ এবং কোন ছিদ্র পুরীষ নির্গমনের জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রকার যে কামিনী, তাহাকে লইয়া লোকে উন্মত্ত রহিয়াছে। কামিনী দ্বারা ইহকাল পরকাল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কারন আত্ম ইন্দ্রিয় সুখের জন্য যদ্যাপি স্ত্রী গৃহীত হয় তাহা হইলে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। ফলে মনের শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া আসিবে। কিম্বা কেবল সন্তানাদির জন্য যথা নিয়মে স্ত্রী সহবাস করিলে তাহাতেও মন বিচ্ছিন্ন হইবার বিশেষ হেতু রহিয়াছে। এই রূপ মন একদিকে স্ত্রীর মোহিনী শক্তিতে বিমোহিত হইয়া রহিল, আর এক দিকে বাৎসল্য মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। মনের যখন এমন অবস্থা হইল তখন তাহার দ্বারা অনন্ত ঈশ্বরের চিন্তা কখন হইতে পারে না। সুতরাং কামিনী, ঈশ্বর লাভের প্রতিবন্ধক জন্মাইয়া দিল। মন! এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখ, এই জড় পদার্থে তুমি বিক্রীত হইয়া থাকিবে কিম্বা জড় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তাকে লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে?" রামকৃষ্ণের মন কামিনী পরিত্যাগ করিল। তাঁহার মনে হইল যে ঈশ্বরের শক্তিকে মায়া বলে। এই মায়া শক্তি হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। মায়াকে তিনি মাতা বলিতেন এবং মাতা রূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মায়া হইতে মেয়ে এই নিমিত্ত প্রত্যেক মেয়ের প্রতি তাঁহার তদবধি মাতৃভাব জন্মিয়া গেল।

রামকৃষ্ণের মনে বিচার ভাব সর্ব্বদাই থাকিত। তিনি কখন বিনা বিচারে কোন কার্য্যই করিতেন না। কামিনী কাঞ্চন বিচার দ্বারা যে ভাব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এত প্রবল রূপে কার্য্যকারিতা হইয়াছিল, যে কখন কোন উত্তম বস্ত্র কিম্বা অন্য কোন পদার্থ তাঁহার ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হইলে তিনি তাহার কারণ বহির্গত করিয়া তদ্বারা সচ্চিদানন্দ লাভের সহায়তা

জ্ঞান করিলে তিনি উহা লইতেন নতুবা তৎক্ষণাৎ অতি অবজ্ঞা সূচক ভাব দ্বারা পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহার বিচারের অতি সুন্দর প্রণালী ছিল। তাঁহার বিচারের মধ্যে বিশ্লেষন (analysis) এবং সংশ্লেষণ (synthesis) প্রক্রিয়া বিশিষ্ট রূপে দেখা যায়। তিনি পদার্থের স্থূল জ্ঞান লাভ করিয়া তাহা হইতে সূক্ষ্ম জ্ঞানে গমন করিতেন। সূক্ষ্মভাবে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া পরে তাহার কারণ অবলম্বন পূর্ব্বক পরিশেষে মহাকারণে মনোনিবেশ করিতেন। এই মহাকারণে তিনি সাচ্চিদানন্দকেই অদ্বিতীয় ভাবে দেখিতে পাইতেন। মহাকারণ হইতে সংশ্লেষণ প্রথানুসারে তিনি কারণ, সূক্ষ্ম এবং স্থূলে প্রত্যাগমন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িতেন। তিনি তাই বলিতেন "যেমন খোসা ছাড়াইয়া মাঝ পাওয়া যায়, পরে মাঝ হইতে খোসা পর্য্যন্ত আসিয়া স্পষ্ট দেখা যায় যে যদিও স্থূল দৃষ্টিতে খোসা এবং মাঝ স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হয় কিন্তু মহা কারণে বিচার করিয়া দেখিলে উহাদের এক সত্বায় উৎপত্তি বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।"

রামকৃষ্ণ এইরূপে মন লইয়া সাধন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার অভিমান দূরীকৃত হইল। তিনি মনে তাহা বুঝিলেন কিন্তু তাঁহার প্রাণ পরীক্ষা দিতে চাহিল। তখন তাঁহার এই ভাবোদয় হইল যে অভিমান যদ্যপি গিয়া থাকে তাহা হইলে উহা অবশ্য কার্য্যে প্রকাশ পাওয়া উচিত। তিনি নানা প্রকার চিন্তা করিয়া অভিমান দূর করণের স্বতন্ত্র ক্রিয়া বাহির করিলেন। তাঁহার জ্ঞান হইল যে পৃথিবীতে ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ, ন্যায়, অন্যায়, চন্দন বিষ্ঠা, বিষ অমৃত, ইত্যাদি নানা প্রকার অহঙ্কারের কথা আছে। এই সকল অহঙ্কার হইতে মন যদ্যপি বিশ্লিষ্ট হয়, তাহা হইলে সে মন দ্বারা সচ্চিদানন্দ লাভ হইতে পারিবে। রামকৃষ্ণের এমনই একাগ্রতা ছিল যে যখন যে ভাব আসিত, কাল বিলম্ব না করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া লইতেন। কিরূপে এই নূতন ভাব হইতে উত্তীর্ণ হইবেন তিনি এই কথা তাঁহার সচ্চিদানন্দময়ী জননীর নিকট জানাইলেন। তিনি কালীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া দুই হস্তে সচন্দন পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন "মা এই নে তোর্ ভাল এই নে তোর্ মন্দ আমায় শুদ্ধ ভক্তি দে মা," এই কথা বলিয়া দুই হস্তের দুইটী পুষ্প কালীর চরণে অর্পণ করিলেন। আবার ঐ রূপে পুষ্প লইয়া বলিলেন "মা এই নে তোর্ সৎ এই নে তোর্ অসৎ; এই নে তোর সূচী এই নে তোর অশুচী, আমায় ভক্তি দে; এই নে তোর বিষ এই তোর অমৃত আমায়

ভক্তি দে।” রামকৃষ্ণ কালীর পূজা করিয়া মনের বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি এক হস্তে বিষ্ঠা ও এক হস্তে চন্দন লইয়া মনকে বলিলেন “মন ইহাকে বলে চন্দন। দেবতা ও লোকের অঙ্গের শোভা সম্পাদন করে। ইহার কি সুমধুর সৌরভ, আঘ্রাণ করিলে শরীর স্নিগ্ধ হইয়া যায়। আর ইহাকে বলে বিষ্ঠা। পৃথিবীর সকল পদার্থ হইতে হেয়।” তিনি চন্দন বিষ্ঠা লইয়া সমভাবে বসিয়া রহিলেন। মনের সমতা কোন মতে বিনষ্ট হইল না।

রামকৃষ্ণ যখন এই প্রকার সাধন করিতেছিলেন তখন মন্দিরের লোকেরা তাঁহার উন্মত্ততা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় করিল। যাহাদের মনে উপদেবতার ভাব ছিল তাহাদের তাহা এক্ষণে বদ্ধমূল হইয়া গেল। অঘোরী ব্যতীত বিষ্ঠা লইয়া কাহার সাধন নাই। কিন্তু অঘোরীর সম্প্রদায় ভুক্ত তিনি ছিলেন না। সুতরাং কেহই তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই।

যদিও পুরাকালে জনক প্রভৃতি মহর্ষিগণ সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে সমভাব দেখাইয়া গিয়াছেন কিন্তু সে কথা রামকৃষ্ণে কেহই প্রয়োগ করে নাই। মন্দিরের অন্যান্য কর্ম্মচারীর কথা কি তাঁহার আত্মীয় হলধারী, বহুশাস্ত্র বিশারদ হইয়াও উপদেবতার কথা বলিতেন। সময়ে সময়ে রামকৃষ্ণকে অন্তরালে লইয়া গিয়া কত উপদেশ দিতেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইত না। মন্দিরের কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা চন্দনের কথা শ্রবন করিয়া রাম-কৃষ্ণকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল “ভট্টাচার্য্য মহাশয় তুমি নাকি বিষ্ঠা চন্দন এক করিয়াছ, ভাল ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছ। কিন্তু শুনিলাম তোমার নিজের মল লইয়াছিলে, তা এ প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানী ত সকলকেই বলা যায়। আপনার মল কে না স্পর্শ করে? যদ্যপি অন্যের বিষ্ঠা স্পর্শ করিতে পার তাহা হইলে ও কথা গণ্য হইতে পারে।” রামকৃষ্ণ অতি শান্তভাবে এই সকল কথা শ্রবণ করিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে এ ব্যক্তি নিতান্ত অন্যায় কথা বলে নাই। বাস্তবিক আপনার বিষ্ঠা স্পর্শ করায় সাধনা কি হইল? বরং অভিমানেরই কার্য্য হইয়াছে। এই কথা তিনি মাতাকে জানাইলেন। মহাশক্তির শক্তি অমনি তরুণ সাধক প্রবর রামকৃষ্ণের শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। রামকৃষ্ণের মনে এমন প্রচণ্ড ভাব আসিল যে তিনি তৎক্ষণাৎ গঙ্গাতীরে, যে স্থানে সকলে মল মূত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে সদ্য ত্যক্ত মল মৃত্তিকাবৎ ব্যবহার

করিলেন। এমন কি জিহ্বা দ্বারা উহা স্পর্শ করিতেও ঘৃণার উদ্রেক হয় নাই। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, যখন তিনি বিষ্ঠায় জিহ্বা সংলগ্ন করিয়াছিলেন তখন কোন প্রকার দুর্গন্ধ অনুভব করেন নাই।

রামকৃষ্ণদেবের এই সাধনের দ্বারা অতি গূঢ় তাৎপর্য্য বহির্গত হইতেছে। বিষ্ঠা চন্দন এককরা কেবল বিচারের কথা নহে। যাঁহারা বিচার করিয়া বস্তুর গুণাগুণ স্থির করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অবস্থা এবং যাঁহারা বিচারের পর প্রকৃত কার্য্য করেন, তাঁহাদের স্বতন্ত্র অবস্থা হইয়া থাকে। "এক ব্যক্তি একটী বেল কাঁটা লইয়া চক্ষু মুদ্রিত করণ পূর্ব্বক মনে মনে বিচার করিয়া দেখিল যে, ইহা উদ্ভিদ পদার্থ সম্ভূত। ইহাতে অগ্নি সংস্পর্শ করিয়া দিলে এখনি ভষ্মিভূত হইয়া যাইবে। ফলে সে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে কাঁটাটী ভষ্মিভূত করিল না। সে যেমন কাঁটাটীর উপর হস্ত নিক্ষেপ করিল অমনি উহা বিদ্ধ হইয়া অশেষ প্রকার ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিল।" অথবা "সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে কাহার নেশা হইতে পারে না। সিদ্ধি আনিয়া বাঁটিতে হয়, তাহা কেবল স্পর্শ করিলে কিম্বা মুখের ভিতর রাখিয়া দিলেও সিদ্ধির ফল লাভ করা যায় না; তাহা উদর মধ্যে যাওয়া চাই। তথায় কিয়ৎ কাল থাকিয়া শরীরে শোষিত হইলে তবে সিদ্ধির আনন্দ উপলব্ধি করা যায়।" অতএব কার্য্য ব্যতীত কোন বিষয়ের ফল লাভ হইতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব বিষ্ঠার গন্ধ পর্য্যন্ত কি জন্য প্রাপ্ত হন নাই তাহার তাৎপর্য্য এই,যে ব্যক্তির মন ঈশ্বরে পূর্ণরূপে অর্পিত হয়, বাহ্যিক কার্য্যে কিম্বা পদার্থ বিশেষে কখনই সে ব্যক্তির মন সংলগ্ন হইতে পারে না; এই জন্য সে সকল পদার্থের ভাবও উপলব্ধি হইতে পারে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—*—

পূর্ব্ব কথিত মত নানা প্রকার সাধন দ্বারা সংযত-মন হইলে রামকৃষ্ণদেবের কর্ম্মের ভাব আসিল। তিনি গোকল ব্রত হইতে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি পূর্ব্ব প্রচলিত কর্ম্মকাণ্ডের প্রক্রিয়া একে একে সাধন করিয়াছিলেন। এই সকল সাধনের ভাব আপনি তাঁহার মনে উদয় হইত, কাহাকে জিজ্ঞাসা কিম্বা

কোন শাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি অবগত হইতেন না। তাঁহার সাধনের ধারা বাহিক ইতিহাস কোন মতে প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। কারণ তিনি কথন কি করিতেন, তাহা তিনিই বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। উপদেশ কালে যাহা তাঁহার মনে আসিত এবং প্রকাশ করা প্রয়োজন বোধ করিতেন, তাহাই তিনি বলিতেন। তাঁহার কথার ভাবে আমরা যাহা বুঝিয়াছি সেই রূপে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

সাধারণ ব্রত নিয়মাদি সমাধা করিয়া তিনি যোগের উচ্চতম সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে যে বটবৃক্ষের কথা উল্লেখিত হইয়াছে তাহার নিম্নদেশে পঞ্চবটী নামক যোগের স্থান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পঞ্চবটী বর্গ-পরিমিত চারি হাত স্থান হইয়া থাকে। ইহার এক কোণে নিম্ব, দ্বিতীয় কোণে বিল্ব, তৃতীয় কোণে অশ্বত্থ বা বট, চতুর্থ কোণে শেফালিকা এবং মধ্য-স্থলে আমলকী বৃক্ষ আরোপণ করিতে হয়। এই স্থানটীর চতুর্দ্দিকে জবা ফুলের বেড়া এবং তাহাতে অপরাজিতা কিম্বা মাধবী লতা বেষ্টিত থাকে। পরম-হংসদেব এই রূপে পঞ্চবটী প্রস্তুত করিয়া বৃন্দাবনের ধূলা আনাইয়া তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। রজনীযোগে যখন চারি দিকে মনুষ্য কোলাহল নিস্তব্ধ হইত, যখন নিশাচরগণ স্ব স্ব বিবর ও বাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া আহারের অন্বেষণে ভ্রমণ করিত; যখন যামিনী ঝিল্লিরবে মনের সাধে পরম পুরুষের গুণানুকীর্ত্তন করিত, সেই সময়ে পরমহংসদেব নিঃশব্দে ঐ পঞ্চবটী মধ্যে প্রবেশ করিতেন এবং তথায় উপবেশন করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। কতক্ষণ সেই অবস্থায় থাকিতেন এবং কি করিতেন, তাহা কেহ অদ্যাপিও জানিতে পারেন নাই। পঞ্চবটীতে সাধনকালে তিনি তোতাপুরীর নিকটে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়া কুম্ভকাদি যোগ দ্বারা নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, এই নির্ব্বিকল্প-সমাধি যোগের চরমাবস্থার কথা। কতকাল হটযোগ করিয়া আসনাদি আয়ত্ত হইলে তাহার পর প্রাণায়াম ধ্যান ধারণাদি করিতে পারিলে, তবে সমাধি হইয়া থাকে; কিন্তু পরমহংসদেব তিন দিনে তদবস্থা লাভ করিয়া-ছিলেন। তোতাপুরী এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরমহংসদেবের নিকটে ১১ মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তোতাপুরীর এই সাধন করিতে বিয়াল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

কুম্ভকযোগের সময় তাঁহার মুখগহ্বরস্থ ঊর্দ্ধ মাড়ীর সম্মুখ দিকের মধ্য-

স্থান হইতে ক্রমাগত শোণিত নির্গত হইত। সেই শোণিতের বর্ণ সিমপাতার বর্ণের ন্যায় দেখাইত। ঔষধাদি দ্বারা ঐ শোণিত রুদ্ধ করা যাইতে পারিত না। কিয়ৎকাল শোণিত স্রাবের পর আপনি স্থগিত হইয়া যাইত। এই শোণিত নির্গমনে পরমহংসদেব এক এক দিন অতিশয় কাতর হইতেন এবং মুখ-গহ্বরে বস্ত্র প্রবিষ্ট করিয়া সঙ্কাপন ক্রিয়া দ্বারা শোণিতধারা রুদ্ধ করিবার বিফল প্রয়াস পাইতেন। কিছুক্ষণ শোণিত স্রাবের পর উহা আপনি স্থগিত হইয়া যাইত। এই সময়ে তাঁহার শরীর অতিশয় স্থূল হইয়াছিল এবং রূপ লাবণ্যে দিক্ আলোকিত করিত। তিনি বস্ত্র পরিধান করিতে পারিতেন না তজ্জন্য একখানি মোটা উত্তরীয় বসন দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করিতেন। এই সময়ে তাঁহাকে সাধুরা পরমহংস বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব যদিও কুম্ভকাদি যোগ করিতেছিলেন, তথাপি কালীর মন্দিরে প্রবেশ করা বন্ধ হয় নাই। তাঁহার ভাবান্তর কাল হইতে হৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় নামক পরমহংসদেবের জনৈক আত্মীয় কালীর পূজা করিতেছিলেন। তিনি পরমহংসদেবের সেবা শুশ্রূষাদিও করিতেন। যখন তিনি অজ্ঞানাবস্থায় থাকিতেন, তখন হৃদয় আসিয়া তাঁহাকে আহার করাইতেন এবং গাত্রের কর্দ্দমাদি পরিষ্কার করিয়া দিতেন। পরমহংসদেবের পূজা করা সেই জন্য নিয়মের অন্তর্গত ছিলনা। যখনই ইচ্ছা হইত কালাকাল, শুচী অশুচী কিম্বা অন্য কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া পূজা করিতে যাইতেন। কোন দিন হয় ত কালীকে কেবল চামর ব্যজন করিতে করিতে সমাধিস্থ হইতেন। তখন হাতের চামর হাতেই থাকিত। কখন বা দেবীর চরণ ধরিয়া মনে মনে কত কি বলিতেন এবং কখন বা শিবের সহিত কত কি রহস্য করিতেন। কোন কোন দিন প্রাতঃকাল হইতে নানাবিধ পুষ্প চয়ন করিয়া দেবীকে পূজা করিতেন এবং কখন বা সুললিত গীত ও অদ্ভুত নৃত্য করিয়া আপনভাবে আপনি মাতিয়া উঠিতেন। পরমহংসদেব যে গোপনে গোপনে সাধন ভজন করিতেছিলেন, তাহা মন্দিরের কেহই জানিত না। সন্ন্যাসী সাধুরা সর্ব্বদাই তথায় আসিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের আবশ্যকীয় ভোজ্য সামগ্রী দিবার জন্য রাসমণির ব্যবস্থা আছে সুতরাং নূতন নূতন সাধু ফকির আসাতে কেহ কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। পূর্ব্ব কথিত হলধারী পরমহংসদেবের এক আত্মীয় ঐ মন্দিরে বাস করিতেন। বেদান্তশাস্ত্রে তিনি বিশেষ অধিকারী ছিলেন। হলধারী সাকার পূজাদি নিতান্ত ঘৃণা করিতেন।

নৃত্য গীত বা সঙ্কীর্ত্তনাদি মস্তকের বিকার এবং মায়ার কার্য্য বলিয়া উপহাস করিতেন। তিনি পরমহংসদেবকে মধ্যে মধ্যে উপদেশ দিতেন এবং বেদান্ত-শাস্ত্র শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। পরমহংসদেব এইরূপ বার বার হলধারীর নিকট আপন দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া এক দিন গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং মা মা বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব যেমন মা মা করিয়া ডাকিয়াছেন, অমনি আদ্যাশক্তি কালীরূপে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মাতাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "মা, হলধারী বলে যে, আমার মাথা খারাপ হইয়াছে, যাহা কিছু দর্শন করি, তাহা আমার চক্ষের দোষ, মায়া মাত্র। মা, সত্যি করে আমায় বলে দে আমার কি হলো।" অভয়া অমনি অভয় দিয়া বলিলেন, "তুমি যেমন আছ অমনি থাক।" এই বলিয়া মাতা অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। রামকৃষ্ণ তদবধি আর কাহার কথায় কর্ণপাত করিতেন না, কাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করিতেন না।

কালীর প্রতি পরমহংসদেবের এ প্রকার আত্মনিবেদনের ভাব ছিল যে, যখন কোন কার্য্য করিতেন, মাতাকে না জানাইয়া কখনই তাহাতে নিযুক্ত হইতেন না। তিনি কিন্তু কখন কোন দ্রব্য প্রার্থনা করেন নাই, তাহার প্রয়োজনও বুঝিতেন না এবং অপ্রয়োজনও অনুমান করিতে পারিতেন না।

এক দিন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার পঞ্চবটীর বেড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এ কথা কাহাকে বলি এবং কে বা আমার কথা রক্ষা করিবে। ভর্ত্তাভারি বলিয়া এক জন ঐ উদ্যানের মালি ছিল, এই ব্যক্তি পরমহংসদেবকে চিনিয়াছিল। সে এক দিন পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, "পৃথিবীতে উচ্ছিষ্ট হয় নাই কি?" পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন যে, "ব্রহ্ম বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হয় নাই এবং কখন হইবারও নহে।" ভর্ত্তাভারি তদবধি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। এই উচ্ছিষ্ট কথা আমরা পরেও তাঁহার নিকট শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন যে, বেদ, পুরাণ শাস্ত্রাদি ঋষি মুনির মুখ বিগলিত হইয়াছে, সুতরাং উচ্ছিষ্ট কিন্তু ব্রহ্ম বিজ্ঞান বাক্যাতীত অবস্থার কথা। তাহা হাবার স্বপ্নবৎ বোধ হয়; লোককে কোন মতে প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। যাহার হয় সেই বুঝিতে পারে।

পরমহংসদেব ভর্ত্তাভারিকে আপন মনের কথা দুই একটা বলিতেন।

পঞ্চবটীর বেড়ার কথা তাহাকেই বলিয়াছিলেন কিন্তু সে সামান্য ভৃত্য কোথায় কি পাইবে তজ্জন্য কিছুই করিতে পারে নাই। রামকৃষ্ণদেব পঞ্চবটীর বটবৃক্ষ মূলে কি হইবে বলিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে গঙ্গাতে বান আসিল। বানের সঙ্গে এক বোঝা বাঁকারি এবং আর এক বোঝা এক মাপের কতকগুলি বাঁসের খুঁটী ভাসিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে ডুবিয়া গেল। রামকৃষ্ণদেব তাহা দেখিতে পাইয়া ভর্ত্তাভারিকে তৎক্ষণাৎ বলিলেন। ভর্ত্তাভারি আনন্দে বিহ্বল হইয়া একেবারে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক জলে পড়িল এবং ডুব দিয়া বাঁকারি এবং খুঁটী গুলিকে উপরে উত্তোলন করিল। ভর্ত্তাভারি আপনি উহা দ্বারা পঞ্চবটীর বেড়া বন্ধন করিয়া দিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বেড়া সংস্কারের জন্য যে যে দ্রব্যগুলীর প্রয়োজন ছিল তদসমুদয় তন্মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পরমহংসদেব এই ঘটনাতে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে "লোকে আমায় পাগল বলে। কিন্তু আমি মাকে দেখিতে পাই, কথা বলি তিনিও কত কি বলেন; এ সকল কি মিথ্যা, ভ্রম দর্শন করি! ভাল অদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্।" এই প্রকার স্থির করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, কিরূপ পরীক্ষা করা যাইবে? কিন্তু তখন কিছুই মনে আসিল না।

এক দিন গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন, এমন সময়ে রামধন বলিয়া রাসমণির একজন অতি প্রিয় কর্ম্মচারী সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিল। রামধন পরমহংসদেবের প্রতি নিতান্ত বিরূপ ছিল, এমন কি কখন কথা কহিত না। পরমহংসদেব রামধনকে দেখিয়া মনে মনে মাকে বলিলেন, "মা! তুমি যদি সত্য হও তা হ'লে রামধনকে আমার নিকটে বন্ধুর ন্যায় এখন এনে দাও। তবে জান্‌ব যে তুমি আমার কথা শুন, আর সকলই সত্য বলে ধারণা হবে।" এই কথা মনে হইবামাত্র রামধন সহসা রামকৃষ্ণের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার নিকটে নাবিয়া আসিল এবং মৃদু স্বরে বলিল, "ভট্টাচার্য্য মহাশয় কালীর সাক্ষাৎ পাইয়া থাক ভাল তা অত বাড়াবাড়ি কর্‌বার আবশ্যক কি?" এই কথা বলিয়া রামধন চলিয়া গেল।

রামকৃষ্ণের যদিও এক্ষণে উন্মত্ততার অনেক সাম্য হইয়াছিল, কিন্তু সময়ে সময়ে অধীর হইয়া পড়িতেন। যখন কম্প হইত তখন পাঁচজনে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। এই নিমিত্ত চিকিৎসাদি বন্ধ করা হয় নাই। বৈদ্যেরা

বায়ুরোগ সাব্যস্থ করিয়া নানাবিধ তৈল মর্দ্দন করাইতেন। স্নিগ্ধকারক ও বায়ুনাশক ঔষধি সেবন করান হইত এবং কেহ কেহ স্ত্রী সহবাস করিতে পরামর্শ দিত।

স্ত্রী সহবাস সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল। বিবাহের পর কার্য্যানুরোধে তিনি স্ত্রীর মুখাবলোকন করিতে পান নাই। তদনন্তর তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সেই সময়ে তিনি প্রকৃতিকে সকলের উৎপত্তির কারণ জ্ঞানে মাতৃ সম্বোধন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার তদবধি *ধ্রুবজ্ঞান হইয়াছিল যে, স্ত্রীমাত্রেই শক্তির অংশ অতএব শক্তিতে গমন করিলে* মাতৃহরণ অপরাধ সংঘটিত হইয়া যাইবে। মন্দিরের লোকেরা একথা জানিত এবং তাহারা সেই জন্য তাঁহাকে পূর্ণ পাগল বলিয়া গণনা করিত।

স্ত্রী সহবাস না করাই যখন তাঁহার উন্মত্ততার কারণ বলিয়া স্থির হইল, তখন হৃদয়মুখোপাধ্যায় গোপনে এ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে কথায় তাঁহার মন চঞ্চল করিতে পারে নাই। কথায় যখন কোন কার্য্য হইল না তখন হৃদয় মুখোপাধ্যায় ঠাকুর বাটীর এক প্রৌঢ়া পরিচারিকাকে দশ টাকা পুরস্কার স্বীকার করিয়া পরমহংসদেবের পশ্চাত নিযুক্ত করিয়া দিল। এই পরিচারিকা কোথাও হইতে একটী যুবতী কামিনী সকলের অজ্ঞাতসারে পরমহংসদেবের শয়ন গৃহে আনিয়া উপস্থিত করিয়া দিল। পরমহংসদেব সেই স্ত্রীলোককে দেখিয়া অমনি তথা হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন এবং হৃদয়কে যথোচিত তিরস্কার করিলেন।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইয়া গেল। একদা কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের নিকট পরমহংসদেব হৃদয়ের সমভিব্যাহারে আগমন করেন। তথায় জনৈক পূর্ব্বাঞ্চলের কবিরাজ উপস্থিত ছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ বায়ুরোগ নির্ণয় করিয়া পূর্ব্ব হইতেই তৈলাদি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই পণ্ডিত পরমহংসদেবকে দেখিয়াই হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এই ব্যক্তির কি কোন প্রকার যোগ করার অভ্যাস আছে? লক্ষণে যেন যোগীর ন্যায় বোধ হইতেছে।" হৃদয় তাহা স্বীকার করিল। পরমহংসদেবের অবস্থা সম্বন্ধে এই পণ্ডিত সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁহার কথায় কোন ফল হইল না। হৃদয়ও সে কথা বুঝিল না এবং কবিরাজ মহাশয়ের তাহা ধারণা হইল না। তিনি তৈল ব্যবহার করাইতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মন্দিরের লোকেরা যখন রামকৃষ্ণদেবকে উন্মত্ত বলিয়া স্থির করিল যখন নিকটস্থ গ্রামের পণ্ডিতপ্রবরেরা তাহাই অনুমোদন করিয়া দিলেন, তখন রাসমণি কর্ত্তব্য জ্ঞানে নানা প্রকার চিকিৎসাদি করাইতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব তখনও আপনার ভাব পরিবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিলে মনে হইত যে তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না, কাহারও কথায় এক পরমাণু মূল্য জ্ঞান করিতেন না এবং মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া বিচার করিতেন না। তাঁহার যখনই যে ভাব মনে আসিত, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন না করিয়া কোন মতে স্থির হইতে পারিতেন না। বাস্তবিক যে তিনি সকলকে ঘৃণা করিতেন তাহা নহে। তিনি দাম্ভিকতা সহকারে দেবোদ্দেশে যে সকল কার্য্য করিতেন তাহা প্রকৃতপক্ষে অহংভাব হইতে, হইত না। তাহা অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া করিতেন। তাঁহার উপদেশে শুনিয়াছি যে, যে জীবনের নিশ্চয়তা অতি সন্দেহ জনক, যে কোন উপায়ে হউক ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় তাহাই সকলের করা কর্ত্তব্য। কারণ সময় থাকিতে তাহার উপায় না করিয়া লইলে পরিণামে অনুশোচনা করিতে হয়।

পরমহংসদেব মনে মনে কোন কার্য্যের সঙ্কল্প করিতেননা। পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে তিনি সচ্চিদানন্দময়ী মাতার শ্রীচরণে তাঁহার আত্ম-সমর্পণ করিয়া মাতৃ-স্তনপায়ী শিশুর ন্যায় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনে যখন যে ভাব উদ্দীপন হইত, সেই ভাবেই তাঁহাকে যন্ত্রবৎ কার্য্য করাইয়া লইত। এই নিমিত্ত তাঁহার ভাবোন্মত্ততাবস্থায় তাঁহাকে আর এক প্রকার দেখাইত।

একদিন প্রাতঃকালে একটী যুবতী আলুলায়িত কেশা গৈরিক বস্ত্র পরি-ধানা সন্ন্যাসিনীকে জাহ্নবীর তীরে উপবিষ্ট দেখিয়া পরমহংসদেব তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য হৃদয়কে আদেশ করেন। হৃদয় এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল। কারণ ইতি পূর্ব্বে যাঁহার স্ত্রী জাতির সহিত কোন সংস্রব ছিল না, যাঁহার নিকট স্ত্রীলোকের নাম করিলে মহা বিভ্রাট হইয়া

উঠিত, তাঁহার এ প্রকার ভাবান্তর দেখিলে সহজেই দুর্ব্বল চিত্তে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। হৃদয়ের মনে যাহাই হউক সে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণীকে পরমহংসদেবের সমীপে আনিয়া উপস্থিত করিল। ব্রাহ্মণীকে দেখিয়া পরমহংসদেব মা বলিয়া ভাবে নিমগ্ন হইয়া যাইলেন। পরে নানাপ্রকার তত্ত্ব-কথা আলাপন দ্বারা উভয়েই আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই সন্ন্যাসিনী "ব্রাহ্মণী" বলিয়া উল্লেখিত আছেন। তিনি অসাধারণ গুণসম্পন্না ছিলেন। হিন্দু, বিশেষত বঙ্গ মহিলার মধ্যে এপ্রকার দ্বিতীয় স্ত্রীলোক অদ্যাপি কেহ দেখিয়াছেন কিনা বলিতে পারি নাই। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার এমন ব্যুৎপত্তি ছিল যে তাৎকালিক পণ্ডিতাগ্রগণ্য বৈষ্ণব চরণ ও পূর্ণানন্দ প্রভৃতি মহাশয়েরা নির্ব্বাক্ হইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের যে সকল সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র আছে তৎসমুদয় তাঁহার কণ্ঠস্থ *ছিল এবং যেন সাধন দ্বারা সকলই আয়ত্তাধীনে রাখিয়াছিলেন। সুতরাং বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, গীতা, তন্ত্র এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে তাঁহার সম্যক* রূপে অধিকার ছিল। কেবল তাহা নহে। আধুনিক ঘোষ-পাড়া, নব রসিক, পঞ্চনামী, বাউল প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রণালীও তিনি জানিতেন।

এই ব্রাহ্মণী পরমহংসদেবের অবস্থা ও ভাব, শাস্ত্র সঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করেন এবং ঈশ্বরের নামে যে জড়বৎ ভাব প্রাপ্ত হইতেন তাহা মৃগী বা হিষ্টিরিয়া জনিত নহে। উহাকে তিনি মহাভাব বলিয়া ব্যক্ত করিলেন।

ব্রাহ্মণী প্রমুখাৎ মহাভাব কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া রহিল। ভাব কাহাকে বলে তাহাই বৈষ্ণব ব্যতীত কেহ জানেন না, সে স্থলে মহাভাবের অর্থ কে বুঝিবে? মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের এই মহাভাব হইত তাহা বৈষ্ণবগ্রন্থে উল্লেখিত আছে কিন্তু এক্ষণে বৈষ্ণবদিগের দুরবস্থা সংঘটিত হওয়ায় সে ভাবের ভাব বোধ হওয়া দূরে থাকুক, অতি অল্প ব্যক্তিরই অর্থবোধ হইবার সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণীর প্রমুখাৎ মহাভাবের কথা প্রকাশ পাইলে সকলে ভাব বলিয়া একটা কথা শিক্ষা করিল, কিন্তু ইহা দ্বারা পরমহংসদেবের প্রতি কাহার শ্রদ্ধা ভক্তি হইল না। কিছুদিন পরে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় আসিয়া কলিকাতার পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, রাসমণির জামতা মথুরানাথ বিশ্বাস তাৎকালিক মহাপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর বৈষ্ণবচরণকে লইয়া যান। যে সময়ে তাঁহারা উপ-

স্থিত হন, পরমহংসদেব এবং পণ্ডিতমহাশয় তখন দেবী-মন্দিরের সম্মুখ ভাগে উপবিষ্ট ছিলেন। পরমহংসদেব বৈষ্ণবচরণকে দেখিবামাত্র অমনি ভাবে বিহ্বল হইয়া দ্রুতপদে গমন পূর্ব্বক তাঁহার স্কন্ধোপরি আরোহণ করিলেন। বৈষ্ণবচরণ পরমহংসদেবের অপূর্ব্ব ভাবাবেশ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং চৈতন্য জ্ঞান করিয়া নিজ রচিত শ্লোকাদি দ্বারা বন্দনাদি করিতে লাগিলেন। এই শ্লোক সকল তাঁহার পূর্ব্বের রচনা নহে, তাহা সেই সময়ের মনের উচ্ছ্বাসে নির্গত হইয়াছিল। বৈষ্ণবচরণের এই অসাধারণ শক্তি দেখিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতমহাশয় আপনি পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং পরমহংসদেবের সন্নিধানে কিছু দিন বাস করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বৈষ্ণবচরণ পরমহংসদেবকে পাইয়া আনন্দে উৎসাহিত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণীও বৈষ্ণবচরণকে অতিশয় প্রীতি করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব সম্বন্ধে ব্রাহ্মণী যে মহাভাবের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবচরণও তাহা সমর্থন করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রাদি আনিয়া পরমহংসদেবের পূর্ব্ব সাধনের অবস্থাগুলি মিলাইয়া লইয়া দেখিলেন যে, কিছুই অশাস্ত্রীয় হয় নাই। পরমহংসদেব লৌকিক শাস্ত্রানভিজ্ঞ হইয়া কিরূপে এই দুরূহ সাধনের প্রক্রিয়ায় আপনার নিজ যত্নে সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহাতেই বৈষ্ণবচরণ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। যদিও তিনি গুরু পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্যের সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই।

যখন বৈষ্ণবচরণ ব্রাহ্মণীর কথা প্রমাণ করিয়া দিলেন, তখন পরমহংসদেব সম্বন্ধে মথুর বাবু ও অন্যান্য ব্যক্তির কিঞ্চিৎ বিশ্বাস জন্মিল। ব্রাহ্মণী পরমহংসদেবের নিকট ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব সেই সময়ে তন্ত্রোক্ত সাধনে নিযুক্ত হন এবং ব্রাহ্মণীর নিকট বিশেষ সহায়তা লাভ করেন। ইতিপূর্ব্বে যে বিল্ববৃক্ষের কথা কথিত হইয়াছে, তাহার নিম্নদেশে পঞ্চমুণ্ডী প্রভৃতি পঞ্চ তন্ত্রের যাবতীয় প্রক্রিয়া সমাধা করেন। * কথিত আছে যে, একদা পরমহংসদেব নরশির লইয়া সাধন

---

* তন্ত্র সাধকদিগের মধ্যে দুইটী প্রধান শ্রেণী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। যথা দক্ষিণাচারী ও বামাচারী। দক্ষিণাচারীরা সাত্ত্বিকভাবে ভগবতীর পূজাদি সমাপন করিয়া একান্ত মনে মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া থাকেন।

করিতে তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ বিকৃত ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণী তাহা অবলোকন করিয়া বলিয়াছিলেন, "ওকি বাবা! এই দেখ না আমি উহা কাম্‌ড়াইতেছি" বলিয়া তিনি আপনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তন্ত্রের সাধন স্বভাবতঃ অতি ভয়ানক। পঞ্চ মকার ব্যতীত সাধনের কার্য্য হইতে পারে না। যদিও অনেকে তাহার ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া শব্দার্থ বিপর্য্যয় করেন কিন্তু তাহা গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে।

তন্ত্র সাধনের সময় বহুল তান্ত্রিকের সমাগম হইত। পরমহংসদেব তাঁহাদের জন্য কারণ (মদ্য,) চাউল এবং ছোলাভাজা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। কালীঘাটের অচলানন্দ স্বামীও সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন। পরমহংসদেব নিজে কখন কারণ জিহ্বায় স্পর্শ করেন নাই। তিনি অঙ্গুলির অগ্রভাগে লইয়া কালী কালী বলিয়া কপালে ফোঁটা করিতেন। তন্ত্র মধ্যে ঊর্দ্ধমুখ তন্ত্র নামক যে গ্রন্থ আছে তাহার সাধন অতীব ভয়ঙ্কর এবং সাধারণের নিকট তাহা পরিচয় দেওয়া যায় না। তাহার প্রক্রিয়াগুলি অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ কিন্তু সাধকের তাহাতে কোন সংস্রব নাই। এই সাধন দ্বারা মনের শক্তি বিলক্ষণ রূপে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণীর দ্বারা পরমহংসদেব এই সাধন সম্পন্ন করিতেও বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলেন।

তন্ত্রোক্ত সাধনের পর তিনি কর্ত্তাভজা, নবরসিক, ও বাউল প্রভৃতি নানা প্রকার সাধন করেন। ব্রাহ্মণী এই সকল ধর্ম্ম প্রণালী অতি সুন্দর রূপে

বামাচারীদিগের কার্য্য কলাপ সম্পূর্ণ তামসভাবে পরিপূর্ণ। ইহাতে কুলস্ত্রীর পূজা করিতে হয়। কুলস্ত্রী অর্থে যে স্ত্রী কুলভ্রষ্টা বা পর পুরুষ গামিনী তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। নটস্ত্রী, কাপালী, বেশ্যা, রজকী, নাপিতের ভার্য্যা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রানী, গোপকন্যা, মালাকার কন্যা প্রভৃতি নয় প্রকার স্ত্রীকে কুলকামিনী কহে। পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চ মকার যথা মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন এবং খ পুষ্প অর্থাৎ রজঃস্বলা স্ত্রীলোকের রজও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বামাচারীদিগের লতা সাধন প্রভৃতি যে সকল কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। এই কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মভাবের যে কি উত্তেজনা হয়, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। এই মতের শব সাধনাটী অতি গুরুতর কার্য্য তাহার সন্দেহ নাই। কৃষ্ণপক্ষের মঙ্গলবারে অথবা অষ্টমী কিম্বা চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্মশানে, নদীতীরে, বিল্বমূলে কিম্বা অরণ্যে অস্বাভাবিক রূপে মৃতব্যক্তির দেহ আনিয়া তাহার পূজা করিতে হইবে। পূজান্তে মৎস্যাদি উপচার লইয়া উহার বক্ষোপরে উপবেশন পূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিতে হয়।

জানিতেন। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের চন্দ্রনাথ নামক পূর্ব্বদেশীয় এক ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণী আনাইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, পরমহংসদেবের যখন মহাভাব হইত, তখন তিনি বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। চন্দ্র অমনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া বলিতেন, "ও রামকৃষ্ণ ওকি?" কিন্তু সে কথায় পরমহংসদেবের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। কর্ত্তাভজাদিগের মতে সহজ জ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারণা আছে। তাঁহারা বলেন যে, বহির্জ্ঞানের সহিত অন্তর্জ্ঞান থাকিবে। ইহা অতি নিম্ন শ্রেণীর কথা। বৈদান্তিক নির্ব্বিকল্প-সমাধির ভাব তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। যে ভাব যোগীরা যোগ সাধন করিয়া লাভ করেন, যাহা মহাপ্রভুর প্রতি মুহূর্ত্তেই হইত, সেই নির্ব্বিকল্প সমাধি পরমহংসদেব কুম্ভকযোগ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যোগের দ্বারা যে সমাধির অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা অতিরিক্ত কষ্টসাধ্য; কিন্তু পরমহংসদেব সেই ভাব লাভ করিবার অতি সহজ প্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি মহাপ্রভুর ন্যায় কথায় কথায় বহির্চৈতন্য হারাইয়া ফেলিতেন। এমন কি একদা এই অবস্থায় তাঁহার গাত্রের উপরে গুলের অগ্নি পতিত হইয়া তথাকার মাংসপেশী ভেদ করিয়া গিয়াছিল, তথাপি তাঁহার সংজ্ঞা হয় নাই। পরমহংসদেবের উদরের বাম ভাগে যে একটী ক্ষত চিহ্ন ছিল, তাহা এইরূপে উৎপন্ন হয়। চন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কিছু করিতে না পারিয়া পরিশেষে স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

কর্ত্তাভজার সাধনের সময়ে তিনি বালী নিবাসী তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের নিকট মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেন। এই নিমিত্ত অনেকে অদ্যাপি তাঁহাকে কর্ত্তাভজা বলিয়া জানেন।

পরমহংসদেবের ভাবের ন্যায় ব্রাহ্মণীরও ভাব হইত। ব্রাহ্মণী বাৎসল্য ভাবে পরমহংসদেবের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে নানাবিধ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া তন্নিকটস্থ পল্লির মহিলাদের সমভিব্যবহারে বাম হস্তে রৌপ্যপাত্রে ক্ষীর নবনী প্রভৃতি ভোজ্য সামগ্রী লইয়া যে রূপে যশোদা গোপালের অদর্শনে দগ্ধ হৃদয়ে কাতর প্রাণে বৎসহারা গাভীর ন্যায় দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপে পরমহংসদেবের আবাস গৃহাভিমুখে ধাবিত হইতেন এবং তাঁহার বিরচিত গোপাল বিষয়ক গীত গান করিতে করিতে যেমন গৃহদ্বারে উপস্থিত হইতেন অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া যাইতেন। পরে অনবরত গোপাল নাম তাঁহার কর্ণ-বিবরে শ্রবণ করাইলে

চৈতন্য সম্পাদন হইত। এই ব্রাহ্মণী সম্বন্ধে নানাপ্রকার ঘটনা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু সাধারণের নিকট তৎ সমুদয় প্রকাশ করিতে এ ক্ষেত্রে কুণ্ঠিত হইলাম।

পরমহংসদেব অন্যান্য প্রকার সাধন করিতেন বটে কিন্তু কালীর মন্দিরে গমন করিতে কখন বিস্মৃত হইতেন না। ব্রাহ্মণীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেন। একদা কোন বিশেষ কারণে কালীর পূজায় ছাগ বলিদান হইয়াছিল। তাহার রুধিরের সরা যখনই দেবীর সম্মুখে প্রদত্ত হইল, ব্রাহ্মণী তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সদ্যত্যক্ত শোণিতাক্ত রম্ভা ও সন্দেশ এবং শুষ্ক শোণিত অম্লানবদনে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। পরমহংসদেব তাহা দর্শন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—*—

কথিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণী এবং বৈষ্ণবচরণের কথায় মথুর বাবু পরমহংসদেবকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি তন্নিমিত্ত তাঁহার সচ্ছন্দতার জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবের সহিত অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। রাসমণি দাসীও বুঝিতে পারিলেন যে, পরমহংসদেব প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ হইয়াছেন। যাহা হউক, মথুর বাবু এবং রাসমণি প্রভৃতি মন্দিরের কর্তৃপক্ষীয়েরা পরমহংসদেব সম্বন্ধে অতি উচ্চভাব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ক্রমে বুঝিলেন যে, পরমহংসদেবের সাধন ভজন অতি আশ্চর্য্য এবং অস্বাভাবিক প্রকারে সাধিত হইয়াছে। তাঁহারা জানিলেন যে পরমহংসদেব সাধারণ পরমহংসদিগের ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট নহেন। তাঁহার সাধারণ জৈবভাব বিলুপ্ত হইয়া শিবত্ব সঞ্চারিত হইয়াছে এবং তিনি যে কালী দেবীর বরপুত্র বিশেষ তাহার কোন সন্দেহ নাই। এমনও কখন কখন কেহ বলিতেন যে, হয় ত সেই রামপ্রসাদই পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময়ে পরমহংসদেবের বয়ঃক্রম অনুমান চব্বিশ পঁচিশ বৎসর হইবে। তাঁহার শরীর অতিশয় বলিষ্ঠ ছিল এবং রূপলাবণ্যে চিত্ত চমকিত হইয়া যাইত। পূর্ণযুবক রামকৃষ্ণকে কেহই যুবা বলিয়া জ্ঞান করিত না।

তাঁহাকে পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় সকলে ব্যবহার করিত। স্ত্রীলোকেরা তাঁহার সম্মুখে আসিতে কখন লজ্জা করিতেন না অথবা কোন মতে লজ্জার উদ্রেক হইত না। হৃদয় স্ত্রীলোক লইয়া তাঁহার সহিত যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল, রাসমণি এবং মথুর বাবুও তাহা জানিতেন; কিন্তু এমনই মনুষ্যের দুর্ব্বল মন, এমনই অবিশ্বাসী হৃদয় যে, এই বালকবৎ, উন্মাদবৎ, রামকৃষ্ণকে লইয়া ইন্দ্রিয় পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

কলিকাতার অন্তঃপাতী মেছুয়াবাজারে লচ্মীবাই নাম্নী বারাঙ্গনার সহিত পরামর্শ করিয়া পরহংসদেবকে তথায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। লক্ষীবাই একটী গৃহ মধ্যে ১৫।১৬ টী পূর্ণ যুবতীদিগকে অর্দ্ধোলঙ্গাবস্থায় রাখিয়াছিল। পরমহংসদেবকে সেই গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া মথুর বাবু অদৃশ্য হইলেন। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সময়ে পরমহংসদেব উলঙ্গাবস্থায় থাকিতেন। একখানি উত্তরীয় বস্ত্রের দ্বারা অঙ্গাবরণ থাকিত। উলঙ্গ রামকৃষ্ণদেব দেখিলেন যে, গৃহটী যুবতী গণ্ডলী দ্বারা পরিবৃত। তাহাদের রূপ লাবণ্যে, অঙ্গ সৌষ্ঠবে ও নয়নভঙ্গী দ্বারা মুনির মন, অকামী ও নপুংসকেরও চিত্ত বিকার উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকেরা একেই জগন্মোহিনী, তাহাতে আবার সেই দিন হরহৃদি বিহারিণী হরমোহিনীর স্নেহাঞ্চলাচ্ছাদিত রামকৃষ্ণের মনমোহনের অভিপ্রায়ে মোহিনী জালবিস্তীর্ণ করিয়া প্রাণপণে স্ব স্ব অভীষ্ট-সিদ্ধির মানসে প্রতীক্ষা করিতেছিল। পরমহংসদেব তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবামাত্র অমনই সকলকে "মা আনন্দময়ী! মা আনন্দময়ী!" বলিয়া মস্তকাবনত পূর্ব্বক প্রণিপাত করিলেন এবং তাহাদের মধ্য স্থলে উপবেশন করিয়া "মা ব্রহ্মময়ী, মা আনন্দময়ী" বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া যাইলেন। সমাধিকালে তাঁহার দুই নয়নে অনর্গল প্রেমাশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল। বারাঙ্গনারা পরমহংসদেবের ভাব অবলোকন করিয়া ভীতা হইল এবং সসব্যস্ত হইয়া কেহ বায়ু ব্যজন করিতে লাগিল ও কেহ অপরাধিনী হইয়াছি বলিয়া গললগ্ন কৃতবাসে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিল। এই ঘটনায় মথুর বাবু নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন এবং পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি বৃদ্ধি হইয়া গেল। তিনি তদনন্তর তাঁহার পাদপদ্মে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া কৃতদাসের ন্যায় আপনাকে বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

মথুর বাবুর পরীক্ষার কথা সকলেই শ্রবণ করিলেন, তাহাতে কেহ আশ্চর্য্য হইল এবং কেহ বা নানাপ্রকার দোষারোপ করিতে লাগিল। এই সময়ে অনেকের মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে রামকৃষ্ণ সিদ্ধ হইতে পারেন নাই, তবে ইন্দ্রিয় জয় পক্ষের কারণ এই যে, নানাপ্রকার স্নায়বীয় রোগ বশতঃ পুরুষার্থ হানি হইয়াছে, তন্নিমিত্ত স্ত্রীর নিকট গমন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। এইরূপে যাহার যে প্রকার স্বভাব তাহারা সেই প্রকারে পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে লাগিল। রাসমণিদাসীও একথা শ্রবণ করিলেন। তিনি নিজে পরমহংসদেবের সিদ্ধাবস্থা জ্ঞাত হইয়াও (বিষয়ীর মন এমনই দুর্ব্বল) যে তিনি পুনরায় তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। আমরা পরমহংসদেবের নিকটে শুনিয়াছি যে "একদিন সন্ধ্যার সময় আমি কুটীতে শয়ন করিয়া আছি, এমন সময়ে গিন্নির প্রেরিত দুইজন স্ত্রীলোক আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা দুই চারিটী অন্য কথা কহিয়া অমনি আমার (সৌজন্যের অনুরোধে লিখিতে পারিলাম না) ধারণ করিল। আমি মা! মা! মা! বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলাম। পরে আর আমার কোন জ্ঞান ছিল না। চৈতন্য লাভ করিয়া দেখি যে তাহারা আমার পদধারণ করিয়া রোদন করিতেছে।" পরমহংসদেব অমনি চরণ সঙ্কুচিত করিয়া, তাহাদের মা আনন্দময়ী বলিয়া নমস্কার করিলেন। স্ত্রীলোকদ্বয় তদনন্তর নানাপ্রকার অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে পরমহংসদেব স্ত্রীজাতিকেই প্রকৃতির অংশ জ্ঞানে মা বলিতেন। তিনি কালীর মন্দিরে যাইয়া প্রার্থনা করিতেন যে, "মা অবিদ্যাও তুই আর বিদ্যাও তুই। তুই মা গৃহস্থের কুলবধূ আবার তুই মা মেছোবাজারের খান্‌কী। মা, তুই উভয় রূপেই আমার মা। আমি তোর সন্তান।"

পরমহংসদেব দুইবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও তথাপি অব্যাহতি পাইলেন না।

একদা বৈষ্ণবচরণ পরমহংসদেবকে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কাছিবাগান নামক স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। সে স্থানে নবরসিক ভাবের লোকের বাসই অধিক। পরমহংসদেব তথায় উপস্থিত হইবামাত্র স্ত্রীলোকেরা আসিতে লাগিল এবং তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিল। এই স্ত্রীলোকেরা বারাঙ্গনা

নহে; কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মের এপ্রকার জঘন্য ভাব যে তাহা সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিতে অপারক হইতেছি। এই শ্রেণীর মতে প্রকৃতি সাধনই একমাত্র আনন্দ সম্ভোগের নিদান স্বরূপ; সুতরাং প্রকৃত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জলাঞ্জলী দিয়া পরকীয় রসাস্বাদনের বিকৃত ভাব সাব্যস্ত করিয়া তাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করাই ধর্ম্মের সার জ্ঞান করিয়া থাকে। এই ধর্ম্মের সহিত বৃন্দাবনের রাসলীলার সাদৃশ্য দেখান হয়; কিন্তু রাসলীলার প্রকৃত ভাবের অধিকারী কেবলপূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক সেই শৃঙ্গার-রসকাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। নবরসিকেরা শৃঙ্গার রসে আপনারা মাতিয়া থাকে। বৈষ্ণবচরণ পরম পণ্ডিত হইয়া তিনি এই মতটী বিশিষ্ট রূপে পোষকতা করিতেন। সে যাহা হউক নব রসিকেরা পরমহংসদেবেকে প্রাপ্ত হইয়া কোন যুবতী সসব্যস্ত হইয়া তাঁহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া ফেলিল এবং দ্বিতীয় যুবতী অতি কুৎসিৎ কার্য্যের ভাব দেখাইল। পরমহংসদেব বৈষ্ণবচরণকে তিরস্কার পূর্ব্বক তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। নবরসিকেরা তাঁহাকে "অটুট" বলিয়া জানিতে পারিল।

যখন পরমহংসদেবকে এইরূপে নানাবস্থায় ফেলিয়া পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার ইন্দ্রিয় বিকার সম্বন্ধে সকলেরই ভ্রম বিদূরিত হইল; তখন অন্য কেহ তাঁহাকে ভক্তি দেখান আর নাই দেখান, মথুর বাবু সর্ব্বাপেক্ষা বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পরমহংসদেব ইচ্ছামত কালীর পূজা করিতে যাইতেন। এ পূজা নিত্য পূজার মধ্যে পরিগণিত হইত না। কারণ পরমহংসদেবের উন্মত্তাবস্থা হইতেই হৃদয়ানন্দ তাঁহার কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। একদা তিনি পূজা করিতে গিয়া দেবীর জন্য যে সকলপুষ্প মাল্যাদি প্রস্তুত করা ছিল তাহা আপনার গলদেশে ধারণ পূর্ব্বক ও চন্দনাদি নিজ অঙ্গে প্রলেপন করিয়া সমাধিতে বসিয়াছিলেন। মন্দিরের কর্ম্ম-

চারীরা ইহাতে বিরক্ত হইয়া যাহাতে তিনি একাকী মন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারেন এমন যুক্তি করিয়াছিল; কিন্তু পরমহংসদেব যখন নিজের ভাবে মন্দিরে গমন করিতেন, তখন তাঁহাকে কোন কথা বলিবার কাহার সাহস হইত না। আর এক দিন তিনি পূজা করিতে গিয়া দেবীর পাদ-পদ্মে পুষ্প বিল্বদল প্রদান না করিয়া মন্দিরের মধ্যে ভৃত্য এবং অন্যান্য পদার্থ যাহা কিছু উপস্থিত ছিল তৎসমুদয় পূজা করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে কতকগুলি বিড়াল রাখিয়াছিলেন। পূজার সময় চিনি প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী কালীকে নিবেদন করিয়া না দিয়া তাহা বিড়ালদের খাইতে দিতেন ও আপনিও ভক্ষণ করিতেন। পরমহংসদেবের এই প্রকার স্বেচ্ছাচারী ভাব দর্শন করিয়া মন্দিরের তত্ত্বাবধারক যার পর নাই বিরক্ত হইয়া তৎ-সমুদয় মথুর বাবুর কর্ণগোচর করিল। মথুর বাবুর নিকট হইতে কোন প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পরমহংসদেবের মন্দিরে প্রবেশাধি-কার নিষিদ্ধ হইল। এই আদেশ দ্বারবানের প্রতি ভারার্পণ করার পর একদা পরমহংসদেব মন্দিরে প্রবেশ করায় তাহারা প্রথমে নিষেধ করিল; কিন্তু তিনি এমন ভাবে বিহ্বল হইয়া যাইতেছিলেন যে, সে কথা তাঁহার কর্ণ বিবরে প্রবিষ্ট হইল না। দৌবারিকেরা এতদ্দৃষ্টে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য প্রয়াস পাইল। পরমহংসদেব তাহাকে একটী মুষ্টাঘাত করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক ইচ্ছামত পূজা করিতে লাগিলেন। দ্বারবান এক মুষ্টাঘাতে এত অধির হইয়াছিল যে, সে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তত্ত্বাবধায়ক এই সংবাদে ক্রোধে অধির হইয়া নানাপ্রকার কাল্পনিক ভাবে তাহা মথুর বাবুকে নিবেদন করিয়া পাঠাইল। মথুর বাবু পরমহংসদেবের বিরুদ্ধে কর্ম্মচারীদিগের আতিশয্য বর্ণনা ও দোষারোপ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভট্টাচার্য্য মহা-শয়ের কার্য্যের প্রতি কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না। তাঁহার যাহা ইচ্ছা করিবেন। এই কথায় বৃত্তিভোগী কর্ম্মচারীরা বাহ্যিক নিরস্ত হইল বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ক্রোধে অপমানে, হতাশায় জর্জ্জরীভূত হইতে থাকিল।

পরমহংসদেবের প্রতি মথুর বাবুর এতাদৃশ ভক্তি এবং বাধ্যবাদকতা দেখিয়া সকলে মনে মনে স্থির করিল যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় মথুর বাবুকে "গুণ" করিয়াছে। তাহা না হইলে যে, মথুর বাবুর বিক্রমে সকলেই আতঙ্গে জড় সড় হইত, যে মথুর বাবুর নিকটে এক সময়ে পরমহংসদেব অগ্রসর

হইতে পারিতেন না, আজ সেই মথুর বাবু পরমহংসদেবের এতাদৃশ বশীভূত হইয়া বলিলেন যে, কালী পূজার উপকরণাদি ভক্ষণ করিয়াও নিস্তার পাইয়া গেলেন। হিন্দুদিগের পক্ষে এ কার্য্য নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। কালী যাহাদের ইষ্টদেবী ভগবতী স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী তাঁহার দ্রব্য একজন মনুষ্যে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল তাহাতে দ্বিরুক্তি না করা সামান্য কথার কথা নহে। সাধারণ লোকের পক্ষে একথা যার পর নাই অন্যায় এবং অবৈধ বলিয়া অবশ্যই পরিগণিত করিতে হইবে। কিন্তু মথুর বাবু বাতুল হন নাই, এবং তাঁহার বাহ্যজ্ঞানও বিলুপ্ত হয় নাই, তবে কেন তিনি পরমহংসদেবের এ প্রকার ব্যবহারে কোন কথা বলেন নাই; আমরা তাহার কারণ অবগত আছি। সে কথা স্থানান্তরে প্রকাশ করিব।

পরমহংসদেবের এই অন্যায় কার্য্য মথুর বাবু কর্তৃক পোষকতা হইলে তাহা রাসমণিরও কর্ণগোচর হইল। রাসমণি মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইয়াও মথুর বাবুর কথার প্রতি কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিলেন না। পরে একদিন তিনি স্বয়ং মন্দিরে আগমন করিলেন।

রাসমণি পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দেবী-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে পরমহংসদেবও তথায় রহিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্ব্ব হইতে যখনই মন্দিরে আসিতেন পরমহংসদেবের নিকট দুই একটী শক্তি বিষয়ক গীত শ্রবণ না করিয়া যাইতেন না। এবারেও তদ্রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। পরমহংসদেব গান করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাসমণির মন গানে সংলগ্ন না হইয়া কোন মোকদ্দমায় চলিয়া গেল। পরমহংসদেব তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে করাঘাত করিয়া যথোচিত ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। রাসমণি দাসী স্ত্রীলোক বিশেষতঃ মন্দিরের কর্ত্রী তাঁহাকে তাঁহার বেতন ভোগী পূজক করাঘাত করিল এ সংবাদে সকলেই ভীত হইল এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই বার কি হয় বলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল, রাসমণি এইরূপ অপমানে ক্রোধ কিম্বা অভিমানিনী না হইয়া বিমর্ষভাবে মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া যাইলেন। কি জন্য তাঁহার কিছুই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন না, তাহা কাহারও অনুমানের গোচর নহে। হয় তাঁহাকে ব্রাহ্মণ জ্ঞানে, না হয় বাতুল বলিয়া অথবা তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়াছেন সুতরাং সিদ্ধ পুরুষ বিবেচনায় নিস্তব্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক তখন কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু সময়ান্তরে পরমহংসদেবকে

নিভৃতে পাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মথুর কি আপনাকে কিছু বলিয়াছিল * ?" পরমহংসদেব কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে পরমহংসদেবের মনে যখন যে কোন ভাবের উদ্রেক হইত, তখন তিনি তাহারই অনুষ্ঠান করিতেন এবং সেই কার্য্যের সহায়তা হেতু এক জন সাধু আসিয়া উপস্থিত হইতেন। অনন্তর তাঁহার মনে ভগবান রামচন্দ্রের ভাব আসিয়া অধিকার করিল †। তিনি বুঝিলেন যে হনূমানই রামচন্দ্রের প্রকৃত ভক্ত। তাঁহার অনুবর্ত্তী না হইলে রামচন্দ্রের চরণ লাভ করা যায় না। হনূমানের অহৈতুকী ভক্তি ছিল। তিনি পৃথিবীতে যে কোন পদার্থ দেখিতেন তাহার মধ্যে রামচন্দ্রকে দেখিতে না পাইলে তাহা গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠা ভক্ত অতি বিরল। তিনি জানিতেন যে সর্ব্বত্রেই রামচন্দ্র আছেন, রাম ব্যতীত কোন বস্তু হইতে পারে না, তথাপি রামচন্দ্রের নবীন দুর্ব্বাদল সদৃশ রূপ ভিন্ন অন্য কোন রূপ দেখিতে চাহিতেন না। এই নৈষ্ঠিক ভক্তি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত পরমহংস-দেব হনূমানের ভাব সাধন করিয়াছিলেন। যখন তাঁহাতে পবন সুতের ভাবাবেশ হইত তখন তাঁহার নিকট কেহই থাকিতে পারিত না। তাঁহার হাব ভাব ও শারীরিক অন্যান্য লক্ষণে মনুষ্য স্বভাবের বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইত। তিনি তদবস্থায় রঘুবীর শব্দ এমন উচ্ছ্বাস ও গম্ভীর বাক্যে বলি-তেন, যেন তিনি তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভ করিয়া সম্বোধন করিতেছেন বলিয়া সকলের জ্ঞান হইত। এই অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে পেয়ারা ও

---

* রাসমণির মনে হইয়াছিল যে মথুর বাবু পরমহংসদেবের দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিবার মানস করিয়াছিলেন।

† কোন কোন ভক্ত বলেন যে তিনি কালী দর্শন করিবার পূর্ব্বে রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাধন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মুখ হইতে শোণিত নিস্থত হইয়াছিল। একথা সত্য হইলেও তিনি হনূমানের ভাব সাধন যে পরে করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অন্যান্য সাময়িক ফল সংস্থাপন না করিলে তিনি মহা গোলযোগ উপস্থিত করিতেন। ফল পাইলে তাহা আপনি কামড়াইয়া ভক্ষণ করিতেন। কখন তিনি কাপড়ের লাঙ্গুল পরিয়া বৃক্ষের উপর বসিয়া থাকিতেন এবং রাম রঘুবীর বলিয়া চীৎকার করিতেন। পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন যে, এই সময়ে তাঁহার ইঞ্চি প্রমাণ লাঙ্গুল জন্মিয়াছিল, উহা পরে খসিয়া যায়। এই সময়ে পরমহংসদেব জনৈক রামাৎ সন্ন্যাসীর নিকট রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই সাধুর একটী পিতলের রাম মূর্ত্তি ছিল। এই মূর্ত্তির প্রতি পরমসংহদেবের বাৎসল্যভাব হইত। শুনিয়াছি তিনি যখন বাগানের যে কোন স্থানে যাইতেন, রামলালা (ঐ মূর্ত্তির নাম) তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিতেন। সময়ে সময়ে পরমহংসদেব তাঁহার সহিত এমন ভাবে বাক্যালাপ করিতেন যে, সে কথা শুনিলে বাস্তবিক ঘটনা বলিয়া নিশ্চয় বুঝা যাইত। একদা বৃষ্টির সময়ে পরমহংসদেব বহির্দ্দেশে গমন করিতেছিলেন, পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "ফের যদি অমন করিয়া বিরক্ত করিবি তাহা হইলে তোকে প্রহার করিব। শুনলিনে—আরে পাগল বাগানে কাদা হইয়াছে, পায়ে লাগিবে। বৃষ্টিতে গা মাথা ভিজিয়া যাইবে, শেষ কি জ্বর করিয়া বসিবি।" আর একদিন গঙ্গাস্নানের সময় পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন "দেখ্ অত করে জলে থাকিস্‌নে—অতজলে যাস্‌নে ডুবিয়া যাইবি। আয় তোর গা পরিষ্কার করিয়া দি।" আমরা তাঁহার মুখে এই সকল কথা শুনিয়াছি। তিনি আরও বলিতেন যে রামলালা দেখিতে ঠিক তিন চারি বৎসরের বালকের ন্যায়। অমন অঙ্গ সৌষ্ঠব ও দেহের কান্তি কেহ কখন দেখে নাই। তাহার কথা শুনিলে আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাইতে হয়। রামলালা মূর্ত্তিটী পরমহংসদেবকে সাধু দিয়া গিয়াছিলেন। উহা অদ্যাপি দক্ষিণেশ্বরে আছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

পরমহংসদেব এইরূপে রাম বিষয়ক সাধনান্তে তিনি নানাবিধ সম্প্রদায়ের সাধুর সহিত মিলিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট দীক্ষিত এবং সাধন দ্বারা

তাহাতে সিদ্ধ মনোরথ হইয়া পরিশেষে শ্রীদাম সুবলাদির ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সখ্য প্রেমের সাধন আরম্ভ করেন। তখন তিনি ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া মনের সাধে অলকা তিলকা দ্বারা সুসজ্জিত করিতেন। কখন বা চরণে নূপুর পরাইয়া রুণু ঝুনু শব্দ শ্রবণ করিয়া আ পনিও আনন্দে নৃত্য করিতেন। কখন বা গহন কাননে কৃষ্ণের অদর্শন বশতঃ বুক চাপড়াইয়া রোদন করিতেন। কখন বা এই বিরহান্তে কৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক "ভাই কানাই! আর তোকে ছেড়ে দোবোনা ভাই,তোর অদর্শনে প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠে,আমরা দশদিক্ শূন্যময় দেখি। এইনে ভাই, ফল খা"—ইত্যাকার কত কথাই বলিতেন। কখন বা তিনি নন্দ যশোদার বাৎসল্য ভাবে গোপাল গোপাল বলিয়া রোদন করিতেন এবং সময়ান্তরে গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করিতেন।

কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় এইরূপ বিবিধ সাধন করিয়া পরমহংসদেব সখিভাবের সাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি সকল সাধনের পূর্ব্বে ভক্ত বিশেষের শরণাগত হইয়াছিলেন, সখি ভাবেও তাহাই দৃষ্ট হইয়াছিল। সখিভাবে দুই বার সাধন করেন। প্রথমে তিনি অষ্ট নায়িকার ভাবাবলম্বন পূর্ব্বক নায়িকাদিগের বেশ ভূষায় বিভূষিত হইয়া ও দক্ষিণ হস্তে চামর গ্রহণান্তর মহাকালের বক্ষঃস্থল বিরাজিত মহাকালীর সম্মুখে দাসীর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে নৃত্য করিতেন এবং চামরের দ্বারা বায়ু ব্যজন করিয়া দেবীর শরীরে শৈত্যোৎপাদন করিতেন।

দ্বিতীয় প্রকার সখিভাবে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতি রাধিকার অষ্ট সখির সেবিকা হইয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীর বেশ ধারণ করিবার নিমিত্ত মস্তকে পরচুলা, নাসিকায় বেসর (পশ্চিমাঞ্চলের নাসাভরণবিশেষ) চক্ষে অঞ্জন, ললাটে সিন্দুর, নাসাপৃষ্ঠে তিলক, অধরে তাম্বুল, কর্ণে কর্ণাভরণ, কণ্ঠে হার, বক্ষে কাঁচুলী এবং তদুপরি ওড়্না, বাহু-যুগলে নানাবিধ অলঙ্কার, পরিধানে পেশোয়াজ, কটি দেশে চন্দ্রহার এবং চরণদ্বয়ে নূপুর পরিধান করিতেন। এই অলঙ্কার ও পরিচ্ছদাদি মথুর বাবু প্রদান করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব বেশভূষা ধারণ পূর্ব্বক কোন স্থানে উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলী পুটে বলিতেন "কোথায় ললিতা, কোথায় বিশাখা, একবার আমার প্রতি দয়া কর। আমি অতি হীন অতি দীন আমার উপায় কি হইবে? আমি শুনিয়াছি যে শ্রীমতি তোমাদের প্রেমে চির-বিক্রীত। তোমাদের দয়া ব্যতীত রাধার সাক্ষাৎ

কেহ পাইতে পারে না। আমি পূজা জানিনা, আমি ভজন জানিনা, আমি তোমাদের দাসীর দাসী আমায় দয়া কর। তোমাদের দয়া না হ'লে রাধাকে পাব না।" এই বলিতে বলিতে তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইয়া আসিত, তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অনর্গল অশ্রু নির্গত হইত এবং বাক্য গদগদ হইয়া আসিত। তিনি তখন সরোদনে কীর্ত্তনের সুরে বিরহ বিষয়ক গান করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। তিনি অচিরাৎ শ্রীমতির দর্শন লাভ করিলেন। তিনি এক দিন বসিয়া আছেন এমন সময়ে দেখিলেন একটী অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য বিশিষ্ট পূর্ণযুবতী তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তিনি অলঙ্কারে বিভূষিতা। তাঁহার পরিচ্ছদ জরির পেশোয়াজ্ কাঁচুলী এবং ওড়না। মস্তকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কোঁকড়ান কেশজাল, ইহার কিয়দংশ মুখের উপরে পতিত হইয়া বদন কান্তির অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছিল। পরমহংসদেবের প্রতি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাসিলেন এবং উভয় হস্তের অঙ্গুলির মধ্যে অঙ্গুলি স্থাপন পূর্ব্বক সঞ্চাপন করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। তদবধি তাঁহার সখিভাব চলিয়া গেল। তিনি কখন বলিতেন "কোথায় শ্রীমতি—কোথায় রাধে প্রেমময়ী একবার আমায় দয়া কর। তুমি অষ্ট সখির শিরোমণি, তুমি মহাভাবময়ী মহাভাব প্রসবিনী তুমি দয়া কর। তোমার দয়া না হইলে আমি ত কৃষ্ণের দেখা পাবো না। কৃষ্ণচন্দ্র তোমার, তোমার প্রেমে তিনি বাঁধা আছেন। তুমি ছাড়িয়া দিলে তবে তাঁহার দেখা পাইব। তাই বলি আমায় দয়া কর। কৃষ্ণ দর্শনের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুলিত হইতেছে। নিষেধ মানে না, বারণ শোনে না, কৃষ্ণ এনে দেখাও। দেখ সখি চেয়ে দেখ আমার প্রাণ কোথায়? প্রাণ ওষ্ঠাগত, প্রাণ বক্ষ-পিঞ্জর ভেদ করিয়া বুঝি বহির্গত হইয়া যায়। আমায় রক্ষা কর, কৃষ্ণ দিয়ে প্রাণ বাঁচাও। তোমার কৃষ্ণ আমি লইব না তোমাকেই ফিরাইয়া দিব। আমি কেবল একবার চক্ষের দেখা দেখিব।" এইরূপে রোদন করিতে করিতে তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেন। ক্রমে তিনি আপনাকেই শ্রীমতি জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার ন্যায় স্বভাব প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণকে স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কখন বা কৃষ্ণের অদর্শনে এইরূপ গীত গান করিতেন।

শ্যামের নাগাল পেলুম না লো স'ই।
আমি কি সুখে আর ঘরে র'ই॥

শ্যাম যে মোর নয়নের তারা,
তিলেক আধো না দেখলে সই হই দিশে হারা ;
আবার শ্যামের লেগে ভেবে ভেবে দিশে হারা হ'য়ে র'ই।
শ্যাম যদি মোর হতো মাথার চুল,
আমি যতন করে বাঁদ্‌তুম বেণী স'ই দিয়ে বকুল ফুল ;
আমি বন পোড়া হরিণের মত ইতি উতি চেয়ে র'ই।
শ্যাম যখন ওই বাজায় গো বাঁশী,
আমি তখন যমুনাতে জল লয়ে আসি ;
আমার কাঁকের কলসী কাঁকে রৈল, শ্যামের বদন পানে চেয়ে র'ই।

গীত সমাপ্তির সহিত তাঁহারও বাক্য সমাপ্ত হইয়া আসিত। তিনি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন, চক্ষের পলক পতিত হইত না। বদনে হাস্যের ছটা, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা কি যেন নির্দ্দেশ করিতে-ছেন। এই ভাব ক্রমে অবসাদন হইয়া আসিলে তবে পূর্ব্ব প্রকৃতিস্থ হইতে পারিতেন।

পরমহংসদেবের সখিভাব সাধন কালীন তাঁহার স্বভাব চরিত্র ও শারীরিক গঠন অবিকল স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার নিকটে আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে এই সময়ে প্রতি মাসে তাঁহার বস্ত্রে শোণিত চিহ্ন দেখিতে পাইতেন *।

* আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এই কথায় আমাদের বাতুল বলিয়া সাব্যস্থ করিবেন, তাহার ভুল নাই ; কিন্তু তাঁহাদের গোচরার্থ বিলাতের একটী ঘটনা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। যদ্যপি কোন বিষয়ের প্রগাঢ় সংস্কার জন্মিয়া যায় তাহা হইলে সেইরূপ কার্য্য প্রকাশ পাইবার কোন প্রকারে কেহই প্রতিবন্ধক জন্মাইতে পারে না। একদা ডাংওয়ার্ডেন আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন যে, এক ব্যক্তির স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তাহার শিশু সন্তান যখনই ক্রন্দন করিত সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উহাকে বক্ষোপরে স্থাপন পূর্ব্বক মাতার ন্যায় সান্ত্বনা করিতে প্রয়াস পাইত। শিশুটী যতক্ষণ বক্ষের উপর থাকিত ততক্ষণ সে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া যাইত। কিছু দিন এই ভাবে দিন যাপন করিয়া ঐ পুরুষটীর স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়াছিল। সংস্কারে (Impression) যা হইবার নহে তাহাও হইতে পারে। এই মর্ম্মে ইংরাজী পুস্তকে ভুরি ভুরি উপাখ্যান আছে। ইংরাজী পুস্তকের দোহাই না দিলে আজ কাল কেহ কোন কথা বিশ্বাস করেন না তন্নিমিত্ত এ প্রস্তাবের অবতারণা করিতে হইল।

সখিভাবে অবস্থিতি কালে পরমহংসদেবস্ত্রীলোকদিগের সহিত অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন। কথায় কথায় সহজ জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া তিনি জড়ভাব প্রাপ্ত হইতেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে এই ভাবকে ব্রাহ্মণী *মহাভাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।* মহাভাব সেই জন্য পরমহংসদেবের এই সাধনার ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না, তাহা কুম্ভক যোগের পূর্ব্বে আপনা হইতেই উদয় হইত। এই মহাভাবের বৃত্তান্ত চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বিশেষ রূপে বিবৃত আছে। মহাভাব সাক্ষাৎ শ্রীমতি স্বরূপিনী। মহাভাব উপস্থিত হইলে অশ্রু, কম্প, স্বরভঙ্গ, পুলক, স্বেদ, উন্মত্ততা, এবং মৃতপ্রায় লক্ষণ সকল পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ভাব মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জীবন বৃত্তান্তেই শুনা গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অপ্রকটাবস্থার পর এ পর্য্যন্ত আর কোন ব্যক্তিতে মহাভাবের লক্ষণ দেখা যায় নাই। পরমহংসদেবের শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই ভাব হইতে দেখা গিয়াছে এবং চৈতন্য প্রভুর সমকালীন তাঁহার শিষ্যদেরও ভাবাবেশ হইত বলিয়া জনশ্রুতি আছে কিন্তু মহাভাব শ্রীচৈতন্য এবং পরমহংসদেব ব্যতীত আর তৃতীয় ব্যক্তির দেখা যায় নাই।

পরমহংসদেব একদিকে সখিভাবে মহাভাব লাভ করিয়া কৃষ্ণ চন্দ্রের সহিত বিহার সুখ সম্ভোগ করিতেন এবং অপর দিকে দিবা রজনী স্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে বাস করিতেন বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। তাঁহার মনের কথা কেহ বুঝিতে পারে নাই। মথুর বাবু তখন পরমহংসদেবের নিতান্ত অনুগত ছিলেন। তাঁহাকে না দেখিলে তিনি চতুর্দ্দিক শূন্যময় বোধ করিতেন, সুতরাং সর্ব্বদাই কাছে কাছে থাকিতেন। তাঁহার আহারের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। পরিধানের নিমিত্ত বালুচরের অত্যুৎকৃষ্ট চেলী আনাইয়া তিনি আপন হস্তে পরাইয়া দিতেন। শীতকালে বহু মূল্যের বস্ত্রাদি প্রদান করিতেন কিন্তু পরমহংসদেব উহা এক বারের অধিক ব্যবহার করিতে পারিতেন না। মূল্যবান পরিধেয় বস্ত্রগুলি প্রায়ই তিনি ছিঁড়িয়া ফেলিতেন এবং একখানি ১৫০০ টাকা মূল্যের শীত বস্ত্র সম্বন্ধে আমরা শুনিয়াছি যে, মথুর বাবু আপনি বারাণসীর শাল খানি গায়ে জড়াইয়া দিয়া ছিলেন। পরমহংসদেব কিয়ৎকাল পরে ভাবাবেশে কহিতেছিলেন "মন, এর নাম শাল, ভ্যাড়ার-লোম্, আগুনে দিলে পুড়িয়া যায়। তখন এমন দুর্গন্ধ নির্গত হয় যে কেহ তাহাতে সুস্থির হইতে পারে না। এই শালের

দাম ১৫০০ টাকা। ইহা গায়ে দিলে মনে রজোগুণ বাড়িয়া যায়। সাধারণ লোক এ শাল গায়ে দিতে পারে না। তাহারা কাল মোটা চাদর ব্যবহার করিয়া থাকে। এ শাল গায়ে দিয়া তাহাদের নিকটে যাইলে মন গরম হইয়া উঠে, সেই লোকদিগকে হীন বলিয়া জ্ঞান হয়। পাছে তাহাদের গায়ে গা ঠেকে এই জন্য অতি গর্ব্বিত ভাবে ওরে তুই ছোট লোক সরে যা—এইরূপ অহঙ্কারের কথা বাহির হইয়া থাকে।" এই প্রকার আপনা আপনি বিচার করিতে করিতে সেই শাল খানি মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করতঃ তদুপরি 'থু থু' করিয়া থুৎকার প্রদান করিতেছিলেন, এমন সময় মথুরবাবু আসিয়া তাহা দর্শন করিলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল এবং মনে করিলেন, এ মহাপুরুষের নিকট আর আমি অর্থের গরিমা প্রকাশ করিব না।

তিনি অতঃপর পরমহংসদেবকে জানবাজারস্থ বসত বাটীর অন্তঃপুরে লইয়া রাখিলেন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মথুর বাবু তাঁহাকে না দেখিলে বড়ই কাতর হইতেন, সে বিষাদ আর তাঁহার থাকিল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

পরমহংসদেব জানবাজারে আসিয়া সর্ব্বদাই অন্তঃপুরে বাস করিতেন। অন্তঃপুর বাসিনীগণ সকলেই তাঁহাকে অতি আদরের ধন বলিয়া জানিতেন। পরমহংসদেবকে পুরুষ বলিয়া কেহ লজ্জা করিত না কিম্বা সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিতে কেহ সঙ্কুচিত হইত না। বাটীর মহিলাগণ কেহ তাঁহাকে সন্তানের ন্যায় বোধ করিতেন এবং কেহ বা সাধু বলিয়া জ্ঞান করিতেন। মথুর বাবুর কন্যারাই প্রায় তাঁহাকে তৈলাদি মর্দ্দন পূর্ব্বক স্নান করাইয়া দিতেন। পরমহংসদেব সময়ে সময়ে ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া উলঙ্গ হইয়া পড়িতেন; কিন্তু তাহাতে কাহারও মনে বিকার উপস্থিত হইত না। বরং তাঁহারাই বস্ত্রাদি পরাইয়া দিতেন।

পরমহংসদেবের যখন যে স্থানে যাইবার ইচ্ছা হইত তিনি স্থানাস্থান কালাকাল কিম্বা ব্যক্তি বিশেষ বিচার না করিয়া তথায় চলিয়া যাইতেন।

কখন কখন মথুর বাবু সস্ত্রীক বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে, পরমহংসদেব ঘরে ঢুকিয়াই চলিয়া আসিতেন, মথুর বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "বাবা তুমি আবার আমাদের দেখে সরে যাও কেন? তোমার কি অন্য কোন রকম ভাব আছে? বালকেরা যাহা বুঝিতে পারে, বাবা তোমার যে সে বুদ্ধিও নাই।" যে দিবস মথুরের মনে কোন প্রকার ভাবোদয় হইত, সেই দিবস পরমহংসদেবকে আপনার নিকট শয়ন করিতে বলিতেন। পরমহংসদেব তাহাতে কোন প্রকার আপত্তি করিতেন না।

শুনা গিয়াছে যে, পরমহংসদেব তথায় প্রায় স্ত্রীবেশে থাকিতেন। যখন কোন প্রতিমা পূজাদি হইত, দেবীর বিসর্জ্জনকালীন পরমহংসদেব অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় বরণ করিতে যাইতেন। তখন তাঁহাকে এমন দেখাইত যে, অবগুণ্ঠণভাবে না থাকিলে, তাঁহাকে ছদ্মবেশী বলিয়া কেহ চিনিতে পারিত না।

একদা জগদ্ধাত্রী প্রতিমূর্ত্তি নিরঞ্জন সময় বরণাদি সমাধা হইবার পর মথুর বাবু রোদন করিয়া পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন "বাবা আমার মা চলিয়া যাইতেছে, আমি কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিব।" পরমহংসদেব মথুর বাবুর বক্ষোপরি হস্তার্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন "ভয় কি, আনন্দময়ী মা তোমার হৃদয়ে আছেন।" মথুর বাবু তখন নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে তাঁহার চক্ষুদ্বয় লোহিতবর্ণ হইয়া গেল। বাক্য নিঃসরণ রহিত হইল এবং ক্রমে চেতনাবস্থা অন্তর্হিত হইয়া আসিল। সহসা এই প্রকার অবস্থা পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত সকলেই ভীত হইলেন এবং চিকিৎসকাদি দ্বারা রোগোপশমের ব্যবস্থা হইতে আরম্ভ হইল; কিন্তু কিছুতেই উপকার হইল না। মধ্যে মধ্যে রোগী "বাবাকে নিকটে আন" এইরূপ প্রলাপ বলিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব মথুর বাবুর এই প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন এবং মাতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি অতঃপর মথুরের নিকটে গমন পূর্ব্বক গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তদবধি সময়ে সময়ে মথুর বাবুর ভাবাবেশ হইত।

পরমহংসদেব যে কি কারণে স্ত্রী-বেশে স্ত্রী-মণ্ডলীর মধ্যস্থলে বাস করিয়া

ছিলেন, তাহা বোধ হয়, কেহ কেহ বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু সাধারণ লোকেরা ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, নানাবিধ কুভাবে তাহা পর্য্যবসিত করিয়া লইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব সখিভাব সাধনের সময়ে জানবাজারে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি যে নিরবচ্ছিন্ন এস্থানে থাকিতেন, তাহা নহে। কখন দুই দিন, কখন দশ দিন এবং কখন বা মাসাধিকও হইত। তাঁহার যখনই মন যাইত, সময় অসময় বিচার না করিয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসিতেন।

সখিভাবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই স্থানে কিছু আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য। কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্মই সর্ব্বপ্রশংসনীয় এবং আনন্দপ্রদ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। সকাম কর্ম্মে অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে, নিরানন্দের সীমা থাকে না; কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মে কর্ম্মফল আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কেবল কর্ম্ম করিতে হয়। ইহাতে ফলাফলের প্রত্যাশা না থাকায় কর্ম্মীর মনে উৎসাহ কিম্বা নিরুৎসাহ একেবারেই স্থান পাইতে পারে না। ফলে এ ক্ষেত্রে সর্ব্বদা আনন্দ বিরাজিত থাকে।

সখিভাব নিষ্কাম ধর্ম্মের ন্যায় আকাঙ্ক্ষা বিহীন সাধনা বিশেষ। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শুভ মিলন করাইবার জন্যই সখিদিগের নানাবিধ আয়োজন হইত; নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল না। এই নিমিত্ত সখিদিগের ভাবকে নিষ্কাম ভাব বলা হয়।

তত্ত্বপক্ষে সখিভাবকে মনোবৃত্তিদিগের সহিত তুলনা করা যায়। জীবাত্মা বা লিঙ্গ শরীর অর্থাৎ যে চৈতন্যাংশ পাঞ্চভৌতিক দেহ লইয়া স্বতন্ত্র হইয়া রহিয়াছেন, স্বভাবতঃ উহা জড় জগতের বিবিধ প্রকার আবরণে আবৃত থাকিয়া তাহার নিজ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া এক কিম্ভূত-কিমাকার ধারণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকেন। এই জীবাত্মাকে প্রকৃতি বা রাধাও বলা যাইতে পারে। সখি স্বরূপা মনোবৃত্তিদিগের সাহায্যে জীবাত্মার পূর্ব্বাবস্থা, ক্রমে বিদূরিত হইয়া পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণ লাভের সুবিধা হয়। মোহাদি বিবিধ মায়াবরণ হইতে জীবাত্মা স্বতন্ত্র হইলে, উহার স্বপ্রকাশ কহা যায়। এই সময়ে যে সকল অবস্থা সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে সাধারণ কথায় ভাব বলে। পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণ মস্তক গহ্বরে সহস্র দল কমলোপরে বাস করিতেছেন। মনো-

বৃত্তি সখিদিগের সহিত জীবাত্মা সতী নিম্নদেশ হইতে বিবিধ ভূমি * অতিক্রম করিয়া যখন সহস্রদলে আগমন পূর্ব্বক পরমাত্মার সহিত সুমিলন কার্য্য সমাধা করেন, তখন সখিগণ ঐ যুগলমূর্ত্তির সন্নিধানে আদেশ পালনার্থ অবস্থিতি করে। এই অবস্থাকে মহাভাবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অবস্থা বা সমাধি কহা যায়। জীবাত্মার স্বস্থান পরিত্যাগ কাল হইতে পরমাত্মার সন্নিহিত হওয়া পর্য্যন্ত সময়কে মহাভাব বলে।

যে পর্য্যন্ত জীবাত্মা জৈব সম্বন্ধ সংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন, সে পর্য্যন্ত তিনি জীব নামে অভিহিত। জীবাত্মা স্বস্থান চ্যুত হইলে, ঐ জীবের জীবন নাশ হইয়া মৃত্যুদশা সমাগত হইয়া থাকে, যাহাকে মৃত্যু কহে। যোগ সাধনের দ্বারা যখন মৃত্যুর ন্যায় অবস্থা লাভ হয়, তাহাকেই সমাধি কহা যায়। সমাধিস্থ হইলে, পুনরায় ইচ্ছা করিয়া জৈবভাবে আসা যায়। সাধারণ মৃত্যু হইতে সমাধির এইমাত্র প্রভেদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—*—

পরমহংসদেব পূর্ব্বোল্লিখিত মতে জ্ঞান ও ভক্তি পন্থার বিবিধ শাখা পরিভ্রমণ পূর্ব্বক প্রাচীন হিন্দুদিগের বিধিবদ্ধ ও রাগানুগা ধর্ম্ম সকল এবং তাঁহার নিজ কল্পিত প্রণালী বিশেষ সাধন করিয়া তাহাদিগের চরমাবস্থায় উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, সকল মতের পরিণাম ফল এক প্রকার। বৈদান্তিক মতের পরমহংসদিগের যে অবস্থা, তন্ত্র মতের সিদ্ধাবস্থায় কৌল-দিগের † তদ্রূপ ভাব। কর্ত্তাভজাদিগের 'সহজ' বা 'আলেখ', নবরসিকের 'অটুট', বাউলদিগের 'সাঁই' এবং বৈষ্ণবদিগের 'মহাভাব' প্রভৃতি নানাবিধ ভাবের সহিত মিলাইয়া লইলেন; কিন্তু সাধনের শেষাবস্থায় কাহার সহিত কাহার পার্থক্য দেখিতে পাইলেন না। তিনি বিবিধ ধর্ম্মের আভ্যন্তরিক অবস্থা এই প্রকার প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিলেন যে, সাধারণ পক্ষে ধর্ম্ম জগৎ

---

* তন্ত্রমতে ইহাকে চক্র কহে।

† দক্ষিণাচারীদিগের মত বিশেষকে কুলাচার কহে; কুলাচারে সিদ্ধাবস্থাকে কৌল কহে।

দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আছে। প্রথম জ্ঞান বা আত্ম-তত্ত্ব পক্ষে এবং দ্বিতীয় ভক্তি বা লীলা পক্ষে। বৈদান্তিক, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবশাস্ত্রাদি প্রথম শ্রেণীর এবং পৌরাণিক মতাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। বৈদান্তিক মতে "সেই আমি বা আমিই সেই" অর্থাৎ যাহা কিছু আছে, ছিল বা হইবে, তাহা আমার অন্তর্গত অথবা আমি ছিলাম, আছি এবং হইব। ফলে আমি ব্যতীত আর কিছুই নাই, ছিল না এবং হইবে না। যেমন পাঞ্চভৌতিক বিষয়ীভূত জগৎ। ইহার সর্ব্বস্থানেই পাঁচের সত্ত্বা উপলব্ধি হইয়া থাকে। যদ্যপি কোন একটী পদার্থ লইয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে কারণ ধরিয়া দেখিলে, তাহার অন্তর্গত স্থিত পদার্থ সর্ব্বত্রেই রহিয়াছে, জ্ঞান দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। *কিন্তু পার্থিব পাঞ্চভৌতিক পদার্থ ব্যতীত মনুষ্য দেহে যে পরম পদার্থ আছে তাহা অন্য কোন স্থানে সেরূপ* ভাবে না থাকায় তাহারা ইচ্ছাক্রমে নানাবিধ পদার্থ সৃষ্টি এবং ধ্বংস করিতে পারে। এই নিমিত্ত মনুষ্য জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিয়াছে। জড়জগৎ হইতে চলিয়া গিয়া অর্থাৎ যোগাবলম্বন পূর্ব্বক স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ পর্য্যন্ত গমন করিলে, আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া যাইবে, ইহাই বৈদান্তিক সমাধি। ভক্তিমতে মহাভাব লাভ করিয়া যে সমাধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও তদ্রূপ। এ স্থলে কার্য্যের তারতম্য থাকিলেও ফলের প্রভেদ হইতেছে না। তন্ত্রমতে পাশ বদ্ধ জীব পাশমুক্ত শিব বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, মায়াবরণ দ্বারা জীবাত্মাকে স্বস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই আবরণের নামান্তর পাশ। এই আবরণ বা পাশ বিচ্ছিন্ন হইলে, জীবের জীবত্ব বিলুপ্ত হইয়া শিবত্ব বা মঙ্গলময় কার্য্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবমতে এই অবস্থাকে ভাব কহে। শিবত্ব লাভ করা তন্ত্রের শেষ কথা নহে। শিবের শবত্ব দশা হইলে, তবে ব্রহ্মময়ীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এস্থলেও মৃত্যুর ভাব বা সমাধি নিরূপিত হইতেছে। কালী প্রতিমূর্ত্তি তাহার দৃষ্টান্ত বিশেষ। বাউল প্রভৃতি অন্যান্য মতে যখন মহাকারণে বা পরমাত্মা লইয়া কথা, তখন তাহাদের স্থূল ভাবের তারতম্য থাকিলেও প্রাচীন মতের সহিত অনৈক্য হইতেছে না।

দ্বিতীয় মতে নিত্য লীলা বা সেবা সেবক ভাবের কার্য্য হইয়া থাকে। এ ভাবে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার একীকরণ করিতে ভক্তের ইচ্ছা হয় না। ভাব বিশেষের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ঈশ্বর এবং জীব এই অবস্থায় থাকিয়া

লীলা রসামৃত পান করিয়া থাকে। জীব এবং ঈশ্বর, এই ভাবে যদিও দ্বৈত জ্ঞানের কার্য্য হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনের সময়ে সাধকের আর নিজের অস্তিত্ব বোধ থাকিতে পারে না। তাহার মন প্রাণ সেই মূর্ত্তিতে এককালে সংলগ্ন হইয়া যায়। এই অবস্থাটীর সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত অবস্থার সাদৃশ্য আছে।

পরমহংসদেব এই প্রকার বিবিধ ধর্ম্মের আদি কারণ বহির্গত করিয়াও নিশ্চিন্ত হইলেন না। তাঁহার প্রাণ যারপরনাই উৎসাহিত হইয়া শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তদনন্তর তিনি অন্যান্য ক্ষুদ্র ও বিবিধ সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদয় আমরা বিশেষ অবগত নহি। হিন্দু মত সামঞ্জস্য করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে,হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ কি? ক্রমে ভাবময়ের এই নব ভাব তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে অমনি মাতার নিকট মনোভাব নিবেদন করিলেন। করুণাময়ীর অপার করুণা, অকপট ভক্তের মনোরথ কিরূপে পূর্ণ করিতে হয়, দয়াময়ী মা বিনা আর কে জানিবেন? ভক্তের বাসনা মা আপনি প্রেরণ করেন এবং আপনি তাহা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থাও করিয়া দেন। পরমহংসদেবের জীবন তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

পরমহংসদেবের বালকবৎ প্রার্থনা যেমন মাতার শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইল, অমনি তিনি সে প্রার্থনা অচিরাৎ পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন।

গোবিন্দ দাস নামক এক ব্যক্তি, জাতিতে কৈবর্ত্ত দমদমার সন্নিকটে গুপ্তভাবে মহম্মদীয় ধর্ম্মমতে সাধন ভজন করিতেছিলেন। তিনি এই সময়ে পরমহংসদেবের নিকটে আগমন পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া তিন দিন যথানিয়মে তাঁহাকে কার্য্য করাইলেন। তিন দিনের পর তাঁহার সে ভাব অপনীত হইয়া গেল। এই দিনত্রয় তিনি কালীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, কালীর প্রসাদ ভক্ষণ করেন নাই এবং তাঁহার ভিতরের হিন্দু ভাব পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল।

মুসলমান ধর্ম্ম সাধন করিয়া তিনি হিন্দুদিগের জ্ঞান এবং ভক্তি মতের সহিত তাহা মিলাইয়া পাইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের যে প্রকার সাধন প্রণালীর অভিপ্রায়, মহম্মদীয় ধর্ম্মে তিনি তদ্রূপ দেখিয়াছিলেন। মহম্মদ বলিয়াছিলেন যে কেহ কাফেরদিগকে সংহার করিতে পারিবে, সে পরকালে কর্জ্জলনয়না অপ্সরার সহিত সুখে বাস করিবে। কাফের অর্থে তিনি রিপুদিগকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কারণ শরীরের মধ্যে রিপুগণই কাফের বা বিজাতীয়

ধর্ম্মাবলম্বী, তাহাদের বিনাশ করিলে বা রিপুগণ প্রদমিত হইলে, বিদ্যা শক্তির প্রকাশ পায়। বিদ্যার সহবাস ব্যতীত মনুষ্যের সুখ সচ্ছন্দতা লাভের দ্বিতীয় উপায় কোথায়?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

ধর্ম্মবীর পরমহংসদেব যদিও মুসলমানদিগের ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইলেন, তথাপি তাঁহার হৃদয় নিশ্চিন্ত হইল না। তাঁহার হৃদয়ে এখন ক্ষুধা নিহিত ছিল। তিনি এক দিন দেবমন্দিরের সন্নিহিত যদুলাল মল্লিকের উদ্যান-স্থিত বাটীর কোন গৃহে দণ্ডায়মান ছিলেন। সেই স্থানে মেরির ক্রোড়ে শায়িতবালক যীশুর চিত্রপট ছিল। পরমহংসদেব তাহা জানিতেন না। কিঞ্চিৎ কাল পরে তাঁহার মন হইতে পূর্ব্বের ভাব এককালে বহির্গত হইয়া যাইল। তিনি তদ্দৃষ্টে চিন্তাযুক্ত হইলেন এবং মা মা বলিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। পরে যীশুর প্রতিরূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন যে, যীশুর চিত্রপট হইতে জ্যোতি আসিয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতেছে। তিনি তদনন্তর স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অন্যান্য সাধনের ন্যায় যীশুর ভাব তাহার তিন দিবস ছিল। তিনি গৃহে বসিয়া বড় বড় গির্জ্জে দেখিতে ও পাদ্রীদিগের উপদেশ শুনিতে পাইতেন। এ কয়েক দিন তাঁহার মুখে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম কিছুই নির্গত হয় নাই অথবা তাঁহাদের কথা মনেও উদয় হয় নাই। অতঃপর তিনি একখানি যীশুর চিত্রপট আনিয়া গৃহে রাখিয়াছিলেন। উক্ত ছবি খানি অদ্যাপি দক্ষিণেশ্বরে আছে। এই ছবি খানিতে যীশু এই ভাবে চিত্রিত আছেন। কোন সমুদ্র তীরে তিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে একটী বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল প্রভু! ঈশ্বরকে পাইব কিরূপে? যীশু এই কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সমুদ্র সলিলে কিয়দ্দূর প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ অবাক হইয়া পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে যীশু বৃদ্ধের গ্রীবা ধারণ পূর্ব্বক জলে নিমর্জ্জিত করিয়া কিয়ৎকাল বিলম্বে ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার প্রাণের এখন অবস্থা কি রূপ? বৃদ্ধ

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সভয়ে কহিল "প্রাণ যায়" যীশু কহিলেন, "ঈশ্বরের বিরহে যখন এইরূপ প্রাণের অবস্থা হইবে, তখনি তাঁহাকে লাভ করিবে।" পরমহংসদেব একথা প্রথমই প্রাণে প্রাণে নিজে জানিয়াছিলেন এবং সেই রূপ সাধনাও করিয়াছিলেন। প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেও অবিকল ঐ প্রকার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। তিনি বিরহে কেশোৎপাটন ও মুখ ঘর্ষণ করিতেন এবং সমাধির স্থলে প্রাণ যাইবার কথা স্পষ্টাক্ষরে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই সকল কারণে যীশুর মতও মহাকারণে এক বলিয়া মিলাইয়া লইলেন।

পরমহংসদেব বহু আড়ম্বর ভালবাসিতেন না। এক কথায় তাঁহার কার্য্য মিটাইয়া লইতেন। তিনি বলিতেন "আপনাকে মরিতে হইলে একটী আলপিন কিম্বা একটী বেলকাঁটা হইলেই যথেষ্ট হইবে; কিন্তু অপরকে সংহার করিতে হইলে বড় অস্ত্রের প্রয়োজন। সেইরূপ তত্ত্বকথা জানিতে ইচ্ছা হইলে, এক কথায় জানা যায়। অধিক আড়ম্বরে গোলোযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভবনা।" তিনি সেই জন্য আরও বলিতেন, "এক-জ্ঞান জ্ঞান বহুজ্ঞান অজ্ঞান।" পরমহংসদেবের এবম্প্রকার জ্ঞান আপনি হৃদয়ে সমুদিত হইয়াছিল এবং ইহার পোষকার্থ তিনি একটী দৃষ্টান্তও পাইয়াছিলেন। একদা একটী সাধু আসিয়াছিলেন। ঠাকুর কিম্বা অন্য কোন যন্ত্র তাঁহার ছিল না। পূজাকালীন তাঁহার ঝুলির ভিতর হইতে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ বাহির করিয়া পূজা করিতেন। পরমহংসদেব ঐ গ্রন্থখানি দেখিয়া নাম জিজ্ঞাসা করায় সাধু উহা রামায়ণ বলিয়া পরিচয় দিলেন। পরমহংসদেবের মনে বিশ্বাস হইল না। তিনি জোর করিয়া গ্রন্থখানি খুলিয়া দেখিলেন যে, উহার প্রথম পাতে বৃহৎ অক্ষরে রাম শব্দটী লেখা আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ভাব বুঝিলেন এবং মহাভাবে নিমগ্ন হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

যীশুর সাধনান্তে তাঁহার সকল সাধনই একপ্রকার শেষ হইয়া আসিল। তিনি বৌদ্ধমতে সাধন করিয়াছিলেন কি না তাহা আমরা শ্রবণ করি নাই, তাঁহার গৃহে প্রস্তরের একটী বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়াছি। ইতি পূর্ব্বে পূজা তর্পণাদি সমুদয় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি সময়ে সময়ে সমস্ত দিন পুষ্প চয়ন করিয়া কালীর পূজা করিতেন। এক দিন দেখিলেন যে, যাঁহার জন্য পুষ্প সংগ্রহ করা হয়, তাঁহারই শরীর এই বিশ্বকাণ্ড। বৃক্ষ সকল ফলফুলে তাঁহার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তিনি এই দেখিয়া আপনি হাসিয়া উঠিলেন

এবং বলিলেন "প্রসাদি ফুল লোককে দিয়ে পূজা করিব" তদবধি পূজা করা বন্ধ হইয়া গেল।

পরমহংসদেব সাধন কার্য্য হইতে অবসর পাইয়া যখন যেমন অবস্থায় পতিত হইতেন, তখন তিনি সেই ভাবে আনন্দ করিতেন। তিনি কখন সাধুদিগের সহিত সদালাপে সময়াতিবাহিত করিতেন এবং কখন বা হরি নামামৃত পান করিয়া তাহাতেই বিহ্বল হইতেন এবং হুঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে মহাভাবে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন। কখন বা দেবী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চামর ব্যজন এবং করতালি দিয়া শক্তি বিষয়ক গান করিতেন। কখন বা রাধাকৃষ্ণের সম্মুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের যুগল রসের রসিক হইয়া রস পান করিতেন। কখন বা জয় শিব জয় শিব বলিয়া সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। কখন বা কোথায় রাম রঘুবীর বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেন এবং কখন বা স্বর গ্রামের আরোহণ এবং অবরোহণ হিসাবে রাম রাম রাম বলিয়া মাতিয়া উঠিতেন এবং সমষ্টিরে হনুমানের দাস্যভাবের আশ্রয় লইয়া ভাবোন্মত্ত হইয়া পড়িতেন। কখন বৃন্দাবনের নন্দকিশোর ও রাই কিশোরীর কৈশোরিক ভাবাবলোকন পূর্ব্বক প্রেমানন্দে ভাসিয়া যাইতেন। কখন বা বেদান্ত-সূত্রের সূত্র ধরিয়া নিরাকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মে মিলিত হইয়া জড় সমাধি প্রাপ্ত হইতেন। কখন বা ঘোষপাড়া, বাউল, নবরসিক ও পঞ্চনামী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক উপাসকদিগের সহিত আলেখ, সহজ ও রূপসাগর সম্বন্ধীয় গীত গান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন। কখন বা ব্রহ্মময় জগৎ জ্ঞানে বড় ছোট, ভদ্র অভদ্র, ধনী নির্ধনী, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সকলকেই প্রণাম করিতেন। কখন বা পিপীলিকাদিগকে চিনি প্রদান করিয়া বেড়াইতেন, কখন বা দূর্ব্বাদলোপরি পাদ নিক্ষেপ করিয়া আপনাকে আপনি তিরস্কার করিতেন এবং উহারা পাদদলিত হইয়া অশেষ ক্লেশ পাইয়াছে, হয় ত কাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া রোদন করিতেন এবং অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। কখন বা উদ্ভিদগণের মধ্যে চৈতন্য বিরাজিত আছেন বলিয়া এত প্রবল ভাবোদয় হইত যে তিনি একটী পুষ্প কিম্বা পাতা ছিঁড়িতে পারিতেন না এবং কাহাকে তাহা করিতে দেখিলে, তিনি অতিশয় কাতর হইতেন। তিনি সর্ব্বদা পণ্ডিতদিগের সহিত সহবাস করিতেন এবং তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রাদি শ্রবণ করিয়া দিন যাপন করিতেন। তিনি কখন যাত্রা,

কখন চণ্ডীর গীত এবং কখন বা কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন। এই গীতাদি শ্রবণ করিবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত, মথুর বাবু সে সকল আনন্দের সহিত সহ্য করিতেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে,পরমহংসদেব বিবাহের পর আর তাঁহার স্ত্রীর মুখাবলোকন করিতে অবসর প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার স্ত্রী যখন ষোড়শ বর্ষে উপনীত হন, সেই সময় শ্বশুরালয়ে গমন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তাঁহার মনের প্রকৃত ভাব মথুর বাবুকে জানাইয়াছিলেন। তিনি সে সকল কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া পড়েন। তন্ত্রমতে নাকি ষোড়শী পূজার বিধি আছে। তিনি তাঁহার স্ত্রীতে সেই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। মথুর বাবু চেলির সাড়ী, শঙ্খ এবং অলঙ্কারাদি পূজার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পরমহংসদেব তাঁহার নিজ বাটীতে না যাইয়া একেবারে শ্বশুরালয়ে গমন করেন। তথায় পৌঁছিয়া তিনি বাটীর বহির্ভাগে অবস্থিতি না করিয়া অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার স্ত্রী তখন ঐ স্থানে কোন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সহসা একজন অপরিচিত ব্যক্তি উন্মাদের ন্যায় এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার জননীকে ডাকিয়া বলিলেন, মা দেখ দেখ কে একজন পাগল এসেচে। তাঁহার জননী গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রথমে তাঁহার চক্ষু আগন্তুক ব্যক্তিকে চিনিতে পারিল না, কিন্তু প্রাণ কাঁদিয়া হুহু করিয়া উঠিল। যেন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া পাগলকে ক্রোড়ে লইতে মন ধাবিত হইল এবং তাঁহাকে সহস্র চুম্বন করিয়াও যেন প্রাণে তৃপ্তি মানিল না। তাঁহার সহসা চিত্ত বিকার ও প্রাণ উচাটন হওয়ায় তিনি ভাবিলেন, এ পাগল কে? কাহার পাগল? অমনি তিনি চিনিলেন, অমনি বৎসহারা গাভীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া 'বাবা রে এই কি আমার অদৃষ্টে ছিল' বলিয়া, পরমহংসদেবের সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার তনয়া

অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তখন কে যে পাগল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

পরমহংসদেবের স্ত্রী এতক্ষণে তাঁহার অমূল্য রত্ন চিনিলেন। তখন লজ্জা দেবী তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আর পূর্ণরূপে সেই বদনকান্তি নিরীক্ষণ করিতে দিল না। তিনি অবগুণ্ঠণ ভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর পরমহংসদেব তাঁহার অভিমত পূজাদি যথানিয়মে সম্পন্ন করিবার সমুদায় আয়োজন করিয়া লইলেন। পূজার সময়ে তাঁহার স্ত্রীকে আল্পনা দেওয়া পীঁড়ার উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন। তিনি দ্বিরুক্তি করিলেন না। পরমহংসদেব তাঁহার চরণদ্বয়ে ফুল বিল্বপত্রাদি সহ পূজা করিলেন এবং জপ করিবার যে মালা ছিল তাহাও চিরদিনের মত অঞ্জলী প্রদান করিলেন। তদবধি তাঁহার জপ তপ ফুরাইয়া গিয়াছিল।

পরমহংসদেবের অভিপ্রায় কেহই বুঝিতে পারিল না। তাঁহার শাশুড়ী ইহাতে ক্রোধান্বিতা হইয়া তাঁহাকে কত কি কটুকাটব্য বলিয়াছিলেন। তাঁহার অপরাধ কি? মায়িক সম্বন্ধ অতি বিভীষিকাপ্রদ, তাহার অন্যথা হইবার নহে। তিনি না জানাইলে কি প্রকারে জানিবেন যে সাক্ষাৎ শিব তাঁহার জামাতা। তাঁহার সৌভাগ্য এত উচ্চ তাহা কেমন করিয়া তিনি বিশ্বাস করিবেন? যাহা মনুষ্যের ভাগ্যে যুগযুগান্তরেও কখন কেহ সংঘটিত হইতে দেখে নাই, তাহা তত্ত্বজ্ঞান বিরহিত মায়িক ভাবপ্রধান স্ত্রীলোকের হৃদয়ে কেমন করিয়া স্থান পাইবে? বিবাহের পর যদিও তিনি সর্ব্বদা শুনিতেন যে, তাঁহার রামকৃষ্ণ বাতুল প্রায় হইয়া কখন্ কি করেন, কখন্ কি বলেন, কখন ঠাকুর পূজা করেন এবং কখন আপনি ঠাকুর হইয়া বসেন। যদিও তিনি জানিতেন যে, রামকৃষ্ণের আর পূর্ব্ববৎ জ্ঞানকাণ্ড কিছুই নাই, আপন পর বিচার করিয়া কার্য্য করেন না, স্বদেশের কিম্বা স্ব-সম্পর্কীয় কাহার কথায় সম্বন্ধ রাখেন না, এবং কেহ নিকটে যাইলে শিষ্টাচারের অনুরোধ রক্ষাও করেন না। যদিও তিনি বিলক্ষণরূপে অবগত ছিলেন যে, যে বস্তু লইয়া জগৎ সংসার, যাহার ছায়া অবলম্বনপূর্ব্বক ব্যক্তিগণ দেশ বিদেশ গমন করিয়া মস্তকের ঘর্ম্ম ভূমিতে নিক্ষেপণ দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে, যাহার ভ্রূকুটি ভঙ্গের আতঙ্কে কষ্ট-সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে প্রিয়কর দ্রব্য যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে, যাহার অন্তত মৌখিক বদন-সুধা শ্রবণ করিয়া শ্রবণ-বিবর ধন্য করিবার জন্য যাহারা

তদুপযুক্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে, দীর্ঘ প্রবাস জনিত হতাশ হুতাশনে যাহাদের হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে প্রজ্জলিত হইয়া আশারূপ ভস্মাচ্ছাদন দ্বারা সদাই সন্তপ্ত করিয়া রাখে, সেই উত্তাপ নিবারণের নিমিত্ত যাহারা জলাধিপতির শরণাপন্ন হইয়া নেত্র জল বরিষণ করিয়া থাকে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, যদি কখন তিনি দেশে আসেন এবং স্ত্রীর মুখাবলোকন করেন, তাহা হইলে তাঁহার আশা মিটিবে। কিন্তু বিধাতার বিধি বিপরীত হইয়া গেল। স্ত্রীকে স্ত্রী বলিয়া ত স্বীকার করিলেন না; তাঁহাকে মাতৃ স্থানে উপবেশন করাইয়া পূজা করিয়া ফেলিলেন। কন্যার এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া মার প্রাণ কি দিয়া প্রবোধ মানিবে? তিনি তনয়ার সর্ব্বনাশ দেখিয়া দশদিক্ শূন্যময় দেখিলেন। জামাতার সম্মুখে কন্যা উপবিষ্ট রহিয়াছে, জামাতার সহিত কন্যার বাক্যালাপ হইতেছে, তথাপি জামাতা-কন্যায় সম্বন্ধ নাই, একথা কে বুঝিবে এবং কেই বা বুঝাইয়া দিবে? সুতরাং তাঁহার দুঃখ সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়া রহিল। পরমহংসদেব দ্বিরুক্তি করিলেন না।

পরমহংসদেবের স্ত্রীর মনের ভাব বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি ষোড়শবর্ষে পতিত হইলে কি হইবে, তাঁহার তখন পর্য্যন্ত কুমারীভাব ছিল। পতি কাহাকে বলে, তাহা তাঁহার সে পর্য্যন্ত জ্ঞান হয় নাই, তন্নিমিত্ত এ ক্ষেত্রে তিনি ভালমন্দ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি ত সামান্য স্ত্রী নহেন। যাঁহার পতি সহস্র সহস্র অনাথ অনাথিনীর পতি, যাঁহার পতি অশেষ পাতকের পতিতপাবন স্বরূপ, যাঁহার পতি ব্রহ্মাণ্ডপতির হৃদয়মণি, তাঁহার পত্নী কি সাধারণ ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র পশু প্রকৃতি বিশিষ্ট হইতে পারেন? শাস্ত্রে বলে পুত্রের জন্য স্ত্রী পুরুষের প্রয়োজন। মা গো! তুমি যে সহস্র সহস্র পুত্র কন্যার জননী! তোমাকে কি মা কুক্কুর শৃগালের অবস্থায় পতিত হইয়া মা হইতে হইবে? তখন মাতা হয় ত তাহা বুঝিতে না পারিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাঁহার মনে কিম্বা প্রাণে পতির আভাস জনিত কিছু মাত্র ভাবান্তর হয় নাই। তদনন্তর পরমহংসদেব পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সাধন ভজন এক প্রকার সমাপন করিয়া পরমহংসদেব (তাঁহার এ নামটী আর পরিবর্ত্তিত হয় নাই) কিছুদিন মথুর বাবুর সহিত আনন্দে দিন যাপন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ঈশ্বরের শক্তি ও তাঁহার অলৌকিক কার্য্য সম্বন্ধে নানা প্রকার উপদেশ দিতেন। একদিন কথায় কথায় মথুর বাবু কহিলেন যে, "বাবা ঈশ্বরের সকলই অলৌকিক, তাঁহার বিরুদ্ধে কে কথা কহিতে পারে? কিন্তু তিনি যাহা একবার করিয়াছেন, তাহা আর পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। যেমন মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত সে নিয়মের আর পরিবর্ত্তন হইল না। এই দেখুন জবা ফুল। যে গাছে লাল ফুল হয়, তাহাতে লাল ব্যতীত সাদা ফুল কখনই হইতে পারে না।" পরমহংসদেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তোমাদের এমন স্থূল বুদ্ধি না হইলেই বা এত দুর্দ্দশা ঘটিবে কেন? যে ঈশ্বরের অপার মহিমা, অনন্ত শক্তি, যাঁহার কার্য্যের গভীরতা স্থির করিতে মনুষ্য বুদ্ধি একেবারে অপারগ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার শক্তি লইয়া বিচার করিতে যাওয়া যার পর নাই নির্ব্বোধের কর্ম্ম। বল দেখি, সমুদ্রে কত জল ও তাহার ভিতরে কি আছে এবং কি নাই?" এই প্রকার বিচারে মথুর বাবুর বিশেষ কোন দোষ হয় নাই। যদিও তখন থেকেই এ প্রদেশে ঊনবিংশ শতাব্দির ঢেউ লাগিতে আরম্ভ হইয়াছিল, যদিও তখন থেকেই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছিল। তথাপি তখনও এ প্রদেশে প্রাচীন কুসংস্কার ঈশ্বরে বিশ্বাস করা, একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। যদিও তখন থেকেই লোকেরা জড় বিজ্ঞানের আলোক পাইয়া স্থূলের স্থূল-কার্য্য-কলাপ অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল, তথাপি তেত্রিশ কোটী দেবীর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি সমূহ রূপে ছিল, সেই জন্য মথুরবাবু পরমহংসদেবের কথায় আর প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না। পরমহংসদেব যে কথা মথুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া মথুরের বিদ্যা বুদ্ধিতে তখন সংকুলান হয় নাই বটে, কিন্তু ঐ প্রশ্ন যদ্যপি অদ্য একজন প্রকৃত ইংরাজী বিজ্ঞানবিদ্ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তিনিও মাথা চুলকাইয়া একজন মূর্খের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

পর দিন প্রাতঃকালে পরমহংসদেব গঙ্গাতীরে পদশ্চালন করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, একটী লাল জবা ফুলের গাছে এক বোঁটায় একটী লাল আর একটী সাদা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মথুর-বাবুকে ডাকাইয়া দেখাইলেন, এবং বলিলেন ঈশ্বর যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন এই জন্যই তিনি ঈশ্বর। মনুষ্যেরা আপনার ওজনে ঈশ্বরকে দেখিতে চায়, আপনার শক্তির দৌড় হিসাব করিয়া ঈশ্বরের শক্তির ইতর বিশেষ করিয়া থাকে। তুমি কখন তাঁহার শক্তির প্রতি তিলার্দ্ধ সন্দেহ করিও না বা কার্য্য দেখিয়া কারণ নিরূপণ করিতে অগ্রসর হইওনা। মথুর বাবু অবাক্ হইয়া রহিলেন। কিন্তু ধন্য পশ্চাত্য শিক্ষা! ধন্য ইংরাজ বাহাদুর! ধন্য তোমাদের ইংরাজী শিক্ষার ফল! চক্ষে দেখিলে, কর্ণে শুনিলে, হস্তে স্পর্শ করিলে, যে বস্তু তোমরা দেখ নাই, তাহা আমাদের ধর্ম্ম সম্বলিত বা সাধু মহাত্মা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইলে কোন মতে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে নাই বলিয়া যে গুরুমন্ত্র প্রদান করিয়াছ, তাহার অধিকার অতিক্রম করিয়া যাইবে কে? মথুর বাবু কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে তাঁহার মনে হইল হয়ত পরমহংসদেব দুইটী ফুল এক বোঁটায় কোন কৌশলে সংলগ্ন করিয়া দিয়া একটা বুজরুকী দেখাইতেছেন। তিনি এই কথা মনে করিয়া তন্ন তন্ন পূর্ব্বক উহা পরীক্ষা করিয়া লইলেন। তাঁহার বুদ্ধি বিদ্যা পরাজিত হইল। তখন কোন দিকে পলাইতে না পারিয়া বলি-লেন "বাবা ঈশ্বরের মহিমা কি এ তোমারই মহিমা *।

একদিন জানবাজারের বাটীতে পরমহংসদেব মথুর বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী, একত্রে উপবেশন করিয়া আছেন এমন সময়ে তীর্থাদি সম্বন্ধে কথোপ-কথন আরম্ভ হইল। নানাবিধ মতামতের দ্বারা তীর্থ যাত্রা ভাল কিম্বা মন্দ বিচার হইবার পর মথুর বাবুর স্ত্রী কাশী বৃন্দাবনাদি ভ্রমণ করিবার জন্য মনের সাধ ব্যক্ত করিলেন। মথুর বাবু তাহাতে অসম্মত হইয়া বলি-লেন, অনর্থক অর্থ ব্যয় এবং শারীরিক ক্লেশ ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? ঠাকুর সম্মুখে রহিয়াছেন আবার ঠাকুর দেখিবে কি? পরমহংসদেব এ কথা প্রতিবাদ করিয়া পূর্ব্ব প্রচলিত

---

* মথুর বাবুর এ কথা বলিবার বিশেষ ভাব ছিল। তিনি নাকি ইতি-পূর্ব্বে পরমহংসদেবকে তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি রূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

প্রথা কাহার রহিত করিবার অধিকার নাই বলিয়া মথুর বাবুর স্ত্রীর মত সমর্থন করিলেন। মথুর বাবুর স্ত্রীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তীর্থে গমন করিবেন বলিয়া তখনি সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন। মথুর বাবু কহিলেন, "যদ্যপি বাবা গমন করেন তাহা হইলে আমি যাইব নতুবা তোমাকে একেলা যাইতে হইবে।" পরমহংসদেব তাহা স্বীকার করিলেন।

অতঃপর শুভ দিনে শুভক্ষণে মথুর বাবু সস্ত্রীক হইয়া পরমহংসদেবের সহিত অতি সমারোহে তীর্থ পর্যাটনে বহির্গত হইলেন। পরমহংসদেবের সেবার নিমিত্ত পূর্ব্বোল্লিখিত হৃদয়কে সমভিব্যাহারে রাখিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

কাশীধামে উপস্থিত হইয়া পরমহংসদেব কাশীনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিলেন। দর্শন কথাটী প্রয়োগ হইল বটে কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে দেব দেবী দর্শন করা প্রায় ঘটিয়া উঠিত না। কখন ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিয়াই তাঁহার ভাবাবেশ হইয়া যাইত, তখন ধরাধরি করিয়া তাঁহার জড়বৎ দেহটীকে লইয়া গিয়া ঠাকুরের সমক্ষে সংস্থাপিত করা হইত। কখন বা মন্দিরের নিকট পৌঁছিবামাত্র আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলিতেন এবং কখন বা ঠাকুরের নিকট পর্য্যন্ত যাইতে পারিতেন। ফলে সাধারণ লোকেরা যে প্রকারে প্রাণ ভরিয়া ঠাকুর দর্শন করে সে প্রকার দর্শন পরমহংসদেবের কখনই ভাল করিয়া ঘটে নাই। তথাপি ঠাকুর দর্শন করিবার আড়ম্বর পূর্ণ মাত্রায় হইত। তিনি কি দেখিতেন, কি বুঝিতেন এবং তাঁহার প্রাণেই বা কি হইত, অথবা বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া অন্তর্দৃষ্টিতে কি দেখিতেন, তাহা আমরা স্থূল দ্রষ্টা কি করিয়া অনুমান করিতে পারিব? কাশীর লোকেরাও আশ্চর্য্য মানিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ক্ষণে ক্ষণে মানুষটী অচেতন হইতেছেন এবং ক্ষণে ক্ষণে আবার বীর ভাবে আনন্দ-

সূচক গান করিতেছেন, সাধুর ন্যায় পরিচ্ছদাদি নাই * কোন সাম্প্রদায়িক লক্ষণ দ্বারা ও লক্ষিত নহেন এবং সঙ্গে একজন বিশেষ ধনী ব্যক্তি এমন ব্যক্তি কে? ইত্যাকার নানাবিধ লোকে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিত। তাহারা কাশীবাসী, বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে বাস করে বটে কিন্তু সেকাল আর নাই। কাল প্রভাবে কাশীর লোকেরাও সাধু চিনিল না। চিনিবে কি? স্থূলদৃষ্টি হলো কাল ধর্ম্ম। কাশীতে দেখে কেবল দণ্ডী আর মাথা ল্যেড়া পরমহংস। শোনে কেবল দর্শন শাস্ত্রের বাক্‌বিতণ্ডা, আত্মগরিমা এবং কর্ম্ম কাণ্ডের মোটা মোটা কথাগুলি। তাহাদের অন্তর্দৃষ্টি নাই—চিনিবে কিরূপে? পাণ্ডারাও তদ্রূপ। তাঁহাদের কথা গণনার বহির্ভূত। বিশ্বনাথ যাঁহাদের ব্যবসা, তাঁহাদের কথা কাহার সহিত তুলনা করিবার নাই। পরমহংস-দেবের কাশী যাত্রায় কোন ব্যক্তির তত্ত্ব পক্ষের কোন রূপ সুবিধা হয় নাই, কিন্তু তাঁহার দ্বারা অর্থ ঘটিত বিশেষ উপকার অনেকেরই হইয়াছিল। মথুর বাবু, যেমন ধনী লোকের নিয়ম, তথাকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে কিছু দান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে পর, তাহা কিরূপে প্রদান করিতে হইবে, পরমহংসদেব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যেক পরিবারের বালক বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী যতগুলি পরিজন ছিল, গণনা করিয়া প্রত্যেককে এক টাকার হিসাবে প্রদান করিতে বলিয়াছিলেন। মথুর বাবু তাহাতে দ্বিরুক্তি করেন নাই। তদনন্তর তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিশেষ সুখী হইয়া কাশী হইতে বৃন্দাবনে গমন করেন। এ স্থানে পৌঁছিয়া তিনি দেবাদি দর্শন করণানন্তর স্থান বিশেষে বিশেষ প্রকার পূজাদি দেওয়াইয়া বন পরিক্রম সমাধা করেন। এই স্থানে তিনি গুপ্তভাবে বৈষ্ণব মতে ভেক ধারণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে যাইয়াও তিনি কাশীর ন্যায় বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। তথায় প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগী একটী ব্যক্তিরও সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন নাই। পরমহংসদেব এক দিন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,

---

* পরমহংসদেবকে কখন সাধুর বেশ ভূষায় লোক সমাজে অথবা তাঁহার বাসস্থানে দেখিতে পাওয়া যাইত না। যখন তিনি যে যে সাধন করিয়াছিলেন তখন সেই সেই পন্থানুরূপ বেশ ভূষা করিতেন তাহার পর আর সে সকল পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন না। তিনি অধিক দিন একখানি মোটা চাদর গায়ে দিয়াই কাটাইয়াছিলেন, পরে বস্ত্র পরিধান করিতেন মাত্র। সর্ব্বশেষে ভক্তদিগের কথায় পিরাণাদিও ব্যবহার করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে আসিয়া কি করিলাম? সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যেমন তেঁতুল গাছটী এখানকার তেঁতুল গাছও তেমন, সেখানকার পক্ষীগুলি যেমন এখানকার পক্ষীরাও তেমন, সেখানকার রাধাকৃষ্ণ যেমন এখানকার রাধাকৃষ্ণও তেমন, সেখানকার মানুষগুলো যেমন এখানকার মানুষগুলোও তেমন। তবে কি জন্য এত দূর আসিলাম?

পরমহংসদেব বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, বৃন্দাবনে যাইয়া শাস্ত্রোক্ত বৃন্দাবন দেখিবেন, সেই গোপ গোপীর নিষ্কাম প্রেম তরঙ্গের রঙ্গ দেখিবেন, এখন যে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় চিনে বাজারের দোকানদার হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তিনি যেন জানিয়াও জানেন নাই। যে বৃন্দাবনে নিষ্কাম ধর্ম্মের খেলা, আজ সেই বৃন্দাবনে সকাম ব্রতের জীবন্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। মুখে রাধাকৃষ্ণ, হৃদয় কপটতায় পরিপূর্ণ। শ্রীবৃন্দাবনের এইরূপ দশা দেখিয়াই পরমহংসদেব আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কেহই চিনিতে পারিল না। কিন্তু বৃন্দাবন বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াস্থলী, প্রেমময়ী রাধা যে স্থানের অধীশ্বরী, তথায় যে প্রেমিক প্রেমিকা একেবারে পরিশূন্য হইবে, তাহা কদাপি হইবার নহে। যেমন এক ত্রৈলঙ্গস্বামী কাশীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, তেমনি বৃন্দাবনেও পরমহংসদেবের সহিত অচিরাৎ এক অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছিল। বৃন্দাবন প্রকৃতিগত প্রকৃতি বিশেষ, সে স্থানে পুরুষ কি প্রকারে প্রকৃতি ভাব লাভ করিবে? ওষ্ঠলোম ফেলিয়া বামারূপ ধরিলেই কি প্রকৃতি হইতে পারে? এই নিমিত্ত প্রকৃতি বেশধারী পুরুষ প্রকৃতি বিশিষ্ট বৃন্দাবনবাসীদিগের সহবাসে পরমহংসদেব সুখী হইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি একদিন নিধুবনে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তথায় গঙ্গা মাতা নাম্নী এক অতি প্রাচীনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পরমহংসদেবকে দর্শন করিবা মাত্র গঙ্গা মাতার আনন্দ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি "আরে দুলালী * দুলালী" বলিয়া প্রেমালিঙ্গন করিলেন।

পরমহংসদেব তখন বাহ্যচৈতন্য হারাইয়াছিলেন। গঙ্গামাতা অপূর্ব্ব ভাবাবেশ দর্শন পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। তাঁহার নয়ন যুগল হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে দুলালী দুলালী বলিয়া উঠিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন কি বলিবেন, কিন্তু অপরিমিত

---

* শ্রীমতির নাম বিশেষ।

আনন্দ হইলে যেমন বাক্‌রোধ হইয়া যায়,তাঁহার তদবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি কেবল এক দৃষ্টিতে পরমহংসদেবের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে পর পরমহংসদেব পূর্ব্ব প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং উভয়ে ঠারে ঠোরে নানা প্রকার কথা কহিলেন। সে সকল কথার ভাব কেহই বুঝিতে পারে নাই।

গঙ্গামাতা পরমহংসদেবকে স্বহস্তে আহারাদি প্রস্তুত করিয়া ভোজন করাইতেন এবং সর্ব্বদাই তত্ত্ব প্রসঙ্গে দিন যাপন করিতেন।

বৃন্দাবন হইতে যখন পরমহংসদেব প্রত্যাগমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন,গঙ্গামাতা বিষাদিত হইয়া নানাবিধ প্রতিবন্ধক জন্মাইতে লাগিলেন। তিনি রোদন করিয়া বলিলেন "অরে দুলালী বৃন্দাবন যে তোর্ থাকিবার স্থান। ব্রজবালাদিগেরও বৃন্দাবন ব্যতীত আর স্থান নাই। আমি বৃন্দাবনে বাস করিয়া রহিয়াছি, কেন রহিয়াছি, তাকি তুই জানিস্‌নে? যদি দাসী বলে মনে হ'য়েছে, যদি দয়া ক'রে দেখা দিলি, তবে আর কেন আমায় বিরহানলে দগ্ধ করবি; হ্যাঁরে, আশায় কত দিন প্রাণ বাঁচে? বরং আশা থাকিলে তাহাতে প্রাণ বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। কিন্তু মিলনের পর বিরহ যে কি অসহ্য দুঃখ, দুলালী তা কি তুই জানিস্‌নে? আমি এত দিন কেবল ভাবে প্রাণ ধারণ করেচি। মনে করিতাম, এই বৃন্দাবনে এক দিন আমার কমলিনী কদম্বমূলে—কোন্ কদম্বটী তা জানি না—কানাইয়ার সহিত বিহার করিয়া গিয়াছেন, কদম্ব বৃক্ষ চারি দিকে দেখিতে পাই। কিন্তু কোথাও আমার নন্দকিশোর-রাইকিশোরীকে দেখিতে পাই নাই! আমাদের সেই যুগল রূপ কৈ? যখন দেখি, বিপিন প্রান্তে, প্রান্তরে নবদূর্ব্বাদল ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাই, তখন মনে হয় কোথায় সে গোপাল! সে গোপালগণ কোথায়! কোথায় সে গোপাল! কোথায় সে গোপাল বৎসগণ! আবার যখন ঐ মাঠে গোপাল বিচরণ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের দেখিয়া আমার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইয়া নয়নে জলধারা বহিয়া যায়। মনে হয় সখি, আমাদের গোপাল এক সময়ে ঐ রূপে গোপাল লইয়া বেড়াইত। তখন মা যশোদার সাজান বেশ মনে উদয় হইয়া আমায় আপনহারা করিত। গোপালের মাথায় চুড়া, বৃন্দাবন তিলকের নাসায় তিলক, ললাটে ও কপোলদেশে অলকা বিন্দু সকল যেমন শরদাকাশের নিশার তারকারাজি সদৃশ দেখাইত। তাহার

ওষ্ঠাধরে গজমতি। আহা! কি সুমধুর মৃদু হাস্য, হাস্য ছটায় মনপ্রাণ বিমোহিত হইয়া যাইত। মরি মরি! কিবা ভ্রূ-ভঙ্গী, সে আড় নয়নের চাউনি মনে হ'লে কোন্ কুলবালা কুলশীলে জলাঞ্জলী না দিয়া স্থির থাকিতে পারে? যে ভাল তার কি সকলই ভাল—ভাল কিসে? অমন নিঠুর কি আর আছে? কুলের কুল-বধূর কুল ভাঙ্গিয়া তাদের পথের ভিখারিণী করিয়া শেষে দুকুল নষ্ট করিবার অমন গুরুমহাশয় আর কি দ্বিতীয় আছে? সখি, ঐ দেখ সেই যমুনা, যে যমুনাকূলে ব্রজকুলবালা কুল শীল ভুলিয়া গোকুলচন্দ্রের বদনচন্দ্র বিনিঃসৃত সুমধুর বংশীধ্বনি-স্বরূপ অমৃতধারা শ্রবণ পথে ঢালিবার জন্য একত্রিত হইত, যে যমুনাতীরে এক দিন নন্দদুলাল গোপাঙ্গনাদিগের বস্ত্রহরণ করিয়া বৃক্ষ শাখায় লুক্কায়িত ছিল, সে বৃক্ষ আছে, সে যমুনাতট আছে, কিন্তু সে চোর কৈ? তাকে কেন দেখিতে পাই নাই! যে যমুনাপুলিনে আমাদের কমলিনী কনকলতিকা, শ্যাম-কদম্ব ভ্রষ্ট হইয়া যে দিন ধূলায় ধূসরিত হইয়া সখিদিগের রোদনস্বরের সহিত "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!" স্বর সমস্বরে ধ্বনিত হইয়াছিল, সে সখিরাই বা কোথায়? আর সেই ব্রজেশ্বরীই বা কোথায়? সে কুঞ্জবন আর নাই, এখন সকলই নিবিড় বন। বৃন্দাবনে বাস করি, কিন্তু মনের সাধে কথা কহিবার কেহই নাই। তাই বলি, আরে দুলালী তুই কোথায় আমায় ফেলিয়া পলায়ন কর্‌বি" এই বলিয়া পরমহংসদেবের হস্ত ধারণ করিলেন। পরমহংসদেব এতক্ষণ ভাবাবেশে ছিলেন। গঙ্গামাতা যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়, তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল কি না তাহা বলা যায় না। পরমহংসদেবের ভাবাবেশ সাম্য হইলে, তিনি গমনোদ্যত হইলেন। গঙ্গামাতা কোন মতে হস্ত ছাড়িলেন না। হৃদয় নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন। গঙ্গামাতার আগ্রহ দেখিয়া তিনিও পরমহংসদেবের আর একটী হস্ত ধারণ করিয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবার জন্য বার বার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এক দিকে গঙ্গামাতা অপর দিকে হৃদয়, পরমহংসদেবের উভয় হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব তখন রোদন আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে দুঃখিত হইতে দেখিয়া গঙ্গামাতা লজ্জিতা হইয়া ছাড়িয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। পরমহংসদেব অভয় দিয়া তথা হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গঙ্গামাতা অদ্যাপি বৃন্দাবনের নিকট বর্ষণ নামক স্থানে বাস করিতেছেন।

পথি মধ্যে কোন স্থানে কতকগুলি পার্ব্বতীয় অসভ্য নরনারী একটী প্রান্তরে বাস করিয়া রহিয়াছিল। তাহাদের পরিধেয় বিশেষ কোন প্রকার বস্ত্র ছিল না, থাকিবার আবাসস্থান বৃক্ষতল, আহার বোধ হয়, কখন হয় এবং কখন অনাহারেই থাকিতে হয়। তাহাদের মলিন বেশ, মলিন অবস্থা দেখিয়া পরমহংসদেব রোদন করিয়া বলিলেন, "মা তোমার সংসারে এমন দুঃখীও আছে? তুমি না মা দয়াময়ী, দুঃখবারিণী, তোমার এমন ভেদাভেদ কেন মা? কেহ তোমার কৃপায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া রহিয়াছে। আবার কেহ কি জন্য দারিদ্র্যের চরমদশায় পতিত হইয়া রোদন করিয়া দিন যাপন করিতেছে? মা! এ কি তোমার লীলা? কেহ মা তোমার প্রসাদে হিরণ্ময় চাকচিক্য প্রাসাদে বাস করিয়া দেহের সচ্ছন্দতা লাভ করিতেছে এবং কাহাকে একখানি তালবৃন্ত নির্ম্মিত কুটীরাভাবে বৃক্ষতলে শয়ন করিতে হইতেছে? কেহ মা তোমার সংসারে অমৃতবৎ পদার্থ আহার করিতে না পারিয়া কুক্কুর বিড়ালকে দিতেছে; এবং কেহ মা আহার বিহনে অনাহারে দিন যাপন করিতেছে। কেহ গাড়ী ঘোড়ায় গমনাগমন করিতেও ক্লেশানুভব করিয়া থাকে এবং কেহ মধ্যাহ্নের তপন তাপে, বৃষ্টিধারায় ভিজিয়া ও বাতাঘাতে আহত হইয়া পদব্রজে মস্তকে মোট লইয়া গমন করিতেছে। মা তোমার খেলা তোমাকেই সাজে। রামপ্রসাদ ঠিক্ বলিয়াছে। কাহার দুধে চিনি এবং কাহার শাকে বালি, মা! সে কি তোমার পাকা ধানে মৈ দিয়াছে?" পরমহংসদেবকে রোদন করিতে দেখিয়া মথুর বাবু নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতে শুনিলেন না। তদনন্তর তিনি কহিতে লাগিলেন, "দেখ মথুর এই অনাথা, আশ্রমবিহীন দীন দরিদ্রদিগকে উত্তম রূপে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া ভোজন করাও এবং প্রত্যেককে একখানি বস্ত্র প্রদান কর।" মথুর বাবু এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "বাবা! তোমার দয়ার্দ্র হৃদয় সকলকেই সমজ্ঞান কর; দুঃখী দেখিলে তোমার প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়া উঠে, সেই জন্য হীনাবস্থার ব্যক্তি দেখিলে তুমি কাতর হইয়া থাক। কিন্তু বাবা অর্থ কাহাকে বলে তোমার জ্ঞান নাই। আমার এমন কি সঙ্গতি আছে যে, সকল দুঃখীর দুঃখ বিমোচন করিতে পারি।" ইহাকেই বিষয়ের আসক্তি বলে। পরমহংসদেবই তন্নিমিত্ত বার বার কাঞ্চন অর্থাৎ বিষয়কে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিবার নিমিত্ত ভূরি ভূরি

উপদেশ দিয়াছিলেন। মথুর বাবু বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও, বিষয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, তিনি অবশেষে পরমহংসদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে বস্ত্র আনাইয়া ঐ দরিদ্রদিগকে এক এক খণ্ড করিয়া বস্ত্র দান করা হইয়াছিল, এবং এক সপ্তাহ কাল অতি আড়ম্বরের সহিত উহাদিগকে চাতুর্ব্বিধান্নে ভোজনাদি করান হইয়াছিল। তথা হইতে আসিবার সময় পরমহংসদেবের আজ্ঞায় পুনরায় উহাদের প্রত্যেককে একটী করিয়া সিকি দেওয়া হইয়াছিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে আবদ্ধ থাকিতেন না, তিনি সময়ে সময়ে নানাস্থানে গমন করিতেন। একদা আদি ব্রাহ্ম সমাজের উপদেশ পদ্ধতি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে বাবু কেশবচন্দ্র সেন ঐ সমাজভুক্ত ছিলেন। পরমহংসদেব তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সকলেই উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, তিনিও ধীরভাবে উপবেশন করিয়া উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। উপাসনান্তে পরমহংসদেব মথুর বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, কেবল ঐ তরুণ যুবকটীর ফাত্না * নড়িতেছে, অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের এখন পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। উহারা কপট ধ্যান করিতেছে। কলিকাতার অন্তঃপাতী কলুটোলা নামক স্থানে চৈতন্য সভা নামক একটী সভা ছিল। তথাকার সভ্যেরা চৈতন্যদেবের আসন মধ্যস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহারা সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। পরমহংসদেব সেই সভায় গমন পূর্ব্বক ভাবাবেশে চৈতন্য আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন; কেহ কেহ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কেহ বা তাঁহাকে প্রবঞ্চক, কপটী, চৈতন্যদেবের ভাব অনুকরণ পূর্ব্বক আপ-

---

* মনের সহিত ফাত্নার তুলনা দেওয়া হইয়াছে। এস্থানে প্রাণ রূপ কাঁটায়, নামরূপ টোপে, ভক্তিরূপ চার দ্বারা ঈশ্বর মীন, টোপ ধরিলে মন ফাত্না নড়িয়া থাকে।

নাকে অবতার বলিয়া প্রকটিত করিতেছেন বলিয়া, অভিযোগ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে মহাভাবের লক্ষণ পরম্পরা দর্শন করিয়া জীবন এবং নয়নের সার্থকতা বোধ করিতে লাগিলেন। এই ঘটনায় বৈষ্ণব মণ্ডলীর মধ্যে একটা বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

সেই সময়ে কাল্না নিবাসী বৈষ্ণবকুল গৌরব পরম ভাগবত, শ্রীমৎ ভগবান্ দাস বাবাজী, যাঁহার ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলে, কেবল আশ্চর্য্য নহে, নির্ব্বাক্ ও বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যাইতে হয়। যাঁহার বৃত্তান্ত তদন্ত করিলে, তাঁহাকে শান্ত, দান্ত, মহান্ত বলিলেও গুণমন্ত্রর অন্ত করা যায় না। কারণ সকলের প্রমুখাৎ খ্যাত আছে যে, তাঁহার বয়ঃক্রম নিরূপণ হওয়া কাহার সামর্থে সংকুলান হয় নাই। যাহার মনে যেমন হইত, সে তাঁহার বয়ঃক্রম সম্বন্ধে তদ্রূপ বলিত। তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনাদিতে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নৃত্য করিতে পারিতেন। তাঁহার বিশেষ কি ভাব ছিল, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না, কিন্তু একজন প্রেমিক ভক্ত ছিলেন বলিয়া বিখ্যাত আছেন। পরমহংসদেব কর্ত্তৃক চৈতন্য আসন গৃহীত হইয়াছে শুনিয়া ভগবান্ দাস বাবাজী যারপরনাই কুপিত হইয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিবস পরে পরমহংসদেব মথুর বাবুর সহিত নৌকাপথে ভ্রমণ করিতে করিতে কাল্নায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় গমন করিয়া পরমহংসদেব হৃদয়ের সহিত উক্ত বাবাজীর আশ্রমে সমাগত হইলেন। বাবাজীর বয়োবৃদ্ধি বিধায় দৃষ্টি হানি হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত কাহাকেও সহসা চিনিতে পারিতেন না। তিনি নয়নে দেখিতে পাইতেন না বটে, কিন্তু সাধু প্রভাবে সকলই বুঝিতে পারিতেন। পরমহংসদেব তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র বাবাজী বলিয়া উঠিলেন, "কোন্ মহাপুরুষ দীনের প্রতি দয়া করিয়া কুটীরে চরণ-ধূলি প্রদান করিলেন?" এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে পরমহংসদেব তাঁহার সম্মুখে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বাবাজী অমনই চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "আজ আমি কৃতার্থ হইলাম। প্রভু! আমায় হীন শক্তি বিহীন কাঙ্গাল জানিয়া দয়া পরবশে নিজ উদারতাগুণে দর্শন দিয়া চির আশা সম্পূর্ণ করিলেন। আমি অতি অপবিত্র, নরাধম মহাপাপী। কেন না আমি আপনি তীর্থ পর্য্যটন কিম্বা সাধু দর্শন করিতে অশক্ত হইয়া একস্থানে পিণ্ডাকারে পতিত রহিয়াছি। কিন্তু দয়ার সাগর ভগবান্

ভগবান্ দাসের প্রতি বুঝিলাম এতদিন পরে সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। আজ সাধুপদধূলিতে আমি পবিত্র, আশ্রম পবিত্র এবং দেশ পবিত্র হইল। এমন সুদুর্লভ পদার্থ সর্ব্বত্রে অপ্রাপ্ত। যাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মতেজ বিরাজ করিতেছেন, যাঁহাদের হৃদয়ে জগতের আনন্দ বিধাতা শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেছেন, যাঁহারা হৃদি-বৃন্দাবনে নিত্য রাসলীলা দর্শন করিয়া রসিক শেখরের চরম প্রেম আস্বাদন করিতেছেন, যাঁহারা সৃজিত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে আপন হৃদয় পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহারাই সকলের পূজ্য এবং সকলের প্রণম্য।” বাবাজী পরমহংসদেবের মহাভাবের অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। মহাভাব কথার কথা নহে। সহজে সাধন সাপেক্ষ নহে, যাহা জীবে কদাচ প্রকাশিত হইবার নহে, যাহার দৃষ্টান্ত এক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ দেখে নাই, তাহা কেমন করিয়া মনুষ্য বুদ্ধি অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবে। বাবাজী পণ্ডিত না হইলেও সাধক ছিলেন, বিশেষতঃ বৈষ্ণব শ্রেণীভুক্ত, তাঁহার মহাভাব অবশ্যই জানা ছিল। তিনি পর্য্যায়ক্রমে তাহা দেখিতে পাইলেন এবং শাস্ত্রের সহিত তদ্‌সমুদায় লক্ষণ মিলাইয়া পাইয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে জয়ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। তদনন্তর তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই মহাত্মা কলুটোলার চৈতন্য-আসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব অপরাধ স্মরণ হইল এবং আপনাকে অশেষ প্রকার ধিক্কার দিয়া অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য বার বার ক্ষমা প্রর্থনা করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব কয়েকবার তাঁহার স্বদেশেও গমন করিয়াছিলেন। তথাকার লোকেরা তাঁহাকে লইয়া মহা আনন্দ করিত। তিনি যে স্থানে বাসা করিতেন, সর্ব্বদা লোকের সমাগমে সেই স্থানটী উৎসব ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইত। হৃদয়ের বাটীতে অনেক সময় থাকিতেন। একদা শ্যামবাজার নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তথায় সপ্তাহকাল নিরবচ্ছিন্ন সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। দেশ দেশান্তর হইতে দলে দলে লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এরূপ জনতা প্রায় পল্লীগ্রামে মেলা হইলেও হয় না। প্রত্যেক লোকের মুখে এই কথা যে, এক অদ্ভুত ব্যক্তি আসিয়াছেন, তিনি ক্ষণে ক্ষণে মৃতপ্রায় হইতেছেন, আবার হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের উচ্চ রোলে তিনি পুনর্জ্জীবিত হইয়া সিংহের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। এমন নৃত্য কেহ কথন দেখে নাই, এমন কীর্ত্তনও কেহ কথন শুনে নাই। মাঠে, গৃহস্থের গৃহের চালে, প্রাচীরে, বৃক্ষে

অবশেষে তাল বৃক্ষের উপর পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া লোকে এই অপূর্ব্ব ভাব দর্শন করিয়াছিল। এই জনতা হওয়ায় পরমহংসদেব দুই দণ্ড সুস্থির হইয়া বিশ্রাম অথবা তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিতে পারেন নাই। এই জনরব যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ক্রমে লোক সমাগমের আর পরিসীমা থাকিল না। তিনি তদনন্তর কোন উপায় না দেখিয়া বহির্দ্দেশে গমনচ্ছলে তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তদবধি জনতা ভয়ে আর আপনাকে ভাল করিয়া কাহার নিকট পরিচয় দিতেন না। অধিকাংশ সময়ই ছদ্মবেশে এবং ছদ্ম ভাবে থাকিতেন।

পরমহংসদেব প্রতি বৎসর পানিহাটীর মহোৎসবে যাইয়া সঙ্কীর্ত্তনাদি করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময় যখন নিত্যানন্দ ঠাকুর প্রচার কার্য্যে বহির্গত হইয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া পানিহাটীতে আগমন করেন, তখন তিনি কাহারও বাটীতে অবস্থিতি না করিয়া একটী বট বৃক্ষমূলে রজনী যাপন করিয়াছিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে তথায় জলযোগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবেরা অদ্যাপি সেই বৃক্ষতলে প্রতি বৎসর মহোৎসব করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবদিগের সঙ্কীর্ত্তনে পরমহংসদেবের যোগ দেওয়ায় অতি অপূর্ব্বভাব ধারণ করিত। আমরা সৌভাগ্যক্রমে সেইরূপ সঙ্কীর্ত্তন কয়েকবার শ্রবণ করিয়াছি, তাহা লেখনী দ্বারা অংশরূপেও প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সাধ্যাতীত। আমরা অনেক সঙ্কীর্ত্তন ও প্রেমিক ভক্ত দেখিয়াছি, অনেক জ্ঞানী সাধকও দেখিয়াছি, অনেক সুপণ্ডিত ও সঙ্গীত বিশারদ গায়ক দেখিয়াছি, অনেক লয় মান সংযুক্ত নৃত্যও দেখিয়াছি, কিন্তু পরমহংসদেবের নৃত্য ও সঙ্কীর্ত্তনের ভাব এক চৈতন্যদেব ব্যতীত আর কাহার সহিত তুলনা হইতে পারে না। যাঁহারা তাঁহার হরিনাম শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারাই জানিতে পারিয়াছেন। হরিভক্ত যাঁহারা তাঁহারা সেই সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া প্রেমাবেশে পুলকিত হইতেন, এ কথা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু যাঁহারা তমোগুণের ঈশ্বর, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতেন না, ভক্তি প্রীতি সে প্রদেশে লেশ মাত্র ছিল না, যাঁহাদের হৃদয় শূন্য লৌহময় বলিলেও বলা যাইত, যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুরোধে রাজপথে, সাধারণ স্থানে ও সাধারণ ব্যক্তিদিগের সমক্ষে নৃত্যাদি করা অসভ্যতার লক্ষণ জ্ঞান করিতেন, যাঁহারা ভাব ও প্রেমকে মস্তিষ্কের ও মনের বিকার বলিয়া আস্ফালন করিতেন.তাঁহারাও প্রেমে বিহ্বল

হইয়া হৃদয়ের চির সঞ্চিত সভ্যতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিয়াছেন।

পরমহংসদেব যখন সঙ্কীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিতেন, তখন তাঁহার বাহ্যিকজ্ঞান একবারে থাকিত না। তিনি কখন হুঙ্কার দিয়া নৃত্য করিতেন এবং কখন স্থির হইয়া ঢলিয়া পড়িতেন। এই নিমিত্ত ভক্তেরা সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে নিকটে থাকিতেন। পরমহংসদেব বেলঘরিয়ায় দুই বার গমন করিয়াছিলেন। প্রথমে ইং ১৮৭২ সালে ফাল্গুন কিম্বা চৈত্র মাসে বেলা ৮৷৯টার সময় জয়গোপাল সেনের উদ্যানে কেশবচন্দ্র সেনকে দেখিতে গিয়াছিলেন। কেশব বাবু ও তাঁহার পারিষদবর্গ সেই সময়ে স্নান করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কেহ সমাদর কিম্বা হতাদর করেন নাই। পরমহংসদেব কাহার প্রতি কটাক্ষ না করিয়া কেশব বাবুর সম্মুখে যাইয়া বলিয়াছিলেন "তোমার লেজ খসিয়াছে।" ভাবের কথায় কে প্রবেশ করিবে? কেহ অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল এবং কেহ হাসিয়া উঠিল। কেশব বাবু তাহাতে বিরক্তভাব প্রকাশ করিয়া কহিয়াছিলেন, "উনি কি বলেন শ্রবণ কর।" পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন—"যে পর্য্যন্ত ব্যাঙাচির লেজ থাকে তাহারা জলে বাস করে, লেজ খসিলে মাটীতে লাফাইয়া পড়ে" ইহার ভাব এই যে সাংসারিক জীবগণ ব্যাঙাচি সদৃশ, কারণ তাহারা সংসারেই ঘুরিয়া বেড়ায়। যে জীব চৈতন্য রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহার অবস্থা সাধারণ জীবের ন্যায় নহে। পরমহংসদেবের প্রত্যেক কথা ভাবে পরিপূর্ণ। একটী ভাবে তিনি যেন কোন কথাই কহিতেন না। এই ব্যাঙাচির দৃষ্টান্তে আরও কতদূর তিনি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। দৃষ্টান্তটী যে ভাবে কথিত হইল, তাহা দ্বারা যে কেশব বাবুর উচ্চাবস্থা নিরূপিত হইতেছে, তাহা নহে। ব্যাঙের লেজ খসিলেই যে সে পরিত্রাণ পাইল, তাহা সকলেই জানেন, তবে ব্যাঙাচি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত বলিতে হইবে। কারণ কালভুজঙ্গের গ্রাস হইতে যে পর্য্যন্ত অব্যাহতি না পায়, সে পর্য্যন্ত ব্যাঙের কোন আশা ভরসা নাই। কেশব বাবু তখন সে অবস্থা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সেইজন্য উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। কেশব বাবুর সহিত কথা কহিয়া পরমহংসদেব আনন্দিত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বারে গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে যাইয়া নানাবিধ উপদেশ ও সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন।

পরমহংসদেব কলিকাতায় এবং ইহার সন্নিহিত প্রায় অধিকাংশ স্থানেই গতিবিধি করিতেন, কিন্তু বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর বাটীতেই তাঁহার প্রধান আরামের স্থল ছিল। পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে গমনাবধি রাসমণির জানবাজারের বাটী ব্যতীত অন্য স্থানে কখন রজনী যাপন করেন নাই। বলরাম বাবুর বাটীতে কেবল সে নিয়ম ছিল না। বলরাম বাবুই ধন্য। তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়।

কোন্নগরে তিনি কয়েকবার যাতায়াত করিয়াছিলেন। একবার তথাকার পণ্ডিতবর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র পরমহংসদেব তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। কিন্তু দীনবন্ধু তাহা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি আমার প্রণম্য? পরমহংসদেব অতি দীনভাবে দীনবন্ধুকে কহিলেন, আমি সকলের দাস আমার প্রণম্য সকলেই। আমার কাছে নিম্ন নাই, সকলের নিম্ন আমি। দীনবন্ধু তথাপি কহিতে লাগিলেন, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর দিতে হইবে। আপনি আমার নমস্য কি না? পরমহংসদেব কাতর হইয়া বলিলেন, তাহা কেমন করিয়া বলিব। আমি নিশ্চয় জানি যে, আমা অপেক্ষা বিশ্ব-সংসারের সকল বস্তুই শ্রেষ্ঠ, আমি সকলের দাসানুদাস। দীনবন্ধু তখন কহিতে লাগিলেন, আপনি কি আমার অভি-প্রায় বুঝিতে পারেন নাই। আপনার যজ্ঞোপবীত নাই, সেজন্য আপনি ব্রাহ্মণের নমস্য নহেন। তবে যদ্যপি সন্ন্যাসাশ্রমী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের অবশ্য নমস্য হইতে পারেন। দীনবন্ধু পণ্ডিত, বিশেষতঃ নৈয়ায়ীক, তিনি ভক্তি তন্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম কেমন করিয়া বুঝিবেন। ভক্তের লক্ষণ, সাধুর শিষ্টাচার বা দীনভাবের অর্থ দাম্ভিক পাণ্ডিতেরা কি অনু-ধাবন করিতে পারেন? দীনবন্ধু হয় ত মনে করিয়াছিলেন যে, আমি বিলক্ষণ ন্যায়ের ফাঁকি বাহির করিয়াছি। পরমহংস আর কোন দিকে পলাইতে পারিবে না; কিন্তু স্থূলদর্শী নৈয়ায়ীক মহাশয় সে দিন নিরহঙ্কার সাক্ষাৎ শুকদেব সদৃশ অমানুষী ভাবাপন্ন রামকৃষ্ণের ফাঁকি ধরিয়া ফাঁকে পড়িয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন না যে, আমি সন্ন্যাসী হইয়াছিলাম, এ কথা যে ব্যক্তি স্বীকার করিতেছেন না, তাঁহার কত উচ্চ ভাব! তিনি কত দূর অহঙ্কার বিবর্জ্জিত! কর্ণে শুনিতেছেন, যে ব্যক্তি পরমহংস তাঁহাকে কি আবার সন্ন্যাসী কি না এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয়? তাঁহার একটী

আপত্তি থাকিতে পারে। অন্যান্য পরমহংসের ন্যায় তাঁহার গৈরিক বসন ছিল না। এই যদি তাঁহার আপত্তি হয়, তাহা হইলে সে কথা কোন ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেই হইত। গৈরিক পরিধান করা ত অহঙ্কারের পরিচয়? কারণ মুখে না বলিয়া, পরিচ্ছদ দ্বারা নিজ অবস্থা সর্ব্বসাধারণকে বিজ্ঞাপন করা যার পর নাই রজোগুণের পরিচয় বিশেষ। ন্যায়রত্ন মহাশয় তথাপি ছাড়িলেন না। অতঃপর তিনি মৃদুস্বরে তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব কখন কখন হরিসভায় ও ব্রাহ্মমন্দিরে যাইতেন। কিন্তু কুত্রাপি বিশিষ্টরূপে আনন্দলাভ করিতে পারিতেন না।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

যৎকালে পরমহংসদেব এইরূপে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাঁহার জীবন্ত উপদেশের দ্বারা অনেকেরই ঈশ্বর বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চার হইতেছিল। সুতরাং অনেকের নিকটেই তিনি প্রকাশিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সর্ব্ব প্রথমে মথুর বাবু তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আপনভাব কাহারও সমক্ষে প্রকাশ করেন নাই। কলিকাতার আর একটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শম্ভুচরণ মল্লিকের প্রতি পরমহংসদেবের সমধিক কৃপা ছিল। তিনি সদাসর্ব্বদা তাঁহার বাটীতে যাইতেন। শম্ভু মল্লিক এক জন প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগী ভক্ত ছিলেন। তাঁহার দান শক্তির বিশেষ সুখ্যাতি আছে। এ সকল গুণ তিনি পরমহংসদেবের আশীর্ব্বাদে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের যে স্থানে যত রকম সাধু সন্ন্যাসী ছিলেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই পরমহংসদেবকে জানিতেন। তাঁহারা জগন্নাথদেব দর্শন কিম্বা গঙ্গাসাগর উপলক্ষে কলিকাতায় আসিলে পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইতেন না।

ক্রমে পরমহংসদেব সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকটিত হইতে আরম্ভ হইলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি গোলযোগ ভাল বাসিতেন না। দুইটী তিনটীর অধিক লোক যাতায়াত করিলে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইতেন। কিন্তু মুখে কাহাকেও কটু কথা কহিতে পারিতেন না, ক্রমে লোক সমাগম

কিছু অধিক আরম্ভ হইল। সে সময়ে খোট্টা ও মাড়োয়ারীরাও দলে দলে যাইতেন। এই মাড়োয়ারীদিগের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ নামক এক ব্যক্তির গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থাদিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। লোকের স্বভাবই এই, কেহ কিছু জানুক আর নাই জানুক, একটা কথা উত্থাপন হইলে তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে কেহই পশ্চাৎ দৃষ্টি করে না। তাহাতে যদি কিছু কাহারও জানা থাকে, তাহা হইলে আর কোন মতে নিস্তার নাই। লক্ষ্মী নারায়ণের কিছু ধর্ম্মশাস্ত্র জানা ছিল। তিনি সেই জন্য পরমহংস-দেবের সহিত নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া যখন পরাস্ত হইলেন, তখন অগত্যা তাঁহাকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিলেন। তিনি তদনন্তর মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং পরমহংসদেবের সহিত নানা প্রকার তত্ত্বালাপন করিয়া আনন্দে দিন যাপন করিয়া যাইতেন।

একদা পরমহংসদেবের বিছানার চাদর খানি ছিঁড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া, লক্ষ্মীনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার বিছানার চাদর খানি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কি জন্য পরিবর্ত্তন করা হয় নাই? তাহাতে পরমহংসদেব বলিয়া-ছিলেন যে, উহা এখন ব্যবহারোপযোগী আছে। যখন নিতান্ত প্রয়োজন হইবে, তখন এই মন্দিরস্বামী প্রদান করিবেন। এই কথা শ্রবণানন্তর লক্ষ্মী-নারায়ণ কহিতে লাগিলেন, এ প্রকার নিয়ম অন্যায়। বস্ত্র ছিন্ন হইয়া গেলে, তাহা চাহিবার পূর্ব্বেই প্রদান করা কর্ত্তব্য। এ দেশের ধনীরা এ সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞান, সাধুর মর্য্যাদা তাহারা বুঝিতে পারে না। যাহা হউক, আমাদের দেশে এরূপ প্রথা আছে যে, সাধু মহান্তদিগের ব্যয় সংকুলানের নিমিত্ত ধনী ব্যক্তিরা কিছু অর্থ দিয়া থাকেন। সাধুকে আর কাহারও নিকটে ভিক্ষা করিতে হয় না। সাধুকে যদ্যপি নিজ খরচের সংস্থানের নিমিত্ত সমস্ত দিন চিন্তা করিতে হয়, এবং দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সাধন সম্বন্ধে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। সাধনের জন্য বিষয় পরিত্যাগ করা। যদ্যপি সেই বিষয়েই আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল, তাহা হইলে সংসার তাহাদের অপরাধ করিয়া-ছিল কি? মহাশয়ের পক্ষে ঠিক্ তাহা নহে। তথাপি অপরে না দিলে অভাব বিমোচন হইতেছে না। কাহার মনের ভাব কখন কিরূপ হয়, কিছুই বলা যায় না। এক ব্যক্তি অদ্য সাধু সেবায় ব্রতী রহিয়াছে, কাল আবার সেই ব্যক্তিকেই সাধুর পরম শত্রু রূপে দেখা যাইতেছে। তাহাদের ভক্তির

উপর সাধুর ভাল মন্দ নির্ভর করিতেছে। আমার বাসনা এই যে, আমি মহাশয়ের নামে দশ সহস্র মুদ্রায় কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়া দিই। তাহার মাসিক সুদ ন্যূন সংখ্যায় চল্লিশ টাকা হইবে। এই টাকায় আপনার সমুদয় অভাব সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। লক্ষ্মীনারায়ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া পরমহংসদেব নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, কেন আমায় অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া অনর্থের কূপে নিক্ষেপ করিবে। অর্থ পরমার্থ পথের কণ্টক স্বরূপ এবং তদস্থান হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়া থাকে। তুমি আমায় বলিতে পার, অর্থের দ্বারা সচ্চিদানন্দ লাভ হয়, কি না? কখন হয় না এবং হইবার নহে, আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অর্থ জড় পদার্থ, তাহার দ্বারা যাহা হয়, তাহাও জড় পদার্থ। জড় পদার্থের আবশ্যক আছে, তাহা আমি স্বীকার করি। দেহের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, কেবল প্রয়োজন কেন? বিশেষ প্রয়োজন হয় বটে; কিন্তু আমার এক প্রকার কালীর ইচ্ছায় সচ্ছন্দে চলিতেছে, সে স্থলে অর্থ সঞ্চিত করিয়া রাখিবার কোন হেতু আমি দেখিতেছি না। তুমি কি বিশ্বাস কর যে, এই রাসমণির দেবালয়ে অবস্থিতি করিতেছি বলিয়া, রাসমণি আমায় আহার দিতেছে? তাহা অজ্ঞানীরা অবশ্যই বলিবে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা কি সত্য? রাসমণিকে কে অর্থ দিল? জন্মকালে সে অর্থ আনে নাই এবং মরিবার সময়ও কিছুই লইয়া যায় নাই। তবে বাহ্যিক একটা উপলক্ষ মাত্র। উপলক্ষকে অবশ্য নমস্কার করি। কিন্তু যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, সকলের কর্ত্তা তিনিই আদি কারণ।

জড় জগতের পদার্থ জড় পদার্থের সহকারী, চৈতন্যের সহিত আধার আধেয় সম্বন্ধ মাত্র। দেহ জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত, অর্থে তাহারই পুষ্টিসাধন পক্ষে সহায়তা করে। চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার কোন সংস্রব দেখা যাইতেছে না। তবে কি বলিয়া জড় পদার্থের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিব এবং তুমি তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেছ। অতএব যে পদার্থ দ্বারা সারাৎসার বস্তু হইতে বিচ্যুত হওয়া যায়, তাহা নিতান্ত অসার এবং সর্ব্বতোভাবে তাহা হইতে সাবধানে থাকা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় কথা এই, অহংনাশ না হইলে, আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। কারণ অহঙ্কার সে পথের আবরণ বিশেষ। এই অহং-বৃক্ষের মূলোৎপাটনের

জন্য সাধন ও ভজনার প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু এই অহং যাহাতে পরিবৃদ্ধি পাইবে, তুমি ভাগবতের পণ্ডিত হইয়া তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছ। বেদে কথিত আছে যে, ঈশ্বর মনুষ্য মন এবং বুদ্ধির অগোচর। ইহা যথার্থ কথা। কিন্তু ইহার স্বতন্ত্র ভাব আছে। বিষয়াত্মক মন বুদ্ধির অতীত তিনি এবং বিষয় বিরহিত অর্থাৎ শুদ্ধ মন বুদ্ধির গোচর তিনি। এই জন্য বলি, আমি অনেক ক্লেশ পাইয়াছি, অহংনাশের জন্য আমি কত কি করিয়াছি, কিন্তু আজও আমার অহংনাশ হয় নাই, আজও তুমি আমি জ্ঞান রহিয়াছে,আজও অর্থের কথায় কথা কহিতেছি, আজও অর্থ লইয়া আন্দোলন করিতেছি, আজও আমার মন বিষয় বিরহিত হইতে পারে নাই; এ অবস্থায় আর আমার সর্ব্বনাশ করিও না। আমায় কেন অর্থ দিবে? আমি সাধু নহি, মহান্ত নহি, আমি সিদ্ধ পুরুষ নহি, আমি কিছুই নহি। আমি পণ্ডিত নহি, আমি ধনবানের পুত্র নহি, আমি সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব নহি, আমি এখন ব্রাহ্মণ নহি। কতবার উপবীত ধারণ করিলাম, কি জানি কোথায় হারাইয়া যায়। আমায় অর্থ দিলে কি হইবে? অর্থ দিবার অনেক সুপাত্র আছে, তুমি তাহাদের সাহায্য কর বিশেষ ফল পাইবে।

লক্ষ্মীনারায়ণ কহিলেন, আপনার এই কথায় আমি অনুমোদন করিতে পারিলাম না। আপনার সম্বন্ধে তাহা খাটিতে পারে না। আপনি কি, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি এবং সেই জন্যই অদ্য এই প্রস্তাব করিয়াছি। আমি জানি যে, আপনার মন বিষয় হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। তৈল যেমন জলের উপরে ভাসে, সেইরূপ আপনার মন বিষয়ের উপরে ভাসিবে। অহংভাবের কথা যাহা বলিলেন, তাহা এ প্রকার মনে কখনও স্থান পায় না। পরমহংসদেব কহিলেন, তৈল এবং জল একত্রে মিশ্রিত না হউক, কিন্তু তখনই জলে তৈলের গন্ধটী বাহির হইয়া দিনকতক পরে তৈল এবং জলের সংযোগ স্থানটী পচিয়া যায়। সেই প্রকার বিষয়ের সহিত মনের সংযোগ হইলে, মনটীতে প্রথমে বিষয়ের দুর্গন্ধ বাহির হইবে এবং পরে মন বিকৃত হইয়া যাইবে।

লক্ষ্মীনারায়ণ কহিতে লাগিলেন, ভাল, ইহাতে যদি এতই আপত্তি থাকে, আপনার কোন আত্মীয়ের নামে হউক। পরমহংসদেব তথাপি অসম্মত হইলেন এবং বলিলেন, তাহাতেও আমার মনে ছায়া পড়িবে।

আমি জানিব যে অর্থ আমার, বেনামী করিয়া রাখিয়াছি; ইহা আরও দোষ। লক্ষ্মীনারায়ণ পুনরায় অতিশয় আগ্রহ পূর্ব্বক কহিলেন, আপনাকে এই টাকা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যখন একবার আপনাকে দান করিয়াছি, তাহা কোন মতে আর গ্রহণ করিতে পারিব না। আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন।

লক্ষ্মীনারায়ণের মুখ হইতে এই কথা বহির্গত হইতে না হইতে, পরমহংস-দেব একেবারে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"মা! এমন লোককে কেন আন মা! যাঁহারা তোমার নিকট হইতে আমাকে বিচ্যুত করিতে চায়, তাঁহারা যে আমার পরম শত্রু মা।" এই বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ যার পর নাই অপ্রতিভ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট কথায় লক্ষ্মীনারায়ণকে পূর্ব্ব প্রকৃতিস্থ করিয়া দিয়াছিলেন *।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেবের সহিত কেশবচন্দ্র সেনের পরিচয় হইয়াছিল। কেশব বাবু পরমহংসদেবের প্রকৃত ভাব জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত দুই তিন জন ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মেরা মন্দির বাটীতে দুই তিন দিবস অবস্থিতি করিয়া পরমহংসদেবের অবস্থা, তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধির পরিমাণানুসারে স্থিরিকৃত করিয়া পরমহংস-দেবকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন, মহাশয়! আপনাকে একজন ভক্ত বলিয়া আমাদের বিবেচনা হইতেছে। কিন্তু আপনি কখন হরি হরি বলেন, আবার কখন কালী কালী বলিয়া নৃত্য করেন। এ প্রকার অন্ধভাবে না থাকিয়া, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য প্রবর শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের শরণাপন্ন হউন, আপনার পরিত্রাণ হইবে, এবং আপনি মুক্তিলাভ করিবেন। তাঁহার নিকট চতুর্ব্বর্গের ফল পাওয়া যায়। পরমহংসদেব

* মথুর বাবু এক সময়ে পরমহংসদেবের নামে ৫০,০০০৲ টাকার কাগজ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, পরমহংসদেবও সে সময়ে মথুরকে তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

কোন ফলাকাঙ্ক্ষী নহেন বলিয়া, কথাগুলির প্রতি কিছুই আস্থা স্থাপন না না করায়, ব্রাহ্মেরা বিরক্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন।

কেশব বাবু প্রেরিত অনুচরবর্গ দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পরমহংসদেব সম্বন্ধীয় কথাগুলি আচার্য্যকে নিবেদন করিলে, তিনি সশিষ্যে অনতিবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেশব বাবুকে দেখিবা মাত্র পরমহংসদেব তাঁহার মনের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। তিনি তন্নিমিত্ত প্রথমেই ব্রহ্মশক্তি লইয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন। কেশব বাবুর বিশেষ গুণ ছিল যে, কুতার্কিক অথবা অবিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি তৎকালে নিরাকার ঈশ্বরই মানিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, ঈশ্বর অরূপ, কথনই আকারাদি বিশিষ্ট হইতে পারেন না। পরমহংসদেব যখন বলিলেন যে, শক্তি না স্বীকার করিলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। কেশব বাবু শক্তি মানিতেন না এবং ব্রহ্মোপাসনায় তাঁহার নিষ্প্রয়োজন বলিয়া নিজ সরল বিশ্বাস যাহা তাহাই কহিলেন। পরমহংসদেব অতঃপর বলিলেন, তোমার এরূপ সংস্কার সম্পূর্ণ ভুল। ব্রহ্মের লক্ষণ কি? পঞ্চতত্ত্ব যথা; পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ ও পঞ্চন্মাত্র, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদির অতীত যে বস্তু তাঁহাকে ব্রহ্ম কহে। কিম্বা তিনি অদ্বিতীয় নিরাকার, নির্ব্বিকার ও চিন্ময় স্বরূপ। তাঁহাকে জানিতে হইলে, তাঁহার সৃষ্টি বিশ্লিষ্ট করিতে হয়। সৃষ্টি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তিনিই করিয়াছেন। এই নিমিত্ত তিনিই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। তাঁহার দ্বারা ও তাঁহা হইতে যদ্যপি সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। কারণ কেহ তাঁহাকে নির্গুণ বলে, গুণময় পদার্থ তাঁহার শক্তি হইতে উৎপন্ন হয়। বলিতে গেলে যদিও ব্রহ্ম ও শক্তি দুইটী কথা আসিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। ব্রহ্ম বলিলে যাঁহাকে বুঝায়, শক্তি বলিলেও তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। ব্রহ্ম, শক্তিতে বিরাজিত অথবা শক্তি ব্রহ্মে নিহিত আছেন। এক পক্ষে, ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি স্বীকার করা যায়, এবং অপর পক্ষে অনন্ত শক্তির সমষ্টিকে ব্রহ্ম কহা যায়। ব্রহ্মের একটী নাম সচ্চিদানন্দ। সৎ—সত্য বা নিত্য, চিৎ—জ্ঞান এবং আনন্দ আহ্লাদ, অর্থাৎ ব্রহ্ম, সত্য বা নিত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ। অতএব এই ত্রিবিধ ভাবের সমষ্টিই ব্রহ্ম। উপরে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি। অগ্নি বলিলে আমরা ইহার শক্তির ভাব

অগ্রে উপলব্ধি করিয়া থাকি যথা, উত্তাপ, বর্ণ এবং দাহিকা শক্তি অথবা এই শক্তিত্রয়ের সমষ্টিকে অগ্নি বলে। যদ্যপি ইহার শক্তিগুলি স্বতন্ত্র করা যায়, তাহা হইলে অগ্নি থাকিবে না। এস্থলে অগ্নি ও অগ্নির শক্তি বিশেষ, যদিও দ্বৈত ভাবের পরিচায়ক হইতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, উহা একেরই অবস্থা বিশেষ। যেমন দুগ্ধ ও তাহার ধবলত্ব। দুগ্ধ যে বস্তু ধবলত্ব তাহারই তাহা দুগ্ধ ছাড়া নহে। যদ্যপি ব্রহ্ম শক্তি অভেদ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম এবং শক্তি দুইটী স্বতন্ত্র শব্দে উল্লেখ করিবার হেতু কি? যেমন এক ব্যক্তি লিখিতে পারে, পড়িতে পারে, নাচিতে পারে, গাইতে পারে, বাজাইতে পারে এবং চিত্র করিতে পারে। এ স্থানে ব্যক্তি এক, শক্তি নানা প্রকার। সেইরূপ যে সময়ে ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির স্বতন্ত্রভাব প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, তখনই ঐ শক্তিদিগের কোন প্রকার অবলম্বন স্বীকার করিতে হইবে। অবলম্বন না থাকিলে, শক্তি সকল কি প্রকারে অবস্থিতি করিয়া থাকে? এই নিমিত্ত সচ্চিদানন্দ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের অবস্থাটী সুন্দর রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। সৎ—নিত্য এইটী ব্রহ্ম পদ বাচ্য। এ অবস্থাটী বাক্য মনের অতীত। নিত্য এই শব্দটীর কি ভাব এবং আমরা বুঝিই বা কি? অনিত্য বস্তু দেখিয়া আমরা যে ভাব লাভ করিয়া থাকি, তাহার বিপরীত ভাবকে নিত্য কহে, ইহা অনুমান করিবার বস্তুও নহে। চিৎ অর্থে জ্ঞান। এই চিৎ শক্তি দ্বারা জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে। জ্ঞান শক্তিই সর্ব্ব প্রকার সৃষ্টির নিদান স্বরূপ। সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থলে একটী কাষ্ঠের পুতুল গৃহীত হউক। পুতুলটী কাষ্ঠের দ্বারা গঠিত। গঠন করিল কে? সেই ব্যক্তি বা তাহার হস্ত কিম্বা কোন যন্ত্র বিশেষ? বাটালি কিম্বা করাতকে কারণ বলা যায় না। অথবা কাষ্ঠকেও ঔৎপত্তিক কারণ বলিলে ভুল হয়। এস্থলে সেই ব্যক্তির জ্ঞান শক্তিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মিস্ত্রী, তাহার জ্ঞান শক্তির সাহায্যে একজাতি কাষ্ঠকে নানা প্রকারে গঠন করিতে পারে। গঠনের উপাদান কারণ কাষ্ঠ, সমবায় কারণ যন্ত্রাদি এবং নিমিত্ত কারণ মিস্ত্রীকে কহা যায়। এই চিৎশক্তি হইতে যাহা কিছু দেখিবার, শুনিবার, বলিবার ও উপলব্ধি করিবার আছে, ছিল বা হইবে তৎসমুদয় চিৎ শক্তির অন্তর্গত। চিৎশক্তি হইতে সৎ বা নিত্যের প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন উত্তাপ শক্তি অগ্নির পরিচায়ক। উত্তপ্ততা না থাকিলে অগ্নি বলিয়া কে জানিতে পারিত?

উত্তাপ শক্তির দ্বারা যে প্রকারে অগ্নির অস্তিত্ব নিরূপিত হইল, চিৎশক্তির দ্বারা সেইরূপ ভাবে ব্রহ্ম নিরূপিত বা তাঁহাকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। যদিও এস্থলে সৎ বা ব্রহ্ম এবং চিৎ বা শক্তির মধ্যে ভেদ দেখান হইল, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভেদ নাই, তাহা একেরই অবস্থা বিশেষ মাত্র।

ব্রহ্মশক্তির ভেদাভেদ আরও সুন্দর রূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যেমন জলাশয়ের জল। জল যখন স্থির থাকে, তখন তাহাকে ব্রহ্ম বা সৎ অথবা পুরুষ কহা যায়, কিন্তু তাহাতে ঢেউ উঠিলে, চিৎ বা প্রকৃতির ভাব আসিয়া থাকে। যখন কোন কার্য্য নাই, সৃষ্টি নাই, তখন তিনি ব্রহ্ম বা অচল, অটল সুমেরুবৎ। কার্য্য আসিলেই শক্তির খেলা বলিতে হইবে।

ব্রহ্ম পুরুষ এবং শক্তি প্রকৃতি। কারণ একের আশ্রয়ীভূত আর একটী, এই নিমিত্ত ব্রহ্ম পুরুষ এবং শক্তি প্রকৃতি বলিয়া উল্লিখিত। যেমন বৃক্ষ পুরুষ ও তদ্বেষ্টিত লতা স্ত্রী শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। নৌকা ক্লীবলিঙ্গ তন্মধ্যে আরোহী থাকিলে, উহা স্ত্রীলিঙ্গবাচক হইবে। তুমি একখানি চিত্রপট প্রস্তুত করিলে, চিত্রটী তোমার চিত্রকরা শক্তি হইতে তোমার দ্বারা জন্মিল, এই জন্য তুমি পুরুষ, তোমার চিত্রকরা শক্তি তোমার স্ত্রী এবং চিত্রটী সন্তান বিশেষ। সেই প্রকার ব্রহ্ম পিতা, শক্তি মাতা এবং আমরা সন্তান স্বরূপ। অতএব ব্রহ্মোপাসনার প্রথমে শক্তির উপাসনা করা কর্ত্তব্য। কারণ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট পদার্থ পর্য্যন্ত শক্তির ঐশ্বর্য্য বা অধিকার। যাহা লইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবে, তৎ সমুদায় শক্তির সম্পত্তি জানিবে। ব্রহ্মোপাসনায় উপযুক্ত হওয়া ও সেই অবস্থায় আনয়ন করিবার শক্তি, শক্তি ভিন্ন কাহার শক্তি নাই। কারণ যাহা বলিবে অথবা যাহা করিবে, তাহা শক্তির অন্তর্গত। ভক্তি শক্তির সম্পত্তি, ভাব ও প্রেম, শক্তির সম্পত্তি ফলে যে সকল উপকরণাদি লইয়া ব্রহ্ম পূজা করিবে, তাহা শক্তি ভিন্ন আর কাহারও নহে। শক্তি অতিক্রম করিয়া যে কাহারও ব্রহ্মোপাসনা হয় না, তাহার কারণ এই। ব্রহ্মোপাসনার যে সকল প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাতে কোন প্রকার ভাব অবলম্বন ভিন্ন সাধন কার্য্য হইতে পারে না। হয় পিতা পুত্র সম্বন্ধ, না হয় প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ, কোন স্থানে সৃষ্টিকর্ত্তা বা সৃজিত সম্বন্ধ এবং কোন স্থানে রাজা প্রজা সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধগুলি সুন্দর বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে ভাবের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। পিতা বলিলে মাতা চাই, সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে কর্ত্রী চাই, কারণ কেবল কর্ত্তা একাকী সৃষ্টি

করিতে পারেন না। কথায় বলে, মাকে দিয়ে বাপকে চেনা। মা নাই বাপকে স্বীকার করিতেছি, ইহা যার পর নাই অস্বাভাবিক। এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, উপরোক্ত ভাবে মাতৃ বা ঔৎপত্তিক স্থানটী ব্যবধান রহিয়াছে। অতএব ঐ মাতৃ স্থানটীই সকলের উৎপত্তির স্থল, উহাকে মা বলা যায়। ঐ মা বা চিৎশক্তি কেবল সৃষ্টিস্থিত বস্তু কেন, অবতার বল, রূপ বল, জ্যোতি বল সকলই প্রসব করিয়া থাকেন। এই জন্য

"অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়,
কোটি কৃষ্ণ, কোটি রাম, হয় যায় রয়।"

বলিয়া উল্লেখ করা হয়। মুখে শক্তি অস্বীকার করিলে চলিবে না, শক্তি ব্যতীত কোন কার্য্যই হইতেছে না। দেখ জড় জগৎ, উহা কিরূপে চলিতেছে? শক্তিতে। দেখ সৌরজগৎ, উহাও শক্তিতে চলিতেছে। মনুষ্যগণ দেখিতেছে দর্শন শক্তিতে, আহার পরিপাক হইতেছে পাক শক্তিতে, কথা কহিতেছে বাক্ শক্তিতে এবং অনুভব করিতেছে স্পর্শ শক্তিতে। যে দিকে দেখ, কি বাহিরে, কি অভ্যন্তরে, কি ঊর্দ্ধে, কি অধোদেশে শক্তির কার্য্য নাই, এমন স্থানই কুত্রাপি দেখা যাইবে না। মনোনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখ, অনায়াসে বুঝিতে পারিবে।

যে শক্তিতে জগৎ সৃষ্ট হয় কথিত হইয়াছে, তাহাকে চিৎ শক্তি বা মায়া কহে। এই মায়া, কার্য্য বিশেষে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। একটীকে বিদ্যা এবং দ্বিতীয় অবিদ্যা মায়া কহে। বিদ্যা মায়ার অন্তর্গত বিবেক বৈরাগ্য এবং কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য অবিদ্যা মায়ার অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখিত। জীবগণ যখন অবিদ্যা মায়ায় অভিভূত থাকে, তখন তাহারা ঈশ্বর হইতে অনেক দূরে পতিত হইয়া যায়। তাহারা ষড়্ রিপুর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এমনি বিমুগ্ধ ও পরাজিত হইয়া পড়ে যে, তাহারা আপনাদের বিস্মৃত হইয়া রিপুদিগের আয়ত্বাধীনে এক কালে উৎসর্গীকৃত হইয়া যায়। মহা শক্তির উপাসনা করিলে রিপুগণ ক্রমে বিদূরিত হইয়া যায়, তখন মনোরাজ্যে বিবেক ও বৈরাগ্য আসিয়া অধিকার বিস্তার করে। তখন মন, ভাবরূপ রাজপথ প্রাপ্ত হইয়া মহাভাবময়ী মহাশক্তির শক্তিতে ব্রহ্মে মিলিত হইয়া যায়। ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া ত দেখিয়াছ, কিছুই প্রাপ্ত হও নাই। একবার মা কিম্বা সচ্চিদানন্দময়ী অথবা ব্রহ্মময়ী বলিয়া ডাক দেখি, এখনি তাঁহার ধনে ধনী হইয়া যাইবে। যে ঈশ্বর দর্শন এখন অদর্শন হইয়া

রহিয়াছে, তাহা দর্শন করিবে, ভাবে নহে প্রত্যক্ষ করিবে। যে ঈশ্বরকে অজ্ঞেয় বলিয়া বোধ করিতেছ, এ বোধ মায়িক মনে হইতেছে, তাঁহার সহিত বাস্তবিক বিহার করিবে। যে ঈশ্বরকে জ্ঞানে নিরাকার বলিয়া সাব্যস্থ হইয়াছে, তাঁহাকে সাকার রূপে নিকটে পাইবে, কথা কহিবে, স্পর্শ করিবে ভাবিতেছ, হয় কি না হয়, করিয়া দেখ। একবার অকপট চিত্তে বালকবৎ বুদ্ধিতে মা মা বলিয়া কাঁদিয়া দেখ? বল কোথায় আনন্দময়ী, আনন্দ ঘন-মূর্ত্তি দর্শন দিয়া আনন্দধামে লইয়া যাইবেন। তাঁহাকে চায় কে? পাছে তিনি আইসেন, পাছে তাঁহার দর্শন লাভ হয়, এই জন্য একেবারে তাঁহার রূপ উড়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে কি দেখা যাইবে? তাঁহাকে, চায় কে? ঈশ্বর দর্শনের জন্য কাহার আকাঙ্ক্ষা আছে? কে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে বলিয়া সাধন ভজন করিয়া থাকে? ধন হইল না বলিয়া এক ঘটি কাঁদিবে, পুত্র হইল না বলিয়া দশ ঘটি কাঁদিবে, মান্য হউক বলে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে। কিন্তু ঈশ্বর লাভের জন্য বল দেখি, এক ফোঁটা জল কেহ কখন কি ফেলিয়াছ? যে কাঁদিয়াছে, যে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়াছে, তাহার নিকটে তিনি প্রকাশিত হইয়া আছেন। সে প্রাণে প্রাণে তাঁহার রসাস্বাদন করিতেছে। যদ্যপি দেখা দাও বলিয়া ১২ ক্ষণ ১২ দিন, ১২ মাস অথবা ১২ বৎসর (এতদ্দ্বারা অনুরাগের তারতম্য দেখাইয়াছেন) কাঁদ অবশ্যই দেখা পাইবে, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

শক্তির কোন বিশেষ একটী নাম নাই। কেহ কালী বলে, কেহ রাধা বলে, কেহ বা মা বলিয়া ডাকে। শক্তি এক, তাঁহার নাম অনন্ত। যে কথায়, যে বর্ণে বা যে ভাবে তাঁহাকে ডাকা হয়, তাহা একেরই জানিবে। শাস্ত্রে তাঁহাকে পঞ্চাশদ্বর্ণ-রূপিণী বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, জগতে যত প্রকার বর্ণ আছে, যদ্দ্বারা আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকি, তৎ সমুদায় বর্ণ দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই মহাশক্তিকে যে কোন নামে বা যে কোন ভাবে তাঁহার প্রতি মন সংযোগ করিয়া ডাকিলে, অন্তর্যামিনী সেই মুহূর্ত্তে মনোভীষ্ট পূর্ণ করিয়া দিবেন। পরমহংসদেব এইরূপ নানাবিধ উপদেশ দ্বারা কেশব বাবুকে শক্তি স্বীকার করাইয়া লইয়াছিলেন।

ব্রহ্মোপাসনায় কি জন্য শক্তি সাধন আবশ্যক, তাহা পরমহংসদেব এই রূপ কহিয়াছেন। মনুষ্যগণ যাহা দেখিতে পায়, অথবা যাহা অনুভব

করিতে পারে, তদ্দ্বারা সেই বস্তু বা ভাব যে প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা কেবল উদ্দেশ্যে সেরূপ হয় না। ভাব চাই, ভাব ব্যতীত সকল বস্তুই শূন্য ও অন্ধকারময়। আমরা বাল্যকালাবধি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই পঞ্চ ভাব পরিবার-মধ্যে শিক্ষা করিয়া থাকি। এই রূপ ভাব শিক্ষা মনুষ্য স্বভাবসিদ্ধ। শান্ত, দাস্য ও সখ্যভাব প্রায় মনুষ্য মাত্রেরই আছে। বাৎসল্য ও মধুর কাহার নাও থাকিতে পারে। শান্ত ও দাস্যভাব পিতা মাতার ও অন্যান্য গুরুজনের নিকট শিক্ষা করা যায় অথবা তাঁহাদের প্রতি মনুষ্যের স্বাভাবিক যে শ্রদ্ধা ভক্তির ভাব প্রদর্শিত হয়, তাহাকে শান্ত ও দাস্যভাব কহে। বয়স্য ও ভ্রাতা ভগিনীর সহিত সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব সন্তান সন্ততির প্রতি এবং মধুরভাব স্বামী ও স্ত্রীতে লক্ষিত হইয়া থাকে।

কথিত হইল যে, পিতা এবং মাতার প্রতি সন্তানের শান্ত ও দাস্যভাব বিকশিত হইয়া থাকে; কিন্তু পিতা সন্তানের মঙ্গল কামনায় কিঞ্চিৎ কর্কশ ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং জননী অপেক্ষা স্নেহ বিহীন তাহার সন্দেহ নাই। জননীর ভাব সেরূপ নহে। সন্তান যতই দোষের দোষী হউক, তাঁহার চক্ষে নির্দ্দোষী বলিয়া পরিগণিত। মাকে একবার মা বলিয়া ডাকিলে সন্তানের মনে যেমন শান্তি হয়, মাও তেমনি আনন্দিত হইয়া থাকেন। তথায় ভয়ের লেশ মাত্র থাকে না; কিন্তু পিতা বলিলে সে প্রকার ভাব হয় না। মাতার নিকট দোষ স্বীকার করিতে ভয় হয় না, কিন্তু পিতার নিকটে অপরাধী সন্তান অগ্রসর হইতেই অসমর্থ হয়, দোষ স্বীকার করিবে কে? এই নিমিত্ত মাতৃভাবের সাধনই উত্তম। মাতৃভাবের সাধনের আরও হেতু আছে। মনুষ্যচিত্ত স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। নারীর কথা হইলেই কুৎসিত ভাবের উদ্রেক হইয়া মনকে একেবারে নিকৃষ্ট পশুবৎ করিয়া তুলে। সখ্যভাবেও মনের সমতা রক্ষা করা যায় না। কিন্তু মাতৃভাবে সে প্রকার দোষ ঘটিতে পারে না। মাতৃভাবে ঈশ্বর সাধনা করিলে মন ক্রমে উচ্চগামী হয় এবং পৃথিবীর বিশেষ আকর্ষণী কামিনী হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

কেশব বাবু মধ্যে মধ্যে অবসর ক্রমে পরমহংসদেবের নিকট গমন করিতে লাগিলেন এবং ভূরি ভূরি জীবন্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা ও ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ক নিগূঢ় ভাব সকল হৃদয়ের স্তরে স্তরে স্থাপন করিয়া তদনুরূপ আপনাকে প্রস্তুত

করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কখন তর্ক করিতেন না, অথবা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না, অবাক্ হইয়া শুনিয়া যাইতেন।

কেশব বাবুকে এইরূপে উপদেশ দিয়া তাঁহাকে আর এক ছাঁচে ঢালিলেন। যে কেশব ঈশ্বরকে দয়াময় করুণাময় বলিয়া জানিতেন, এক্ষণে মা শব্দ বলিতে শিখিয়া, নিরস, শুষ্ক নিরাকার ব্রহ্ম হইতে রসাল মাতৃ ভাব পাইলেন। তিনি তদবধি মা শব্দে উপাসনা করিতেন। তিনি এত দিনে ব্রহ্ম এবং ঈশ্বরের প্রভেদ বুঝিলেন। ব্রহ্ম যে বলিবার কিম্বা ভাবিবার বস্তু নহে, তাহাও তিনি জ্ঞাত হইলেন। তিনি সেই জন্য চিদ্ ঘন রূপের অনুবর্ত্তী হইয়া ভজনানন্দ সম্ভোগ আরম্ভ করিলেন।

পরমহংসদেব যখন দেখিলেন যে কেশব বাবু শক্তির রসাস্বাদন পাইয়াছে, তখন তিনি বলিলেন যে, ভগবান, ভাগবৎ ও ভক্ত তিনিই এক। অর্থাৎ যিনি ভগবান্, তিনিই ভাগবৎ ও তিনিই ভক্ত। কেশব এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অদ্য কেশব বাবুর মহা পরীক্ষার দিন। যাঁহারা ঈশ্বর এবং জীব স্বতন্ত্র বলিয়া স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহারা সর্ব্বত্রে ঈশ্বর জ্ঞানকে বহু ঈশ্বরবাদী বলিয়া একেশ্বর বাদের আড়ম্বর করিয়া থাকে, আজ সেই গর্ব্বিত ধর্ম্মদ্বেষীদিগের সন্ধিকাল উপস্থিত। কেশব বাবু কোন কথা কহিলেন না। পরমহংসদেব কহিতে লাগিলেন, ভগবান্, ভাগবৎ ও ভক্ত তিনকে এক বলিবার উদ্দেশ্য এই। ঈশ্বরকে ভগবান্ কহে, তাঁহার গুণানুবাদ যাহাতে বর্ণিত আছে, তাহাকে ভাগবৎ ও সেই ভাগবতীয় ভাব যাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে ভক্ত বলে। ভক্তের অবস্থা সাধকের ন্যায় নহে। কারণ সাধকাবস্থায় কেমন করিয়া লীলা রসময়কে হৃদয়ে ধারণ করিবেন, সাধকের এইমাত্র চেষ্টা থাকে। পরে যখন ভগবান্ ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করেন; তথায় তাঁহার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া, তখন সেই ভক্তের হৃদয় মধ্যে ভগবানের কার্য্যই হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ভগবানের স্ব-স্বরূপ এবং ভক্ত হৃদয়-বিহার কালীন, অবস্থার সহিত তাঁহার কোন প্রভেদ থাকে না। যেমন মূর্খের ভিতর পাণ্ডিত্য শক্তি জন্মিলে তাহাকে পণ্ডিতই বলিতে হইবে। পূর্ব্বে মূর্খাবস্থা ছিল বলিয়া, চিরকাল তাহাকে সেই আখ্যায়ে পরিচিত হইতে হয় না।

ভক্তেরা ঈশ্বরকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন, এমন কি তাঁহাকে

তাঁহাদের জীবনের জীবন স্বরূপ, আত্মায় পরমাত্মা স্বরূপ স্থির করিয়া থাকেন। তাঁহার পাদপদ্মে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া আহার বিহারে শয়ন স্বপনে সকল বিষয়েই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকেন। যেমন কোন ব্যক্তি বাতাহত হইয়া সমুদ্র তরঙ্গে নিপতিত হইলে আপনাকে স্রোতের বিপক্ষে পরিচালিত করিতে পারে না। তাহার গত্যনুযায়ী ইতস্ততঃ ভাসিয়া যাইতে হয়। চিদানন্দ সাগরে পতিত হইলে ভক্তদিগেরও সেই রূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ভক্তেরা অগত্যা তাঁহার ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। এ প্রকার আত্ম নিবেদিত ভক্তের যাবতীয় কার্য্য স্বয়ং ভগবান্‌কেই সম্পন্ন করিতে হয়। যেমন কোন ব্যক্তিকে কেহ অভিভাবক জ্ঞান করিলে তাহার সকল কার্য্যেই তিনি উপস্থিত থাকিয়া আশ্রিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। কিন্তু যদ্যপি সেই আশ্রিত ব্যক্তি মৌখিক অভিভাবক স্বীকার করে এবং আপন ইচ্ছাক্রমে কার্য্য সমাধা করিয়া লয়, এমন স্থলে অভিভাবক সে আশ্রিতের কোন কার্য্যেই হস্ত নিক্ষেপ করিতে চাহে না। কপট ভক্তদিগের এই প্রকার দুর্দ্দশা হইয়া থাকে।

যেমন কোন রাজ সরকারের একটী ভৃত্য আছে, ভৃত্যটী রাজার বিশেষ অনুগত, বিশ্বাসী এবং প্রিয়। কিছু দিন পরে সেই ভৃত্যের বাটীতে কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে রাজাকে লইয়া যাইবার জন্য মনে মনে বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। স্বল্প বেতনভোগী ভৃত্য তাহার উত্তম স্থান নাই, অথবা কোন উপায়ও নাই। সে ইতস্ততঃ চিন্তা করিয়া রাজার কোন প্রিয়তম কর্ম্ম-চারীর নিকটে আপন মনোভাব অতি দীনভাবে প্রকাশ করিল। সেই কর্ম্মচারী, ভৃত্যের দীনতা দেখিয়া নিতান্ত প্রীতি লাভ করিলেন এবং যাহাতে এই কথা মহারাজার কর্ণগোচর করিতে পারেন, এরূপ সুবিধা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তিনি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইলেন। ভৃত্যের বিনয়ে রাজা পূর্ব্ব হইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। এ প্রস্তাব হইবামাত্র তিনি দ্বিরুক্তি করিলেন না। ভৃত্যের অবস্থা রাজার অবিদিত ছিল না। তাঁহার গমনের নিমিত্ত যে সকল দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইবে, তাহা রাজ-সরকার হইতে আয়োজন হইবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। রাজার এই আজ্ঞা প্রকটিত হইবামাত্র, সেই ভৃত্যের বাটীতে লোক প্রেরিত হইল। তাহারা প্রথমে অরণ্য পরিষ্কার তদনন্তর শিবির সংস্থাপন, রাজাসন সুসজ্জিত ও ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল। পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজা স্বজন

সমভিব্যাহারে ভৃত্যের বাটীতে আসিয়া উপবেশন করিলেন। ভক্ত সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ভৃত্যরূপ উপাসক সেই রাজাধিরাজ মহাপ্রভুর রাজ সরকারে বিশ্বাসী, বিনয়ী এবং অভিমানশূন্য হইলে, সাধু ভক্তরূপ প্রিয় কর্ম্মচারীদিগের অনুরাগ ভাজন হইবেন। সাধুদিগের কৃপা হইলে ভগবানের কৃপা হইয়া থাকে। তখন তাঁহার নিকট যাহা অনুরোধ করা হয়, তাহা তিনি রক্ষা করেন। উপাসকের হৃদয়ের কথা এই যে, হৃদয়েশ্বরকে হৃদয়মাঝে বসাইয়া হৃদয় ভরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া লইবেন। রাজরাজেশ্বরের নিকট উপাসকের মনোভাব পৌঁছিবামাত্র, অন্তরারণ্য পরিষ্কার হইবার ব্যবস্থা হইতে আরম্ভ হয়। তখন কাম, ক্রোধ প্রভৃতি কণ্টক বৃক্ষ সকল উৎপাটিত হইয়া রত্নবেদী স্থাপিত হয়। প্রেম ভক্তিরূপ ভোজ্য পদার্থ সকল রাজভাণ্ডার হইতে প্রেরিত হইতে থাকে। কালক্রমে রাজাধিরাজ ভৃত্যের হৃদয়-কুটিরে আগমন পূর্ব্বক হৃদয় মন্দিরস্থ রত্ন বেদীর উপরে উপবেশন করেন এবং সকল কার্য্যই আপনি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। অতএব ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ তাৎপর্য্য হইলে, এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে ভগবানের সহিত ভাগবতের কোন পার্থক্য আছে কি না দেখিতে হইবে।

জীবগণ সচরাচর ত্রিবিধ অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া থাকে। যখন তাহারা মন সংযম করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হয়, তখন তাহাদিগকে ঈশ্বরান্তর্গত বলিয়া কহা যায়। কেন না, সে সময়ে তাহাদের অহঙ্কার, মন এবং বুদ্ধির কোন প্রকার কার্য্য থাকে না। ধ্যান ভঙ্গ হইলে মন রক্ষার দ্বিতীয় উপায় ভাগবৎ অর্থাৎ যাহাতে ঈশ্বরের মহিমা এবং গুণকীর্ত্তনাদি বর্ণিত আছে। এ অবস্থায় মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার ভগবানের লীলা রস পানে বিভোর হইয়া পড়ে। সুতরাং অন্য দিকে তাহারা ধাবিত হইতে পারে না। ধ্যান কালীন মনের অবস্থা যে প্রকার, ভাগবৎ বৃত্তান্ত তদন্ত সময়েও মনের অবস্থা সেই প্রকার হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই বলিয়া ব্যক্ত করা যায়। ভক্ত-স্বভাব স্বতন্ত্র প্রকার। তাঁহারা একাকী নির্জ্জন স্থানে সদা সর্ব্বদা বাস করিতে পারেন না, অথবা চাহেন না। তজ্জন্য সময়ে সময়ে ভক্ত সমাজে আসিয়া মিলিত হইয়া থাকেন। ভক্তদিগকে দেখিলে ভগবানকে স্মরণ হয়, তাঁহার ভাব সকল ক্রমান্বয়ে মনোমধ্যে উদ্দীপিত হইয়া যায়। যেমন শোলার আতা

দেখিলে সত্যের আভা মনে হয়। যেমন উকিলদের দেখিলে আদালতের কথা স্মরণ হয়। তেমনি ভক্ত দেখিলে ঈশ্বরের ভাবই আসিয়া থাকে। এই রূপে শরীরের অবস্থান্তর সংঘটিত হইলেও মনের এক অবস্থা অনায়াসে সংরক্ষিত হইতে পারে। অর্থাৎ ধ্যানে ভগবান্, ভাগবৎ রূপে ভগবান্, এবং ভক্ত রূপেও ভগবান্, মনের অবস্থা বিচারে একাবস্থা নিরূপিত হইতেছে। এইজন্য ভগবান্, ভাগবৎ ও ভক্ত এক বলা যায়।

একদা গোকুল কুল রাজ্ঞী যশোদা গোকুল বিহারী গোপালের কোন সংবাদ না পাইয়া প্রেমময়ী রাধার নিকট গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মা গো! তুমি আমার গোপালের কোন সংবাদ জান কি? মহাভাবময়ী তখন ভাবে নিমগ্ন ছিলেন। যশোদার কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল বটে, কিন্তু মনের নিকট অগ্রসর হইতে পারিল না। যখন যোগমাতার যোগ ভঙ্গ হইল, তিনি সম্মুখে নন্দরাণীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিলেন এবং সহসা কি জন্য আগমন করিয়াছেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যশোদা তদ্বিবরণ নিবেদন করিলে পর, শ্রীমতি তাঁহাকে নয়ন মুদ্রিত করিয়া গোপালের রূপ চিন্তা করিতে কহিলেন। যশোদা নয়ন মুদ্রিত করিবামাত্র মহাভাবময়ী তাঁহাকে মহাভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। তিনি ভাবাবেশে গোপালকে দেখিতে লাগিলেন। গোপালরূপ দর্শন করিয়া যখন ভাবভ্রষ্ট হইলেন, তখন শ্রীমতির নিকটে এই বর প্রার্থনা করিলেন, মা! আমি যেন নয়ন মুদ্রিত করিলেই গোপালকে দেখিতে পাই। একাকিনী থাকিলে যেন আমার জিহ্বা গোপাল নাম জপ করিতে পারে এবং লোকালয়ে যাইলে যেন গোপালেরই স্ব-গণকে দেখিতে পাই।

পরমহংসদেব এইরূপে নানাবিধ দৃষ্টান্ত প্রদান পূর্ব্বক কেশবচন্দ্রকে ভগবান্, ভাগবৎ ও ভক্ত বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যখন কোন উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহার সহিত আর একটী পদার্থ মিশ্রিত থাকিত। সেই পদার্থের মোহিনী শক্তির দ্বারা সকলেই বিমোহিত হইয়া যাইতেন। সেই শক্তি কেবল তাঁহারই ছিল। উপদেশ অনেকেই দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার সাময়িক কার্য্যও কদাচিৎ হইতে দেখা যায়। এই মোহিনী শক্তিতে কেশব বাবু পরাজিত হইয়া ভগবান্ ভাগবৎ ও ভক্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। পরমহংসদেব তদনন্তর কৃষ্ণ, গুরু এবং বৈষ্ণব

তিনিই এক, এই কথা স্বীকার করিতে বলেন, তাহাতে কেশব বাবু বিনীত ভাবে বলিয়াছিলেন, এক্ষণে উহা পারিব না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

ভগবান্‌কে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু বলিয়া ভক্তেরা উল্লেখ করেন, সে কথাটী তাঁহাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তের ফল। তাঁহার নিকটে যে যাহা চায়, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন। মাতা যেমন ছেলের আব্দার ভাল মন্দ বিচার না করিয়া, স্নেহবশে তৎক্ষণাৎ অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া সন্তানের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। ভক্ত-বৎসল ভগবানও তাহাই করিয়া থাকেন। কেশব বাবু ঈশ্বরতত্ত্ব লাভের জন্য বাস্তবিক জাতি, কুল, মর্য্যাদা ও নিজ সামাজিক উন্নতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি যথার্থই ঈশ্বর প্রেমরস পান করিবার জন্য আপনাকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। তিনি প্রাণের আবেগে, মনের উচ্ছ্বাসে যে তত্ত্ব কথামৃত লাভেচ্ছায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। কার্য্য দেখিলেই কারণ বুঝা যায়। তাঁহার হৃদয় মরুভূমিপ্রায় ছিল, তাঁহার মন নিরাকার ভাবিয়া একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং এক পথে যাইতে বিপরীত পথে যাইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যদিও ক কে খ বলিয়াছেন এবং আম্রকে আমড়া বলিয়াছেন, কিন্তু সকল কথায় তাঁহার সরল ও সহজ ভাবের আভাস পাওয়া যাইত। এই গুণে ব্রাহ্মসমাজ নেতা পরমহংসদেবের কৃপা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সরল প্রকৃতি ও সত্যানুসন্ধিৎসু চিত্ত ছিল বলিয়া "পরমহংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব * ব্রাহ্ম সমাজে সঞ্চারিত হয়। সরল শিশুর ন্যায়

---

* পরমহংসদেবের তিরোভাবের পর নববিধান সংক্রান্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার ১৮৮৬ সালের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের ইণ্টার প্রিটার নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকার ৮৬ পৃষ্ঠায় তাঁহার সম্বন্ধে এক অদ্ভুত প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রকার অস্বাভাবিক মত পরিবর্ত্তনের হেতু কি, তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন—"He did not bring the idea (God as our mother) into the church, it was there before the minister's aquaintance with him." "নববিধানের

ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন এবং তাঁহার নিকট শিশুর মত প্রার্থনা ও আব্দার করা এই অবস্থাটী পরমহংস হইতেই আচার্য্যদেব বিশেষ রূপে প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম শুষ্কতর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম্ম ছিল। পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সরস করিয়া ফেলে।" ধর্ম্মতত্ত্ব ১৮০৯ শক, ১লা আশ্বিন ১৯৫ পৃষ্ঠা ৮ লাইন। কেশব বাবুর ভিতর স্বচ্ছ ও পরিষ্কার না থাকিলে, পরমহংসদেবের ছায়া কখনই পতিত হইতে পারিত না। এক দিকে কেশব বাবু এবং তাঁহার সম্প্রদায় পরমহংসদেব

মাতৃভাব পরমহংসদেব হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তাঁহার সহিত আচার্য্যের পরিচয় হইবার পূর্ব্বে তাহা বর্ত্তমান ছিল।" "But he by his childlike Bhakti, by his strong conception of an ever ready motherhood, helped to unfold it in our minds wonderfully." "কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় মাতৃভাব এবং বালকবৎ ভক্তির পরাক্রমে আমাদের মাতৃভাব আশ্চর্য্য রূপে বিকশিত হইতে সাহায্য হইয়াছিল।" "His mother was realized as an imaginary Hindu deity our mother was purely spiritual" "হিন্দুদিগের কাল্পনিক ঈশ্বরকে তিনি মাতৃভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের মাতৃজ্ঞান বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ছিল"। "But he undoubtedly intensefied and vivified our conception, we as undoubtedly spiritualized his." "কিন্তু তাঁহার দ্বারা আমাদের মাতৃভাবের ধারণা নিশ্চিৎ জীবিত এবং প্রগাঢ় হইয়াছিল। আমরা তাঁহার মাতৃভাবকে আধ্যাত্মিক ভাবে পরিণত করিয়াছিলাম"। "His conceptions were all mythological, our conceptions were purely monothestic." "তাঁহার সমুদয় ধারণা কাল্পনিক দেব দেবীর ভাবে পরিপূর্ণ ছিল; আমাদের ধারণা বিশুদ্ধ একেশ্বর বাদ"। "By associating with him we learnt better Divine attributes as scatterd over the 330 millions of Deities of mythological India, the God of the Purans. By associating with us he learnt to realize better the undivided deity, the God of the Upanishad, the Akhanda Sachidanunda." "তাঁহার সংসর্গে পৌরাণিক ভারতের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঈশ্বরের প্রকৃতি, যাহা ৩৩ কোটি দেব দেবী বলিয়া উল্লেখিত, তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম রূপে ধারণা করিতে শিক্ষা করিয়াছি; আমাদের সহবাসে তিনি উপনিষদের অখণ্ড সচ্চিদানন্দের ভাব উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করিয়াছেন।" তত্ত্ব মঞ্জরী ২ ভাগ ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা ৭১ পৃষ্ঠা। কিন্তু এই মহাত্মা কর্ত্তৃক ১৮৭৯ সালের থিষ্টিক কোয়াটার্‌লী রিভিউ নামক পত্রিকার ৩৩ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "What is his religion? It is Hindu-

হইতে যেরূপে তাঁহাদের অবস্থানুরূপ ধর্ম্ম গঠন করিতে হয়, তাহার বিশেষ সুবিধা পাইলেন। পরমহংসদেবও কেশবের ন্যায় বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, ভক্তি পরায়ণ লোক সে পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয় প্রাপ্ত হন নাই। তিনি যাহা বলিতেন, যে প্রকার ভাবে কথা কহিতেন, তাহা সমুদায় বুঝিতে পারিতেন কি না, জানি না; কিন্তু আপন ভাবেই হউক, অবথা অন্য কোন ভাবে গঠিত করিয়াই হউক, তাহা আয়ত্ত্ব করিয়া লইতেন। বাক্ বিতণ্ডা করিয়া নিজ মত কখন প্রবল করিতে চেষ্টা কিম্বা কখন মনেও করিতেন না।

---

ism, but Hinduism of a strange type. Ram Krishna Paramhansa, for that is the saint's name, is the worshipper of no particular Hindu God. He is not a shivate, he is not a Sakta, he is not a Vaishnava, he is not a Vedandist. Yet he is all these. He worships Shiva, he worships Kali, he worships Ram, he worships Krishna and is a confirmed advocate of Vedantist doctrines. He is an Idolator and is yet a faithful and most devoted meditator of the perfections of the one formless, infinite deity whom he terms, Akhanda Suchidanunda." "তাঁহার ধর্ম্ম কি? হিন্দুধর্ম্ম কিন্তু ইহা এক আশ্চর্য্য প্রকার হিন্দুধর্ম্ম। সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন বিশেষ হিন্দু দেবতার উপাসক নহেন। তিনি শৈবও নহেন, শাক্তও নহেন, বৈষ্ণবও নহেন এবং বৈদান্তিকও নহেন। কিন্তু এ সকলই তিনি। তিনি শিবের উপাসনা করেন, কালীর উপাসনা করেন, রামের উপাসনা করেন, কৃষ্ণের উপাসনা করেন এবং বেদান্ত মতের দৃঢ় সমর্থনকারী। তিনি একজন পৌত্তলিকও বটেন; কিন্তু অদ্বিতীয় নিরাকার এবং অনন্ত ঈশ্বরের পূর্ণত্বের একান্ত উৎসর্গীকৃত অনুরক্ত ধ্যাতা, যাঁহাকে তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলিয়া অভিহিত করেন।" To him each of these deities *is a force an incarnated principle tending to reveal the supreme relation of the soul to that eternal and formless being who is unchangeable in his blessedness and light of wisdom."* তাঁহার নিকট এই প্রত্যেক দেবতাই সেই সনাতন চিদানন্দ এবং নিরাকার সত্ত্বার সহিত মানবাত্মার মহোচ্চ সম্বন্ধ আবিষ্কারক একটী শক্তি এবং আকারে পরিণত তত্ত্ব"। "These incarnations, he says, are but the forces (Shakti) and dispensations (Leela) of the eternally wise and blessed (Akhanda Suchidananda) who never can be changed nor formulated, who is one endless and everlasting

যখন কোন মতে বুঝিতে না পারিতেন, তখন পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। এই নিমিত্ত পরমহংসদেব কেশবের সহিত বাক্যালাপ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইতেন। ফলে, কেশব বাবু হইতেই পরমহংসদেব এক প্রকার প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।

পরমহংসদেব কথন কথন ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া উপাসনাদি শ্রবণ করিয়া যাইতেন। একদা উপাসনান্তে পরমহংসদেব কেশব বাবুকে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন, কেশব! তুমি বলিলে যে, ভক্তি নদীতে প্রীতি

---

ocean of light, truth and joy." "তিনি বলেন যে এই সকল অবতার সেই অনন্ত জ্ঞানময় এবং করুণা নিধান অখণ্ড সচ্চিদানন্দের লীলা এবং শক্তি। যিনি পরিবর্ত্তন এবং নিরাকরণ হীন। যিনি অদ্বিতীয়, অসীম এবং অখণ্ড সৎ চিৎ এবং আনন্দের সমুদ্র"। "He would sometimes say the incarnations forsook him, his mother the Vidyashakti Kali stood at a distance. Krishna could not be realized by him, either as Gopal the child or swami the lord of the heart and neither Rama nor Mahadev would offer him much help. The *nirakar* Bramha would swallow every thing and he would be lost in speechless devotion and rapture." "তিনি কথন কথন বলেন যে রূপাদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছে। তাঁহার মাতা বিদ্যাশক্তি কালী দূরে আছেন, কৃষ্ণকে বাৎসল্য ভাবে গোপাল রূপে অথবা মধুর ভাবে স্বামীরূপে অনুভব করিতে পারিতেছেন না। রাম কিম্বা মহাদেবও তাঁহাকে সাহায্য করেন না। নিরাকার ব্রহ্ম সমুদায় গ্রাস করিয়া ফেলে এবং তিনি নির্ব্বাক আনন্দ এবং ভক্তি রসে নিমগ্ন হইয়া যান।" "But so long as he is spared to us gladly shall we sit at his feet to learn from him the sublime precepts of purity, unworldliness, spirituality and inebriation in the love of God." "কিন্তু যতদিন তিনি আমাদের নিকট জীবিত আছেন, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার চরণ তলে উপবেশন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পবিত্রতা, বৈরাগ্য, চিরবাসনা শূন্য আধ্যাত্মিকতা এবং ভগবৎ প্রেমোন্মত্ততা সম্বন্ধীয় অত্যুচ্চ উপদেশ শিক্ষা করিব"। তত্ত্বমঞ্জরী ২ ভাগ ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা ১১৬ পৃষ্ঠা। প্রতাপ বাবু পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁহাতে ধর্ম্মের সকল ভাবই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু পরলোক যাত্রার পর তাঁহাকে একটী কিম্ভুত কিমাকার ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এ প্রকার সত্য অপলাপ করিবার হেতু কি? তাঁহার ভাব হইতে নববিধান গ্রহণ করা হইয়াছে. এ কথা পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে সেই জন্য আপনাদের সুবিধা মত তাঁহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে। এ কথা ভিন্ন আর কি বলা যাইবে?

কমল প্রস্ফুটিত হইলে—ভাল জিজ্ঞাসা করি, নদীতে কি কখন পদ্ম ফুটিতে দেখিয়াছ? পুষ্করিণীতে কিম্বা আবদ্ধ জলাশয়ে পদ্ম জন্মে। কোন্ নদীতে পদ্ম দেখিয়াছ? অতএব এ উপমাটী অসংলগ্ন হইয়াছে। আর এক কথা তুমি বলিয়াছ যে, ভক্তি নদীতে ডুব দিয়া চিদানন্দ সাগরে চলিয়া যাও। ইহা তোমার কি ভাব? নদী সকল সাগরের সহিত মিলিত হইয়া আছে, কিন্তু তুমি নদীতে ডুব দিয়া সাগরে যাইবে কি রূপে? একবার ডুবিয়া দেখ দেখি, যাইতে পার কি না? পশ্চাতে যে পায়ে দড়ি বাঁধিয়া পুত্র পরিবার দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছ। যদি বল যে, নদীতে আসিয়া শরীর স্নিগ্ধ হইয়াছে। এখন গাত্র দাহ নিবারণ হওয়ার বল পাইয়াছি, ডুব দিয়া দড়ি কাটিয়া পালাইয়া যাইব; কিন্তু তাহা পারিবে না। যাহাদের সঙ্গে করিয়া আনিয়াছ, (তথাকার উপস্থিত মহিলাদিগকে দেখাইয়া) ওঁদের দশা কি হইবে? সংসারে থাকিয়া যত দিন ঈশ্বর সাধন করিবে, তত দিন একেবারে ডুব দিয়া সাগরে না যাইয়া একবার নদীর কিনারায় উঠিও।

পরমহংসদেবের উপদেশ সকল নিতান্ত কঠোর ও রসহীন নহে। তিনি নিজে রসিক-চূড়ামণি ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার এক একটী উপদেশ রসে ঢল ঢল করিতে থাকে। এক দিন কেশব বাবুকে দক্ষিণেশ্বরে রজনী যাপন করিবার জন্য পরমহংসদেব আজ্ঞা করিয়াছিলেন। কেশব বাবু নানাবিধ কারণ দেখাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চলিয়া আসিতে মনস্থ করিলেন। পরমহংসদেব তচ্ছ্রবণে কহিয়াছিলেন, বাস্তবিক আমার এরূপ অনুরোধ করা ভাল হয় নাই। আঁস চুবড়ী না হইলে কি তোমাদের ঘুম হয়? আমার একটী গল্প মনে হইতেছে। কোন গ্রামে দুই জন ধীবর কার্য্যানুরোধে গ্রামান্তরে গমন করিয়াছিল। প্রত্যাগমনের সময় পথিমধ্যে সন্ধ্যা হইয়া গেল। পথটী নিতান্ত দুর্গম, দুই পার্শ্বে বন, রাত্রে দিগ্বিদিক্ কিছুই দেখা যায় না। কোথায় যাইবে, বিবেচনা করিয়া নিকটস্থ এক উদ্যানে প্রবেশ পূর্ব্বক মালির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। একে পুষ্পোদ্যান, তাহাতে রাত্রিকাল, নানা জাতি ফুলের সৌরভে বাগানটী আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। ধীবরদিগের স্থান পরিবর্ত্তন বিধায় এবং পুষ্প-সৌরভ তাহাদের চির অভ্যস্থ শুষ্ক মৎস্যের দুর্গন্ধভোগের নাসারন্ধ্রে অসহ্য হওয়ায় কিছুতেই নিদ্রাকর্ষণ হইল না। যত মন্দ মন্দ সমীরণ পুষ্পের সুগন্ধকণা তাহাদের

নিকট সঞ্চালিত করিতে লাগিল, ততই তাহাদের ক্লেশের পরিসীমা রহিল না। অবশেষে তাহারা উঠিয়া বসিল এবং কত ক্ষণে রজনী শেষ হইবে, এই ভাবিয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল, এমন সময়ে কয়েকজন ধীবর-কন্যা মস্তকে মৎস্যের ঝুড়ি লইয়া মৎস্য ক্রয় করিতে যাইতেছিল। তাহাদের দেখিয়া, ধীবরেরা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া গিয়া তাহাদের নিকট হইতে মৎস্যের ঝুড়ি লইয়া উহারা তন্মধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া দিল এবং আঘ্রাণ লইয়া এতক্ষণে বাঁচিলাম বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাই ত কেশব? ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া আজও রেড়ীর কলটী বন্ধ করিতে পারিলে না। ইহা নিতান্ত কুলক্ষণ জানিবে। কেশব বাবু কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া এই বাক্যগুলি শিরোধার্য্য জ্ঞান করিয়া লইয়াছিলেন।

পরমহংসদেবের উপদেশে কেশব বাবু নিতান্ত আত্মহারা হন নাই। তাঁহার নিজভাব বিসর্জ্জন দিয়া পরমহংসদেবের ভাবগুলি লইয়া একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যান নাই। যদিও, সেই উপদেশগুলি রত্নভাণ্ডারে সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। যদিও তাহার কিয়দংশ পরমহংসের উক্তি বলিয়া ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছিলেন; কিন্তু অধিকাংশ ভাব নিজের মতে পুনরায় গঠন করিতে যাইয়া বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন যে, এক ঈশ্বর তাঁহার অনন্ত শক্তি, প্রত্যেক শক্তির স্বতন্ত্র ভাব এবং স্বতন্ত্র রূপ। মনুষ্যগণ এক জাতি পদার্থ দ্বারা সংগঠিত হইয়াও আকৃতি ও প্রকৃতিতে প্রত্যেককে স্বতন্ত্র বলিয়া দেখা যায়। কোন ব্যক্তির মুখ কাহার সহিত সমান নহে। কিম্বা যেমন জল এক পদার্থ। কেহ তাহাকে পাণি, কেহ বারি, কেহ নীর, কেহ ওয়াটার (water) এবং কেহ একোয়া (aqua) বলে। এস্থলে ভাষার সম্পূর্ণ প্রভেদ রহিয়াছে। ওয়াটার কিম্বা একোয়া বলিলে ইংরাজী কিম্বা ল্যাটীন বিদ্যানভিজ্ঞ ব্যক্তি কিছুই বুঝিতে পারিবে না বলিয়া, ইংরাজের কি ভাবান্তর হইয়াছে বলিতে হইবে? কখনই নহে। সেই প্রকার এক ঈশ্বরকে যে, যে ভাবে উপাসনা করে, তাহাদের কোন দোষ হয় না। কেশব বাবু একটী নূতন কথা শুনিলেন। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত। সকল দেশের ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে এই ভাব জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

ভারতবর্ষ ধর্ম্মের জন্য চির-প্রসিদ্ধ, তাই এ দেশে ঘরে ঘরে সম্প্রদায়। খৃষ্ট-মতাবলম্বীরা ধর্ম্ম প্রচার করিতে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতার আর অন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি? সকলেই মনে করেন, তাঁহার ধর্ম্মটী শ্রেষ্ঠ; কিন্তু পরমহংসদেব সকলের মান রাখিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্ম জগতের এই আভ্যন্তরিক বিবাদ ভঞ্জন করিবার জন্য স্বয়ং সাধক হইয়াছিলেন, তাই তিনি জোর করিয়া বলিতে পারিতেন, সকলের ধর্ম্মই সত্য, সকলেই এক জনের উপাসনা করিয়া থাকে। কেশব বাবু এই ভাব বিকৃত করিলেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ইংরাজ কর্ত্তৃক হিন্দু শাস্ত্র ভাষান্তর হইলে, উহা আমাদের পাঠোপযোগী হইয়া থাকে। সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা হিন্দু ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া থাকি। ইহা আমাদের নিতান্ত পৌরুষের কথা নহে? এই জন্যই হিন্দু-দের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। এই অবস্থায় আমরা আমাদের ধর্ম্মের মর্ম্ম যে প্রকার বুঝিয়া থাকি, তাহা আর পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। কেশব বাবু তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন। তিনি একটী যে নূতন ভাব লাভ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভ্রম হয় নাই। কিন্তু কি কালের প্রতাপ! পৃথিবীর কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! কেশব বাবু সে ভাব আর এক প্রকারে দাঁড় করাইলেন। এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অনন্ত ভাব। অনন্ত ভাবের পরিচয় অনন্ত ব্যক্তি, যে ব্যক্তির যে ভাব সেই ব্যক্তি সেই ভাবের পরিচায়ক। তাহা না বলিয়া, তিনি সকল ভাবের সমষ্টি করিয়া এক স্থানে দেখাইতে চেষ্টা করিলেন। তাহার নাম "নববিধান" দেওয়া হইল। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ও বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের সার ভাগ মন্থন করিয়া এই নূতন বিধানের সৃষ্টি হইল। ইহা তাঁহার নিতান্ত বুঝিবার দোষ হইয়াছিল। তিনি ভাব রাজ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই স্বভাব হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। স্বকপোল কল্পিত ভাব কি ধর্ম্ম জগতে এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে? এত আকাশ কুসুম নহে যে, যাহা বলিলাম, কেহ ধরিতে পারিবে না। ধর্ম্ম প্রাণের আরাম, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ বস্তু, যে কেহ খুঁজিবে, সেই পাইবে, সেই বুঝিবে, তাহাতে গোঁজা মিলন চলিতে পারে না। সত্যের জয় চিরকাল। কেশব বাবু পরমহংসদেবকে চাপা দিয়া যাইলেন। নববিধানের ঢোল বাজিয়া উঠিল—বিধান পতাকা পৎ পৎ করিয়া গগনমার্গে উড্ডীয়মান হইল; কিন্তু তাহা আর নাই।

সে নিশান ছিন্ন ভিন্ন, সে ঢোল ফাঁসিয়া গিয়াছে। সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে * ।

কেশব বাবু একজন পণ্ডিত এবং পরমহংসদেব সে সম্বন্ধে নিরক্ষর ছিলেন। কেশব বাবু কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির পুত্র পরমহংসদেব ৭ টাকা বেতনের দেবালয়ের কর্ম্মচারী, এমন ব্যক্তির পদে মস্তকাবনত করা সামান্য কথা নহে। আমরা দেখিয়াছি, কেশব বাবু পরমহংসদেবকে যে প্রকার শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন এবং পরমহংসদেবও কেশব বাবুকে যে প্রকার ভাল বাসিতেন, তেমন আমরা আর দেখি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেশব বাবু যখন পরমহংসদেবের নিকট গমন করিতেন, তিনি হিন্দুদিগের দেব দর্শনে যাইবার পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক হয় পুষ্প কিম্বা একটী ফল লইয়া যাইতেন। উহা তিনি গুপ্তভাবে প্রদান করিতেন

* কেশব বাবু কখন কোন প্রকাশ্য স্থানে অথবা কোন পুস্তকে কিম্বা সংবাদ পত্রে পরমহংসদেব সম্বন্ধে তাঁহার নিজের ভাব কিছু প্রকাশ করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। আমাদের যত দূর জানা আছে, তাহাতে তিনি কিছু বলেন নাই, এই বিশ্বাস। কারণ "নববিধান" নামক গ্রন্থের ৫ম পৃষ্ঠায় কেশব বাবু যাহা নববিধানের নূতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পরমহংসদেবের কথা, ভিন্ন অর্থে স্বনামে প্রকাশিত হইয়াছে—যথা, ঈশ্বর দর্শন ও তাঁহাকে স্পর্শন করা যায়, প্রত্যক্ষ নহে—ভাবে। নিরাকার ঈশ্বরকে নিরাকারে স্পর্শন করা যায়। এই সকল বিষয়ের ভাব চ্যুতি হইয়াছে। সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের ভিতরেও বিশেষ গোলযোগ রহিয়াছে। তিনি, জ্ঞানী, কর্ম্মী, ভক্ত, খৃষ্ট প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়া তাহাদের যথাস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ যে ধর্ম্মের যেটী সার তিনি তাহা এক স্থানে সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাই নবভাব; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভাব বিশেষ লাভ করিতে হইলে, তাহার সাধন চাই। বিনা সাধনে কি সাধ্য বস্তু লাভ হইতে পারে? বৈষ্ণবদিগের প্রেম উত্তম, তাহা তিনি লইয়াছেন, কিরূপে লইলেন? বৈষ্ণব মতে কি তিনি পরমহংসদেবের মত সাধন করিয়াছিলেন? শাক্ত না হইলে শক্তির ভাব বুঝিবে কে? মুসলমান হইয়া সাধক না হইলে মহম্মদীয় ভাব আয়ত্ত হইবে কি রূপে? খৃষ্টান ধর্ম্ম আলোচনা না করিলে কি খৃষ্টকে জানা যায়? মুখের কথা এবং বুদ্ধির বিচারে তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয় না। এই সকল কারণে কেশব বাবু নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন এবং পরমহংসদেবের প্রকৃত ভাব বুঝিয়াই হউক কিম্বা না বুঝিয়াই হউক যে ভিন্ন ভাবে প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তি স্বীকার করিবেন।

এবং আসিবার সময় চরণস্পর্শিত কোন একটী দ্রব্য লইয়া আসিতেন। কেশব বাবু পরমহংসদেবকে তাঁহা হইতে কত উচ্চ জ্ঞান করিতেন, তাহা একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝা যাইবে। এক দিন পরমহংসদেব কেশব বাবুকে কিছু উপদেশ দিতে বলিয়াছিলেন। কেশব বাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন "কামার দোকানে কি সূচিকা বিক্রয় করা সাজে।"

কেশব বাবু নববিধান রচনা করিয়া পরিশেষে আপনি তাহার বিষময় ফল অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মকে এক করিয়াছিলেন; কিন্তু গোটাকতক স্বজাতীয় লোককে এক মতে রাখিতে পারেন নাই।

কেশব বাবু শেষাবস্থায় পরমহংসদেবকে চৈতন্যের অবতার বলিয়া কোন কোন ব্যক্তিকে বলিয়াছেন। এক দিন ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গলা দপ্তরের সহকারী সম্পাদক বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র কেশব বাবুকে পরমহংসদেবের ঈশ্বর পরায়ণতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেশব বাবু তাহাতে বলিয়াছিলেন যে, শাস্ত্র মধ্যে প্রেমভাব মহাভাব প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ জানা আছে, তাহা সকল সাধকের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। মহাভাবের লক্ষণ এ প্রদেশে চৈতন্যের হইত এবং বিজাতীয়দিগের মধ্যে ঈশার মহাভাব হইত বলিয়া তাঁহার গৃহের একখানি ছবি দেখাইয়া দিলেন। পরমহংসদেবের এই ভাব হয় তজ্জন্য অনেকে চৈতন্যাবতার বলিয়া মনে করেন।

কেশব বাবু যখন পীড়িতাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তখন পরমহংসদেব তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, বাগানে ফুল ফুটিলে উদ্যান-স্বামী উহা ছিঁড়িয়া লয় অর্থাৎ তোমার মন রূপ ভক্তি পুষ্প এখন ফুটিয়াছে, উহা মাতার চরণপ্রান্তে যাইয়া চিরদিনের মত পতিত হউক। কেশব বাবুর পরলোক যাত্রায় পরমহংসদেব বিশেষ বিষাদিত হইয়াছিলেন। কেশব বাবু আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে কি হইত, বলা যায় না। বিজয় বাবুকে দেখিয়া এখন নানাবিধ ভাব মনে আসিয়া থাকে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের প্রায় সকল সাধুরই সহিত পরমহংসদেবের পরিচয় ছিল, কিন্তু অপর সাধারণ লোকে, এমন কি, দক্ষিণেশ্বর নিবাসী ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিত না। দক্ষিণেশ্বরের যে সকল লোকের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল, তাহারা তাঁহাকে পাগল বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। অদ্যাপি তথাকার অনেকেরই এই ধারণা আছে। কেশব বাবুর গতি বিধি হওয়ায় লোকের কিঞ্চিৎ চমক্ হইয়াছিল এবং ভক্ত সাধু বলিয়া তিনি কাগজে লিখিতেন এবং অনেকের নিকটে গল্পও করিতেন, ইহা দ্বারা অপর সাধারণে তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পরমহংসদেব যে একজন অতি মহান্ ব্যক্তি এ প্রকার ধারণা করিয়া দিবার জন্য কেহই চেষ্টা করেন নাই। *

লোকের স্বার্থপরতা দোষ বশতঃই হউক অথবা পরমহংসদেব জনতা হওয়া ভালবাসিতেন না বলিয়াই কাহার সাহস হয় নাই, তাহা বলিতে পারা দুঃসাধ্য। ফলে সর্ব্বসাধারণের তদ্দ্বারা বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে। আজ কাল ধর্ম্ম শাস্ত্রের সার মর্ম্মোদ্ধার করা অতিশয় সুকঠিন। বিশেষতঃ বর্ত্তমান বিজাতীয় ভাব-শঙ্কর কালে পরমহংসদেবের ন্যায় আচার্য্যের বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই নিমিত্তই তাঁহার শুভাগমন হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, পরমহংসদেব আর রাসমণির কালী বাটীর এক জন বাতুল বলিয়া বিষয় বাতুলদিগের নিকট আবদ্ধ রহিলেন না। দলে দলে শিক্ষিত

---

* চেষ্টা করা দূরে থাক, আমরা যখন তাঁহার নিকট গতিবিধি করিতাম, কেশব বাবুর কোন শিষ্য আমাদের তথা হইতে ভাঙ্গাইয়া স্বদল ভুক্ত করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কেশব বাবু নাকি কহিয়াছিলেন যে, পরমহংস মহাশয় কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী তাঁহার নিকটে গৃহীর পোষাইবে না। তিনি একদিন কুটুস্ করিয়া কামড়াইয়া ধরিবেন, সে দিন উঁহাদের (আমাদের) কি হইবে। আমাদের মধ্যে সকল ভাবই আছে। উক্ত কেশব বাবুর শিষ্য মহাশয়ের সহিত একদিন গুরুতত্ত্ব লইয়া আমাদের অনেক কথা হয়, সেই সকল কথা কেশব বাবুকে কহায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, উঁহাদের আর ঘেঁটাইয়া কাজ নাই।

না। তন্নিমিত্ত অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াও চিনিতে পারে নাই। আমাদের সেই দিন সৌভাগ্য সূর্য্য উদয় হইল, আমাদের মনের কুসংস্কারের গুদাম সেই দিন পরিষ্কৃত হইল। বিলাতি কু-শিক্ষায় যাহাদিগকে কুসংস্কার বলিয়া অতি যত্নে শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহাদের আদর করিয়া লইতে পুনরায় শিক্ষা পাইলাম। পরমহংসদেব যে জন্য আসিয়াছিলেন, যে জন্য তাঁহার জপ তপ, যে জন্য তাঁহার কার্য্য কলাপ, যে জন্য তাঁহার প্রচার সেই দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। নাস্তিকের ঠাকুর, পতিতপাবন পরমহংসদেব আপনি আমাদের জন্যই এত দিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। নির্দ্ধন কাঙ্গালের জন্য ধনীরা মুক্তহস্ত হইয়া থাকেন, মুক্ত হস্ত হইলে কি হইবে, ধন গ্রহণ করে কে? যেমন আমরা কাঙ্গাল, যেমন দরিদ্র ছিলাম, আমাদের সকল স্থানই শূন্য ছিল। তেমনি আমাদের দাতা জুটিল, আমরা অকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তাঁহার রত্নভাঁণ্ডার লুট করিব মনে করিয়া, সপরিবারে, স্ববান্ধবে, স্বজনবর্গের সহিত কত প্রয়াস পাইলাম, আমাদের সকলের আধার পাত্র পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল; কিন্তু তাঁহার ভাণ্ডার কিছুতেই শূন্য করিতে পারিলাম না, কেহই পারিল না। হায় হায়! ভাণ্ডারে কত রত্নই ছিল, অগ্রে জানিলে স্বদেশ, বিদেশ হইতে পরিচিত অপরিচিত যে যেখানে আছেন, তাঁহারা না আসিলে অনুনয় করিয়া পায়ে ধরিয়া রত্ন লুট করিতাম। ক্ষুদ্র আধার, সীমা বিশিষ্ট বুদ্ধি লইয়া বাস করিতেছি, অসীম ব্যাপার বুঝিব কি? তাহা স্থান পাইবে কোথায়?

পরমহংসদেব বাস্তবিকই জ্ঞান রত্ন ও ভক্তি মাণিক্যের আকর ছিলেন। এতগুলো কাঙ্গাল ধনী হইয়া গেল, তথাপি ধন ফুরাইল না, এ কি সামান্য রহস্যের কথা! এখন ক্রমে আমাদের ন্যায় কত চোর, লম্পট, মাতাল, অনাচারী, বিশ্বাসঘাতক, দলে দলে আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। অবারিত দ্বার কাহাকেও বিমুখ করিলেন না। দয়ার অবতার না বলিয়া আর কি বলিব? যাহারা লোকালয়ে স্থান পাইত না, যাহাদের ধর্ম্ম, ধর্ম্মজগতে ছিল না, যাহাদের গুরু গুরুশ্রেণীরা হন নাই, তাহাদের বাহু প্রসারণ করিয়া পরমহংসদেব ক্রোড়ে হইলেন।

এই ভক্তদিগের মধ্যে প্রত্যেকের ভাব স্বতন্ত্র প্রকার। কাহাকে কালী, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, প্রভৃতি সাকার উপাসক ও কাহাকে শঙ্কর, ভাস্কর, পুষ্কর প্রভৃতি জ্ঞানপন্থী সাধকদিগের পদচিহ্নানুক্রমে গমন করিতে দেখা

যাইতেছে এবং কাহাকেও পরমহংসদেবকে জীবন মরণের একমাত্র অবলম্বন, সহায়, সম্পত্তি, গুরু, ঈশ্বর ও পরিত্রাতা বলিয়া নিশ্চিন্তে, নিরুপদ্রবে, নির্ব্বিঘ্নে নিরানন্দ বিহনে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতেছে।

এই ভক্তগণ ব্যতীত তাঁহার আরও ভিন্ন ভিন্ন ভাবের অসংখ্য ভক্ত আছেন। কতকগুলি মুসলমান, (এক জনকে আমরা জানি, তিনি ডাক্তার) খৃষ্টান (দুই জনের সহিত আমাদের পরিচয় আছে, এক জনের নাম পি. ডি. মিসির।) ইনি সন্ন্যাসী বিশেষ মৎস্য মাংসত্যাগী। যোগাদিঅভ্যাস আছে, নামেও ভাব হয়। অপর ব্যক্তির নাম উইলিয়েম। ইনি ভক্তি প্রধান প্রকৃতির লোক। (পরমহংসদেবের নিকটে অভিপ্রেত আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া এক্ষণে পার্ব্বত্য প্রদেশে যোগাভ্যাস করিতেছেন) এবং বাউল, কর্ত্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি অনেক ভক্তই আছেন। তাঁহারা আপন আপন ভাবেই গুপ্ত সাধন করেন।

পরমহংসদেব এইরূপে অনুমান শতাধিক ভক্ত লইয়া কিছু দিন আনন্দের তরঙ্গ ছুটাইয়াছিলেন। কোন দিন বাদ নাই, কোন রাত্রে বাদ নাই, ভক্ত সঙ্গে সদাই আনন্দিত থাকিতেন। প্রতি সপ্তাহের শনিবারে কোন একজন ভক্তের বাটীতে আসিতেন। তথায় কীর্ত্তন, নৃত্য ও উচ্চ হরিধ্বনিতে সে বাটী ও পল্লী পুলকার্ণবে ভাসাইয়া যাইতেন। তাঁহার হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে যে কত পাষণ্ড দলিত হইয়াছে, তাহার সীমা নাই।

পরমহংসদেবের অতিশয় অন্তর্দৃষ্টি ছিল। যাহার যাহা মনে হইত, যে যাহা মনে প্রার্থনা করিত, তিনি তখনি তাহা সম্পূর্ণ করিয়া দিতেন। প্রত্যেক ভক্ত এই ঘটনার বিষয়ে বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়াছে। তাঁহার এই শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য জনৈক বীরাচারী তাঁহার বাটীতে বসিয়া তাঁহাকে মনে মনে আহ্বান করিবামাত্র, পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুরেশ বাবু তিন দিন পরীক্ষা করেন। একদিন তাঁহাকে দেখিবার জন্য সুরেশ বাবুর মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠে। তিনি আফিষে যাইয়া কর্ম্ম কাজ করিতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, পরমহংসদেব একখানি গাড়ী আনাইয়া সুরেশ বাবুর বাটীতে আসিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। সুরেশকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি যদি আসিয়াছ,

তবে আর কেন যাইব। তোমায় দেখিবার নিমিত্ত বড়ই উতলা হইয়াছিলাম। সুরেশ বাবু তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিজ বাটীতে আসিয়াছিলেন। আরও দুই দিন তিনি পরমহংসদেবের সাক্ষাৎকার প্রয়োজন বিবেচনায় কাঁদিয়াছিলেন, তিনি দুই দিবসই আসিয়া প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

পরমহংসদেব এইরূপে শিষ্টের পালন এবং পাষণ্ড দলন করিয়া ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন পূর্ব্বক দিনাতিবাহিত করিতেছিলেন। ঠাকুর বাড়ীর সকল কর্ম্মচারীরাই পরমহংসদেবকে পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। মথুর বাবুর পুত্র ত্রৈলোক্য বাবুও ভক্তির ত্রুটি করিতেন না, কিন্তু তাঁহার পিতার যে প্রকার ভক্তি ছিল, তাহার শতাংশের একাংশও দেখাইতে পারেন নাই। বিষয়ী লোকেরা যেমন সচরাচর হইয়া থাকে ইনি সেই প্রকার ছিলেন। ঠাকুর বাড়ীর উদ্যানটী তিনি দুইভাবে ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সহিত কলিকাতার অনেক রকমের লোকই যাইতেন। তাঁহারা বাগানের আমোদ আহ্লাদেই দিন কাটাইতেন এবং মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবকেও তথায় ডাকাইয়া পাঠাইতেন। উদারচেতা পরমহংসদেব তাহাতে কখন অভিমান প্রকাশ করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যাঁহারা বৈটকখানায় বসিয়া সাধুকে ডাকিয়া পাঠান তাঁহাদের উপর কি মান অভিমান সাজে? ডাকিবামাত্র তিনি তথায় চলিয়া যাইতেন, কিন্তু দীর্ঘকাল থাকিতে পারিতেন না।

পূর্ব্বে যে হৃদয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছিল তিনি এ পর্য্যন্ত ঠাকুর বাড়ীতে সেবা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। হৃদয় পরমহংসদেবের অনেক সেবা করিয়াছিলেন, সেই সেবার ফলে তিনি মধ্যে পরমহংসদেবের অনুগ্রহও লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু অনুগ্রহ হইলে কি হইবে তাঁহার ছিদ্র কুম্ভ, সমুদায় কৃপাবারি বাহির হইয়া গিয়াছিল। পরমহংসদেব হৃদয়কে প্রাণাধিক ভাল বাসিতেন। হৃদয় কামিনী কাঞ্চনত্যাগী মহাপুরুষের নিকটে থাকিয়াও তাঁহার সেই ভাব অতি প্রবল রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সাধারণ লোকেরাই তাঁহার মাথা খাইয়া

ছিল তাহার সংশয় নাই। হৃদয়কে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে কেহ ইচ্ছাক্রমে কিম্বা প্রাণ ভরিয়া পরমহংসদেবের নিকটে বসিতে অথবা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিত না। সুতরাং যাহার যেমন সঙ্গতি, তিনি সেই প্রকারে হৃদয়ের পূজা করিতে বাধ্য হইতেন। ক্রমে তাঁহার লোভ বাড়িয়া গেল। পরমহংসদেব তাহা জানিতে পারিয়া হৃদয়কে নানা প্রকার উপদেশ দিতেন এবং কেহ কিছু দিতে চাহিলে, তিনি নিষেধ করিতেন। হৃদয় তাহাতে বিরক্ত হইতে লাগিলেন এবং সময়ে সময়ে পরমহংস-দেবকে কটু কাটব্যও বলিতে আরম্ভ করিলেন। মরি মরি! বিষয়ের কি মহিমা! যে ব্যক্তি এক সময়ে অর্থকে গ্রাহ্য করিতেন না, তাঁহার পরিণাম দেখিলে আতঙ্কে সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠে। হৃদয়ের বিশেষ কষ্ট এবং পরমহংসদেবের প্রতি বিরক্তির কারণ সেই লক্ষ্মীনারায়ণের দশ হাজার টাকা। বাস্তবিক হৃদয়ের মত কেন, অনেকের পক্ষে তাহা সামান্ত প্রলোভন নহে। ফলে হৃদয়ের হৃদয় ক্রমে পরমহংসদেবের প্রতি বীতরাগ হইয়া উঠিল। তিনি সময়ে সময়ে এমন মর্ম্মভেদী কথা বলিয়া পরমহংস-দেবকে বিরক্ত করিতেন যে, সে কথা শুনিলে আপাদমস্তক ক্রোধে পরিপূর্ণ হইত এবং তাহার সমুচিত দণ্ড হওয়া বিধেয় বলিয়া আপনি মনে মনে ঈশ্বরের কাছে কামনা হইয়া যাইত। এক এক দিন পরমহংসদেব বালকের ন্যায় কত কাঁদিতেন, কৃতাঞ্জলী বদ্ধ হইয়া হৃদয়কে কত অনুনয় করিতেন, কিন্তু তিনি সে কথায় আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেন।

সাধন অপেক্ষা অনুকরণ করা সহজ। হৃদয় মহাপুরুষের সেবা হইয়া তাঁহার সদ্‌গুণ লাভ করিবার প্রয়াস না পাইয়া হাব ভাব অনুকরণ করিতে লাগিলেন এবং সেই প্রকারে লোকের নিকটে নৃত্য গীত করিয়া আপনাকে দ্বিতীয় পরমহংস করিয়া তুলিলেন। হৃদয়ের এতদূর স্পর্দ্ধা ও অবনতী হইয়াছিল যে, সময়ে সময়ে তাঁহার ভক্তদিগের সমক্ষে পরমহংসদেবকে ভ্রূকুটি করিয়া কথা কহিতেন। এক দিন পরমহংসদেব রামপ্রসাদের একটী গান গাহিতে ছিলেন। তিনি যেমন এই কয়েকটী চরণ—"ওমা কাঁদ্‌চে কে তোর ধন বিহনে, রত্ন আদি ধন দিবি মা, পড়ে রবে ঘরের কোণে"— হৃদয় ঠাকুর রোষাবেশে বিদ্রূপচ্ছলে এবং বিকৃত স্বরে, ও কে কাঁদ্‌চে তোর ধন বিহনে—যদি কাঁদিতেছ না, তবে রাসমণির দেবালয়ে কেন? এ সকল কথা পাঠ করিয়া পাঠকপাঠিকার বিরক্তি বোধ হইবে। তাঁহাদের প্রাণে

নিদারুণ আঘাত লাগিবে এবং আমাদের এই কথা গুলি লিখিতে যে কি ক্লেশ হইতেছে, তাহা আর বলিব কি ? মধ্যে মধ্যে আমাদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া যাইতেছে, কিন্তু কি করিব, উপায়ান্তর নাই। পরমহংসদেব কি বলিবেন, কিঞ্চিৎ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; আর কিছুই বলিলেন না। হৃদয় ঠাকুর এইরূপে সর্ব্ব বিধায় বিঘ্নকারী হইয়া দাঁড়াইলেন। হৃদয় ঠাকুর যেমন বলিবেন, তাঁহার যে প্রকার অভিপ্রায় হইবে, পরমহংসদেবকে সেই প্রকারে পরিচালিত হইতে হইবে। কথা না থাকিলেই ব্রাহ্মণের আর ক্রোধের সীমা থাকিত না।

একদা পরমহংসদেব জ্বরগ্রস্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন, কোন ভক্ত একটী ফুলকপি লইয়া তাঁহার সম্মুখে সংস্থাপন করিয়া দিল। পরমহংসদেব আহ্লাদে উঠিয়া বসিলেন এবং কপিটীর কতই প্রশংসা করিলেন। অবশেষে বলিলেন যে, দেখ তোমরা ঐ ঘরের ভিতরে ইহা লুকাইয়া রাখিয়া আইস। দেখ হৃদয়কে বলো না যে আমি ইহা দেখিয়াছি, তাহা হইলে আমায় বড় গালাগালি দিবে। আজ্ঞা মাত্র কপিটী স্থানান্তর করা হইল। পরমহংসদেব কহিতে লাগিলেন, দেখ হৃদে, আমায় যে সেবা করিয়াছে, তাহা আমি কখনই ভুলিব না। হয় ত মা কালীর ইচ্ছা, সে না থাকিলে আমার দেহ থাকিত না। আমি যখন পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতাম, হৃদে আমার পশ্চাৎ যাইয়া ভয় দেখাইবার জন্য ইট্ মারিত। কিয়ৎকাল পরে আপনি চলিয়া আসিত। একদিন সে সাহসে ভর করিয়া পঞ্চবটীর মধ্যে প্রবেশ করে। সিদ্ধভূমি পঞ্চবটী, তথায় যাইবামাত্র আমি বলিলাম, কেও হৃদে? হৃদে বলিল, মামা তুমি একলা বসিয়া কি করিতেছ? আমি তাহাকে তথায় বসিয়া ধ্যান করিতে বলিলাম। হৃদে উপবেশন করিবামাত্র 'মামা গো আমার পিটে কে আগুণ ঢালিয়া দিল' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি তাহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া ভয় নাই বলায় সে চুপ করিল। সেই মুহূর্ত্ত হইতে কেমন মা কালীর ইচ্ছা হৃদয়ের ভাবান্তর হইয়া গেল। যেন পাঁচ বোতল মদের নেশা আসিয়া উপস্থিত হইল; আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িল। পরদিন রাত্রে আমি বহির্দ্দেশে গিয়াছি, হৃদে আমার পশ্চাৎ চলিয়া আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, 'ওরে রামকৃষ্ণ তুইও যে আমিও সে, তোতে আমাতে প্রভেদ কি ? চল্ আমরা আর এখানে থাকিব না ?' আমি তাড়াতাড়ি উহার নিকটে

আসিয়া বলিলাম, চুপ্ চুপ্ এখনি সকলে জানিতে পারিবে। আমাদের এখানে থাকা ভার হইবে। ওরে, আমরা কি হইয়াছি! চুপ্ কর। হৃদে কিছুতেই শুনিল না। উত্তরোত্তর চীৎকার বাড়াইল। আমি তখন উপায় না দেখিয়া তাহাকে বলিলাম, এক কণা শক্তি ধারণা করিতে পারিলি না, তবে আর কি হইবে, জড়বৎ হইয়া যা। অমনি ভূমিতে পতিত হইয়া বলিল, 'মামা কি সর্ব্বনাশ করিলে, আমি আর অমন করিব না'। সেই পর্য্যন্ত হৃদয় ঠাকুর বাস্তবিক জড়বৎই রহিয়াছেন। তিনি কহিতে লাগিলেন, হৃদে যেমন আমার সেবা করিয়াছে, মা কালী উহার আশাতীত ফলও দিয়াছেন। দেশে বিলক্ষণ জমি জমা করিয়াছে। লোককে টাকা ধার দেয়, এই মন্দিরে কর্ত্তার ন্যায় হইয়া রহিয়াছে এবং এত লোক উহাকে সম্মান করিয়া থাকে। এই কথা বলিতে বলিতে হৃদয় ঠাকুর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হৃদয় ঠাকুর আসিবামাত্র পরমহংসদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ্ আমি এদের কপি আনিতে বলি নাই, ওরা আপনারা আনিয়াছে, মাইরি বল্‌ছি আমি ওদের কিছুই বলি নাই। হৃদয় ঠাকুর এই কথা শুনিয়া তিরস্কারের অবধি রাখিলেন না। তাঁহার সেই মূর্ত্তি মনে হইলে এখনও আমাদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। পরমহংসদেব সরোদনে মা কালীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, মা! তুই আমার সংসার বন্ধন কাটিয়া দিলি? পিতা গেল, মাতা গেল, ভাই গেল, স্ত্রী গেল, জাতি গেল—শেষে কি না হৃদের হাতে আমার এই দুর্গতি হইতে লাগিল? এই কথা বলিয়াই পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, ও আমায় বড় ভালবাসে, ভালবাসে বলিয়াই বকে, ছেলে মানুষ, ওর বোধ হয় নাই। ওর কথায় কি রাগ কর্ত্তে হয়, মা! এইরূপ বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। হৃদয় ঠাকুরের কিন্তু ক্রোধ শান্ত হইল না।

পরমহংসদেব ক্রমেই হৃদয়ের অত্যাচারে নিতান্তই কাতর হইয়া উঠিলেন। হৃদয় ঠাকুর তখন সকলেরই মর্য্যাদা হানি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর বাটীর প্রত্যেক কর্ম্মচারী তাঁহার দ্বারা উৎপীড়িত ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। পরমহংসদেব বার বার নিষেধ করিলেন, নিষেধ বাক্য না শুনিয়া গর্ব্বিতভাবে বলিলেন "রাসমণির অন্ন ব্যতীত তোমার গতি নাই। তুমি সকলকে ভয় করিবে, আমি কাহাকে গ্রাহ্য করি? না হয় চলিয়া যাইব।" গরিব ব্রাহ্মণ, সাধুর কৃপায় পাঁচ জনের পূজনীয়

হইয়া সম্মানের সহিত রহিয়াছিলেন, তাহা অদৃষ্ট বশতঃ জ্ঞান হইল না, তাঁহার আসন্নকাল সন্নিহিত হইয়া আসিল।

কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার বাৎসরিক উৎসবের দিন সমাগত হইল। সেই দিনে তথায় অপেক্ষাকৃত কিছু ধূমধাম হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত ত্রৈলোক্য বাবু সপরিবারে তথায় আগমন করিয়াছিলেন। উৎসবের দিন প্রাতঃকালে হৃদয় ঠাকুর পূজা করিতে যাইলেন এবং তথায় ত্রৈলোক্য বাবুর একটী দশমবর্ষীয়া বিবাহিতা কন্যা পট্টবস্ত্রাদি পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। হৃদয় সেই বালিকাটীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন। ইতি পূর্ব্বে পরমহংসদেব ঐ প্রকার পূজাদি করিতেন। হৃদয় তাহা অনুকরণ করিতে যাইয়া নিজ কাল আহ্বান করিয়া আনিলেন। কন্যার পায়ে চন্দনের চিহ্ন দেখিয়া তাহার মাতা জিজ্ঞাসা করায়, হৃদয় ঠাকুরের কাণ্ডকারখানা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ত্রৈলোক্য বাবুর স্ত্রী, কন্যার অকল্যাণ হইবে ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার রোদনে ত্রৈলোক্য বাবু মাতিয়া উঠিলেন এবং মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় আস্ফালন পূর্ব্বক দ্বারবান্ দ্বারা হৃদয়কে উদ্যান হইতে এক বস্ত্রে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন এবং সেই ক্রোধে পরমহংসদেবকেও নাকি চলিয়া যাইবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। দ্বারবান্ এ সংবাদ আনিয়া পরমহংসদেবের সমীপে উপস্থিত হইল। পরমহংসদেব হাসিয়া বলিলেন, তোমার বাবুর আমি কি করিলাম? বলিয়া তদবস্থায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া এক মনে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। পরমহংসদেব যখন বাবুদিগের বৈঠকখানার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন কে জানে, কি নিমিত্ত ত্রৈলোক্য বাবু "আপনি কোথায় যাইতেছেন" বলায় পরমহংসদেব অমনি ফিরিলেন এবং তাঁহাদের নিকটে যাইয়া বসিলেন। ত্রৈলোক্য বাবু হৃদয়ের সম্বন্ধে নানা কথা কহিলেন এবং কন্যাটীর অকল্যাণের আশঙ্কায় ভীত হইলেন। পরমহংসদেব অভয় দিয়া পুনরায় নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

হৃদয় ঠাকুর যদু মল্লিকের উদ্যানে বাস করিয়া রহিলেন। পরমহংসদেব দুই বেলা তাঁহার নিজ অংশ হইতে অন্নব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি পাঠাইয়া দিতেন এবং তিনি নিজে তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। হৃদয় ঠাকুর, এই সময়ে পরমহংসদেবকে মন্দির হইতে চলিয়া আসিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন ও নানাবিধ যুক্তি দিয়া বলিয়াছিলেন যে, কোন স্থানে

লাইয়া একটী কালী মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক উভয়ে সুখে বাস করিবেন। পরমহংসদেব এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুই কি আমায় লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরি করিয়া বেড়াইবি?"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব কখন কাহার কর্ণে মন্ত্র দিয়া গুরুগিরি করিতেন না। উপদেশ দিতেন, ঈশ্বর লাভের সুলভ পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন, কিন্তু কাহারও গুরু হইতেন না; এমন কি, গুরু শব্দটী তাঁহার সম্মুখে কেহ বলিতে সাহস করিত না। গুরু বলিলে তিনি বলিতেন, "কে কাহার গুরু, এক ঈশ্বরই সকলের গুরু। চাঁদা মামা আমারও মামা, তোমারও মামা।" এই নিমিত্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ কাহারও সহিত তাঁহার ছিল না। তাঁহাকে গুরু বলা নিজ নিজ ইচ্ছার কথা। ইহার দ্বারা এই প্রকাশ পাইতেছে, জোর করিয়া কিম্বা বুজরুকী দেখাইয়া দলবদ্ধ করিবার তাঁহার চেষ্টা ছিল না। যাহারা আপন মনের টানে তাঁহার প্রতি পারলৌকিক শুভাশুভ নির্ভর করিত, তাহাদের জন্য তিনি বড়ই ব্যাকুলিত থাকিতেন। বস্তুতঃ গুরুকরণ যাহাকে বলে, তাহাই হইত। এরূপ গুরুকরণে শিষ্যেরই উপকার, গুরুর কিছুই লভ্য নাই। যে ব্যক্তি মন্ত্র লইবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিত, তাহাদের কুলগুরুর নিকট সে কার্য্য সাধন করিয়া লইতে বলিতেন। অনেকে গুরুর চরিত্র দোষ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অজ্ঞতা দেখাইয়া নিজের রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি করিয়াছে, কিন্তু তিনি তাহা শুনিতেন না। তিনি বলিতেন—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ী বাড়ী যায়,
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

গুরু যেমনই হউন না কেন, তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি? যে স্থানেই কাঞ্চন পতিত থাকুক না কেন, তাহার ধর্ম্মের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। গুরু যে ধন দিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার নহে, কিন্তু সেই ধন লইয়া শিষ্যের কার্য্য, স্থানাস্থান বিচারের প্রয়োজন কিছুই নাই। যেমন কাহার

মাতা বেশ্যাই হউক, কিম্বা সতীই হউক, সন্তান কি তাহাকে মাতা বলিবে না? এই রূপ উপদেশ দিয়া যাহার মন পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন, সে চলিয়া যাইত, কিন্তু যে তাহা শুনিত না, যে মনে মনে তাঁহাকে গুরুর স্থানে বসাইয়া লইতেন, তাহার সহিত অধিক বাক্য ব্যয় করিতেন না, কালীর ইচ্ছা যাহা তাহাই হইবে বলিয়া নিরস্ত হইতেন। যাহারা জপ তপ কিম্বা সাধন ভজন করিতে অসমর্থ জ্ঞানে তাঁহার চরণ প্রান্তে পড়িয়া থাকিত, তাহাদের জন্য তিনি নিজে দায়ী হইতেন। তিনি সেই সকল ব্যক্তিকে আম্‌মোক্তার নামা বা বকল্‌মা দিতে কহিতেন। এই শ্রেণীর মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় পরমহংসদেব কর্তৃক মন্ত্র পাইয়াছে। কোন কোন ব্যক্তিকে 'তোমায় পরিত্রাণ করিলাম' বলিয়া অভয় দিয়াছেন। মোট কথায় যে যাহা চাহিয়াছে, তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। এই নিমিত্ত পরমহংসদেবের ভাব সহজে কেহ অনুভব করিতে সক্ষম নহে। তিনি এক জনকে চির সন্ন্যাসী করিয়াছেন, আর এক জনকে অর্দ্ধেক সন্ন্যাসী এবং অপরকে গৃহস্থ-সন্ন্যাসী করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার মর্ম্ম কাহার মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইবে এবং কেমন করিয়া তাহা মীমাংসা করা যাইবে?

পরমহংসদেবকে এক স্থানে আমরা পতিতপাবন দয়াময় বলিয়া ফেলিয়াছি। কথাটী নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। আমরা যে অন্ধ হইয়া সে কথা উল্লেখ করিয়াছি, অথবা তাঁহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে অসঙ্গত ও অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়াছি, তাহা নহে। অমানুষী কার্য্য দেখিয়া আমরা তাঁহাকে পতিতপাবন বলিতে বাধ্য হইয়াছি। আমরা যখন পরমহংসদেবের নিকট গমন করি, তখন আমাদের মনোভাব বাস্তবিক স্বতন্ত্র প্রকার ছিল। সে সময়ে আমরা সংসারের বিভীষিকায় নিতান্ত আকুলিত হইয়া কোথায় তত্ত্বজ্ঞান পাইব, কে তত্ত্বকথা শ্রবণ করাইবে এবং কেমন করিয়া শান্তি লাভ করিব এই মর্ম্মে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। ধার্ম্মিক কিম্বা সাধু হইব, তাহা একেবারেই উদ্দেশ্য ছিল না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমরা নিতান্ত নিরীশ্বরবাদী ছিলাম। কামিনী-কাঞ্চনের দাসানুদাস তস্য দাস বলিলেও আমাদের প্রকৃত অবস্থা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। কামিনীর দাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য। কামিনীতে এ প্রকার সিদ্ধ হইয়াছিলাম যে, উহার ভাব উপলব্ধি করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইত না। চক্ষু এবং কর্ণ উভয়ে সর্ব্বদা প্রস্তুত ও সচকিত থাকিত। পথে

ভ্রমণ কালেই হউক, শকটারোহণে গমন সময়েই হউক, গঙ্গাস্নান কালেই হউক, কোন তীর্থ যাত্রাদি দর্শন করিতে যাইয়াই হউক কিম্বা কার্য্যোপলক্ষে পাঁচ বাড়ীর অন্তঃপুর মহিলা আপন বাটীতে আনয়ন করিয়াই হউক, কামিনীর রূপ দর্শন এবং মনন না করিয়া যে আমরা ক্ষান্ত হইতাম তাহা নহে। সর্ব্বদা সকল বিষয়ের সুবিধা হয় না এবং হইবার নহে; সুতরাং মনোভাব কার্য্যে পরিণত করিতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই। সেই জন্য লোকের নিকট বাহ্যিক নির্দ্দোষী বলিয়া পরিচিত হইলেও আমরা তাহা ছিলাম না। বাস্তবিক শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমরা নর-পিশাচ শ্রেণীর সভ্য ছিলাম, তাহার সন্দেহ নাই। দয়ার অবতার পরমহংসদেব, আমাদের দেখিয়া ক্রোড়ে করিয়া লইলেন। আমরা জানিতাম যে, আমরা পরীক্ষা দিতে আসি নাই, সে শক্তি আমাদের নাই। আমাদের মনের কথা ও কার্য্যকলাপ স্বীকার করিতে বলিলে আমরা তাহা পারিব না, সে শক্তি নাই, সেরূপ মানসিক বলও নাই, কেমন করিয়া প্রকাশ করিব। মনে মনে প্রার্থনা ছিল যে, ঠাকুর আপনি অন্তর্যামী, মনের সকল কথাই জানিতে পারেন, তবে কেন আর লোকের নিকটে আমাদের অপদস্থ করিবেন। আপনাকে ভয় নাই, লজ্জা নাই, কিন্তু লোককে ভয় ও লজ্জা করি। তিনি দয়া পরবশে সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু তথাপি মনের আসক্তি একেবারে দূর হইল না। চিরকাল যাহাকে আদর করিয়া যত্নপূর্ব্বক আশ্রয় দিয়াছি, সে কেমন করিয়া এক কথায় বিদায় হইবে, যাইয়াও যাইতে চাহে না। যদিও তখন তাঁহার বলে, যে কামিনীদিগকে স্ত্রীর স্থানে বসাইতে লালায়িত হইতাম, তাহাদের এক্ষণে প্রভুপ্রসাদে অকপটে মাতৃস্থানে সংস্থাপন পূর্ব্বক মাতৃ সম্বোধন করিতে সামর্থ্য লাভ করিলাম। কিন্তু পাজী মন এখনও সুবিধা পাইলে পলাইতে চেষ্টা করিত। এক দিন কোন স্ত্রীলোককে দেখিয়া, মন পূর্ব্ব পশুভাবে ছুটিল, কিন্তু সকল বন্ধন ছিঁড়িতে পারিল না; সুতরাং কিয়দ্দূর যাইয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিল। সেই দিনের ঘটনায় আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইয়া পরমহংসদেবের নিকট যাইয়া আত্মদৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলাম। অভয়দাতা পরমহংসদেব, ঈষৎ হাঁসিয়া কহিলেন, সে জন্য চিন্তা নাই। যে বিষয়ে মনের দৃঢ় সংস্কার হয় তাহা প্রায় যায় না। একদা আমি বর্দ্ধমানের পথে গো-যানে গমন কালীন পথিমধ্যে একটী সরাইতে বিশ্রাম করিতেছিলাম। একটী বলদের উপর আর

একটীকে উঠিতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম, ইহারা দাম্‌ড়া তথাপি এ প্রকার ভাব কেন? পরে বুঝিলাম যে, সহবাস রসাস্বাদন হইবার পর উহাদের "বাঁদ" হইয়াছিল। সেইজন্য পূর্ব্বসংস্কার অদ্যাপি বিস্মৃত হয় নাই। তোমাদের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। এখনও যে আমরা সাধু হইয়াছি তাহা নহে, তবে প্রভুর শক্তিতে হস্ত পদ আবদ্ধ আছে, কিছু করিয়া উঠিতে পারি নাই; উড়িতে না পারিলে পোষ মানে। কাঞ্চনের দাস হইয়া আমরা যে ভাবে দিন যাপন করিতেছিলাম, তাহারও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অর্থকে পৃথিবীর সারাৎসার পদার্থ বলিয়া আমাদের ধারণা ছিল। অদ্যাপি কি সে সংস্কার গিয়াছে? তাহা কে বলিতে পারে। ধনোপার্জ্জনের জন্য স্বাভাবিক পন্থা ব্যতীত যে কোন রূপে অর্থাৎ বলে, কলে, কৌশলে দুইটা পয়সা গৃহে আনিতে পারা যায়, এই আমাদের একমাত্র জ্ঞান ছিল। মিথ্যাকথা জুয়াচুরী বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি যে কোন ভাবে অর্থোপার্জ্জন পক্ষে সহায়তা হয়, তাহার অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা করিয়া দেখিবার কোন কারণ ছিল না। ফলে যে সকল প্রক্রিয়াকে ভদ্রলোকেরা ঘৃণা করেন, সে সকল কার্য্যকে আমরা মন্দ বলিয়া বাস্তবিক একদিনও মনে করিতাম না। তবে উল্লিখিত কামিনীর ভাবের ন্যায় রাজদণ্ডের ভয়েই হউক, কিম্বা সুবিধা করিতে পারি নাই বলিয়াই হউক, মনের সাধ পূরিয়া কার্য্য করিতে পারি নাই। স্বার্থপরতা সম্বন্ধীয় একটী দৃষ্টান্ত এস্থানে না উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইতে পারিতেছি না। পরমহংসদেবকে নানাস্থানে গমন করিতে দেখিয়া মনে হইত যে, কবে দয়া করিয়া আমাদের বাটীতে চরণ ধূলি দিয়া পবিত্র করিবেন। কাল ক্রমে একদিন মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। তিনি অস্বীকার করিলেন। মনে তখন ভক্ত বলিয়া বিলক্ষণ অভিমান হইয়াছে, আপনার অবস্থা তখন ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছি, পরমহংসদেবের চেলা বলিয়া পরিচয় দিতে শিখিয়াছি, আর পায় কে? পরমহংসদেবের কথায় মনে বড়ই ব্যথা পাইলাম। কি বলিব কোন উপায় ছিল না। একদিন সহসা তিনি আমাদের বলিলেন, কবে তোমাদের বাটীতে যাইব? আমরা আকাশ থেকে পড়িলাম। কি বলিব, ভাবিয়া বলিলাম, যে দিন আপনার ইচ্ছা? তিনি দিন স্থির করিয়া দিলেন। পরমহংসদেব যদিও আমাদের বাটীতে আসিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, আমরা

মৌখিক আনন্দের ভাব দেখাইয়া অন্তরে অন্তরে যার পর নাই বিরক্ত হইতে থাকিলাম। এ প্রকার বিরক্তির কারণ অর্থ ব্যয়। কেবল এলে গেলে কাহারও ক্ষতি হয়না। তিনি যথায় যাইতেন, তথায় ১৫০।২০০ ভক্ত একত্রিত হইতেন। তাহাদের সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইতে হইলে দশ টাকা ব্যয় হইবার সম্ভবনা। আমরা বিষয়ী এ প্রকার ব্যয় করিতে, সত্য কথা বলিতে হইলে, বাস্তবিক আমাদের ক্লেশ-কর হইত। একদিন, যাঁহার চরণ ধূলি বাটীতে পড়িলনা বলিয়া লোকের নিকট কত আড়ম্বরই করিয়াছিলাম, সে দিন গুরুভক্তির পরা-কাষ্ঠা দেখাইয়া ছিলাম, কিন্তু অদ্য সেই ব্যক্তির কতদূর নীচ প্রকৃতি, তাহা সকলে দেখুন! এইরূপ ভক্তিতে আমরা ঈশ্বর লাভ করিব? এইরূপ হৃদয় লইয়া আমরা কোন্ সাহসে যে ভগবানের নিকট অগ্রসর হই, তাহা মনে হইলেও সময়ে সময়ে আপনার গালে আপনি করাঘাত করিলেও যথেষ্ট শাস্তি হয় না, বলিয়া মনে হয়।

তাই বলি আমাদের গুণে পরমহংসদেবকে পাই নাই, সে গুণ তাঁহারই; আমরা যাহা মনে করি, তাহা কি ঠাকুর কখন করিতে দেন? আমরা ইচ্ছা করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে বিষ পান করিতে চাই, তিনি যে তাহা কাড়িয়া লইয়া অমৃত প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা কি অমৃত চাই? কখন নহে। তাঁহাকে আমাদের বাটীতে কদাচ আনা হইবে না, বলিয়া স্থির নিশ্চয় হইল, কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না। জোর করিয়া, আমাদের নিতান্ত আন্তরিক অনিচ্ছা ক্রমে (মুখে অবশ্যই স্বীকার করিয়াছিলাম) তিনি সেই দিবসে সমুদয় ভক্ত লইয়া আসিলেন এবং আনন্দ করিয়া যাইলেন। আমরা কিন্তু খুসি হইয়াও নিজের অর্থ ব্যয় জনিত অন্যের ন্যায় প্রাণটা ভরিয়া আনন্দ করিয়া লইতে পারি-লাম না। চিকিৎসকেরা যেমন অপরের হাত পা কাটিয়া আনন্দসম্ভোগ করেন, সেইরূপ অপরের ব্যয়ে উদর পূরিয়া প্রসাদ পাইয়া সংকীর্ত্তন করিলে যে পরিমাণে লাভ হইল বলিয়া আনন্দ হয়, সে প্রকার কি নিজ ব্যয়ে হইবার সম্ভাবনা! এক ব্যক্তি বেশ্যার জন্য ফুলের মালা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহার অমনোযোগীতা বশতঃ এক ছড়া মালা পথে পড়িয়া কাদা লাগিয়া গেল। সে মনে করিল কাদালাগা ফুল সে লইবে না, তবে কি করি? ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে মনে স্থির করিল যে, ঈশ্বর ত সর্ব্বব্যাপী,

এস্থানেও তিনি আছেন; এ মালা তাঁহার গাত্রেই দেওয়া হইয়াছে। আমরা অবশেষে মনে মনে ঐ প্রকার মীমাংসা করিয়া অর্থ ব্যয়ের কষ্ট নিবারণ করিয়া লইলাম।

কিন্তু দয়াময় ঈশ্বরের কি মহিমা! কাহাকে, তিনি কোন্ পথে, কি ভাবে, কেমন করিয়া কৃতার্থ করেন তাহা জীব-বুদ্ধি কেমন করিয়া বুঝিবে, অথবা ধারণা করিতে সমর্থ হইবে! আমরা যে ভাবে পরমহংসদেবের পূজা করিলাম, তাহা সকলে অবগত হইয়াছেন, ইহার ফল কি হইতে পারে? কপটীর পুরস্কার কি হয়? স্বার্থপরের পরিণাম কাহাকে বলে? তাহা বেদ বিধি ছাড়া, কেহ খুঁজিয়া পাইবেন না অথবা কেহ অনুমান করিতেও পারিবেন না।

ইতিপূর্ব্বে তাঁহার উপদেশে আমরা আস্তিক হইয়াছিলাম। উপদেশ অর্থে কেবল মুখের কথা নির্দ্দেশ করিতেছি না। উপদেশ বলিলে আমরা যাহা সচরাচর বুঝিয়া থাকি অর্থাৎ কতকগুলি বাক্যের কৌশল, এ উপদেশ সেরূপ নহে। আমরা যখন তাঁহাকে ঈশ্বর আছেন কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, দিনের বেলায় সূর্য্যের কিরণে একটীও তারা দেখা যায় না, সেই জন্য তারা নাই একথা বলা যায় না। দুগ্ধে মাখম আছে, দুগ্ধ দেখিলে কি মাখমের কোন জ্ঞান জন্মে? মাখম দেখিতে হইলে দুগ্ধকে দধি করিতে হয়, পরে উহা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মন্থন করিলে, (ইচ্ছামত সময়ে হইবে না,) মাখম বাহির হইয়া থাকে। যেমন বড় পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে হইলে অগ্রে যাহারা তাহাতে মাছ ধরিয়াছে, তাহাদের নিকটে কেমন মাছ আছে, কিসের টোপে খায়, কি চার প্রয়োজন, এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যে ব্যক্তি মাছ ধরিতে যায়, সে ব্যক্তি নিশ্চয় সিদ্ধ মনোরথ হইয়া থাকে। ছিপ ফেলিবামাত্র মাছ ধরা যায় না, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। পরে সে 'ঘাই ও ফুট' দেখিতে পায়। তখন তাহার মনে মাছ আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় এবং ক্রমে মাছ গাঁথিয়া ফেলে। ঈশর সম্বন্ধেও সেই প্রকার। সাধুর কথায় বিশ্বাস, মন ছিপে, প্রাণ কাঁটায়, নাম টোপে, ভক্তি চার ফেলিয়া অপেক্ষা করিতে হয়, তবে ঈশ্বরের ভাব রূপ 'ঘাই ও ফুট' দেখিতে পাওয়া যাইবে। পরে একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। আমরা ঈশ্বরই মানিতাম না, তাঁহার রূপ দেখা যাইবে একথা কে বিশ্বাস করিবে? আমাদের এই ধারণা ছিল

যে, ঈশ্বর নাই, যদি থাকেন আমাদের ব্রাহ্ম পণ্ডিতদিগের মতে তাহা নিরাকার, ব্রাহ্ম সমাজে বেড়াইয়া তাহা শুনিয়া রাখিয়াছি। বিশ্বাস হইবে কি রূপে? পরমহংসদেব আমাদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ বিষয়। যাঁহার মায়া এত সুন্দর ও মধুর, তিনি কি অপ্রত্যক্ষ হইতে পারেন? দেখিতে পাইবে। আমরা কহিলাম, সব সত্য, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহার বিরুদ্ধ কে কথা কহিতে পারিবে? কিন্তু, এই জন্মে কি তাঁহাকে পাওয়া যাইবে? তিনি বলিলেন, যেমন ভাব তেমন লাভ মূল কেবল প্রত্যয়,—বলিয়া, একটী গীত বলিলেন,

"ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
যেমন ভাব তেমন লাভ মূল সে প্রত্যয়।
কালী পদে সুধা হ্রদ, চিত্র ডুবে রয়।
(যদি চিত্র ডুবে রয়)
তবে, জপ যজ্ঞ পূজা বলি কিছুরই কিছু নয়।"

যে দিকে যত পা যাওয়া যায়, বিপরীত দিক্ তত পশ্চাৎ হইয়া পড়িবে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে দশহাত গমন করিলে পশ্চিম দিকের দশহাত পশ্চাৎ হইবেই হইবে। আমরা তথাপি বলিলাম যে, ঈশ্বর আছেন বলিয়া প্রত্যক্ষ কিছু না দেখিলে দুর্ব্বল অবিশ্বাসী মন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। পরমহংসদেব বলিলেন, সান্নিপাতিক রোগী এক পুকুর জল পান করিতে চায়, এক হাঁড়ী ভাত খাইতে চায়, কবিরাজ কি সে কথায় কখন কাণ দেন? আজ জ্বর হইয়াছে কাল কুইনাইন দিলে কি জ্বর বন্ধ হয়? না ডাক্তার রোগীর কথায় তাহা ব্যবস্থা করিতে পারেন? জ্বর পরিপাক পাইলে ডাক্তার আপনি কুইনাইন দিয়া থাকেন, রোগীকে আর কিছু বলিতে হয় না। আমাদের ব্যস্তচিত্ত কিছুতেই স্থির হইল না।

দিন কত পরে আমাদের মনে নিতান্ত ব্যাকুলতা আসিল। সেই সময়ে একদিন রজনী অবসান কালে স্বপনে দেখিলাম যে, পূর্ব্ব পরিচিত এক সরোবরে আমরা স্নান করিয়া উঠিলাম, পরমহংসদেব নিকটে আসিয়া একটী মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, প্রত্যহ স্নানের পর আর্দ্র বস্ত্রে একশত বার জপ করিবে। নিদ্রা ভঙ্গের পর আনন্দে শিহরিয়া উঠিলাম এবং তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে যাইয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলাম। এই কথা শুনিয়া পরমহংসদেব অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং নানাবিধ

উপদেশ দিয়া স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। আমরা এমনি জন্ম অবিশ্বাসী, ইহাতেও বিশ্বাস হইলনা। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল কি একদিনে যাইবে? স্বপ্ন মস্তিষ্কের বিকার, উদর উষ্ণ হইলে এবং মনে এক বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিলে তাহা স্বপ্নে দেখা যায়, একথা ইংরাজী বিদ্যা বিশারদ জ্ঞানী প্রবরেরা বলিয়াছেন, তাহা পরমহংসদেবের কথায় কি দূর হইতে পারে? কি করিব চুপ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

তদনন্তর দিন দিন অশান্তি আসিয়া আমাদের অধিকার করিল। পূর্ব্বে কোন দিন কোন সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে তাহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া, দুশো-মজা সম্ভোগ করিয়া লইতাম, এখন আর সে ভাব আইসেনা। অশান্তি দূর করিবার নিমিত্ত সুন্দরীর ছবি হৃদয় মাঝে আনিতে চেষ্টা করি, কিন্তু তাহা আর স্থান পায় না। যে বিষয়ের অনুরোধে এক দিন প্রভুর আসাও উপেক্ষা করিয়াছিলাম,তাহার সংস্পর্শে বরং অশান্তি দ্বিগুণ হইয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইত যেন এ পৃথিবীতে আমাদের জন্য বায়ু শূন্য হইয়াছে। বক্ষঃস্থলের ভিতর থেকে থেকে যেন কেমন এক প্রকার ক্লেশকর ভাব অনুভব করিতাম। তখন আপনা আপনি আক্ষেপ করিয়া কহিতাম, কি কুক্ষণেই যে পরমহংসদেবের কাছে আমরা গিয়াছিলাম, কেন যে আমাদের এ দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল। তখন কি কেহ বন্ধু ছিল না, যাহারা এই অশান্তির রাজ্য হইতে আমাদের প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিত? এখন উপায় কি? ঈশ্বর আছেন কি না তাহা স্থির হইল না। কথায় কে বিশ্বাস করে? যদি এমন আভাষ পাওয়া যায় যে ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন, তাহা হইলে চুপ করিয়া থাকিতে পারি। জ্ঞান-বিচারে ঈশ্বর নিরূপণ করা পাগলের কথা। কেবল জ্ঞানে ঈশ্বর আছেন বলাও যাহা, আর ঈশ্বর নাই বলিয়া মনে দৃঢ় ধারণা করিয়া রাখাও তদ্রূপ। এই প্রকার অবস্থায় আমরা কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিলাম। এক দিন বেলা ১১ টার সময় পটলডাঙ্গার গোলদিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আমরা দুই জনে আমাদের মনোদুঃখ বলাবলি করিতেছিলাম, এমন সময়ে একটী শ্যামকায় ব্যক্তি ঈষৎ হাস্য করিয়া নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, “ব্যস্ত হ’চ্চ কেন, স’য়ে থাক।” আমরা চমকিয়া উঠিলাম। কে আমাদের প্রাণের কথা বুঝিয়া অশান্তিরূপ প্রজ্বলিত হুতাশনে “ব্যস্ত হ’চ্চ কেন স’য়ে থাক” রূপ আশা বারি ঢালিয়া দিলেন? কে আমাদের

অন্তররাজ্যে প্রবেশ করিয়া অন্তরের কণ্টক-বৃক্ষ ছেদন করিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন? এই কি ঈশ্বরের "ফুট্" "ঘাই" কি এ? তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দেখি, আর তিনি নাই। কোন্ দিকে যাইলেন দেখিতে পাইলাম না। আমরা দুই জনে পাতি পাতি করিয়া দেখিলাম তাঁহাকে আর দেখা গেল না। আরও সন্দেহ বাড়িল, আরও আনন্দ উথলিয়া উঠিল। কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, এ যে অমৃতবৎ-প্রাণ-সংরক্ষিণী জীবন-সঞ্জীবনী আকাশবাণীবৎ হইয়া গেল। বেলা ১১টা, আমরা দুই জনে সুস্থ দেহে, সুস্থ মনে, দাঁড়াইয়া ছিলাম। চক্ষের দোষ ছিল না, কারণ সকলকে পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতেছিলাম; কাণের বিকৃতাবস্থা হয় নাই, কারণ তাহাতেও পূর্ব্ববৎ শ্রবণ করিতেছিলাম, তবে দেখিলাম কি! শুনিলাম কি! আমরা দুই জনে শুনিলাম, দুই জনে দেখিলাম, দুই জনেরএক সময়ে এক প্রকার দর্শনের এবং এক প্রকার শ্রবণের বিকার জন্মিল! এ প্রকার বিকারকেও ধন্য, এ প্রকার দর্শন ও শ্রবণকেও ধন্য! আমরা দক্ষিণ দিকে বৌবাজার পর্য্যন্ত দেখিলাম, সে দিকে তিনি নাই, পশ্চিমের দিকে কলুটোলা পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল, সে দিকেও তিনি নাই, উত্তরের দিক হইতে ত আসিলেন, পূর্ব্বে যাইতে হইলে আমাদের সম্মুখ দিয়া যাইতে হইবে। তাঁহার অদৃশ্য হওয়ার কোন কারণ নিরূপণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু সেই দিন এই ধারণা হইল যে, ঈশ্বর আছেন। পরমহংসদেবকে এই সংবাদ প্রদান করা হইল, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাস্যে কহিলেন, কত কি দেখিবে?

এতদিনে বাস্তবিক আমাদের শান্তি হইল এবং মনের অন্ধকারপুঞ্জ বিদূরিত হইতেছে বলিয়া বুঝিলাম। আমরা ক্রমে আনন্দের আভাস পাইতে লাগিলাম। সময়ে সময়ে হৃদয় মাঝে কেমন এক প্রকার ভাব হইত, পরে উহা পরিবৃদ্ধি হইয়া এ প্রকার উচ্চ হাস্যের ফোয়ারা ছুটাইত যে, আমরা ক্রমাগত অর্দ্ধ ঘণ্টা হাসিয়া ক্লান্ত হইয়া যাইতাম। কখন এত রোদন করিতাম যে, নয়ন-জলে বস্ত্র ভিজিয়া যাইত। কখন কথায় কথায় হাসি এবং কথায় কথায় কান্না আসিত। এ ক্রন্দন বিরহ জনিত নহে। এই সময়ে আমরা সন্ন্যাসব্রত লইবার জন্য পরমহংসদেবকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, ইচ্ছা করিয়া কিছু হয় না এবং করিতেও নাই। ঈশ্বর কাহাকে কি করিবেন তাহা তিনিই জানেন, বিশেষতঃ পুষ্করিণীতে যেমন মাছের ছানার ঝাঁকের নিম্নস্থিত ধাড়ি মাছটাকে মারিয়া ফেলিলে অন্য মাছ, ছানাগুলিকে খাইয়া ফেলে;

সেই প্রকার তোমাদের সংসার ত্যাগ করাইলে, স্ত্রী পুত্রাদিরা কোথায় যাইবে? ভগবান্ এখন এক প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, আবার তাঁহাকে নূতন ব্যবস্থা করিতে হইবে। সময় হইলে সকল দিক্ সুবিধা হইবে, এ কথা আমরা শিরোধার্য্য জ্ঞান করিলাম। সহজে সংসার ছাড়িবে কে? তখন আমরা আপনাদিগকে উন্নত মনে করিয়া লইয়াছিলাম। তখন আমরা বৈরাগ্যকে সার ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়াছিলাম। অন্য কিছু হউক বা নাই হউক লোকের নিকটে সম্মান পাইবার বিলক্ষণ সুবিধা। বৈরাগী হইয়া আপনার মাথা আপনি কিনিব? কিন্তু লোকে তাহার জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইবে। বিনা শারীরিক ক্লেশে, সুখ সচ্ছন্দে দিন যাপন হইয়া যাইবে। সকলের উপর সহজে একাধিপত্য স্থাপন করিবার বৈরাগী হওয়া ভিন্ন দ্বিতীয় পন্থা নাই। আমরা পুনরায় সন্ন্যাসী হইবার চেষ্টা করিলাম। মনে বড় সাধ হইল যে, লালাবাবুর মত অক্ষয় নামটা রাখিয়া যাই। কিন্তু হইবে কি? পরমহংসদেব কহিলেন, সংসার ছাড়িয়া যাইবে কোথায়! সংসারের সহিত কেল্লার তুলনা দেওয়া হয়। কেল্লার মধ্যে থাকিয়া যেমন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা সহজ, কারণ তথায় রসদ ও গোলাগুলী অধিক পরিমাণে জমা করা থাকে। মাঠে যাইয়া যুদ্ধ করা তেমন নহে, তাহা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চলিতে পারে না। সেই প্রকার সংসারে সাংসারিক কার্য্য চারি আনা এবং অবশিষ্ট বার আনা মনে ঈশ্বর সাধনা করিতে হয়। সংসারে বার আনা বৈরাগ্য জন্মিলে তখন সংসার ছাড়ায় ক্ষতি হয় না। তাহা না করিলে "এক কৌপীনকো আস্তের" ন্যায় হইতে হইবে।

কোন অরণ্যে এক সাধু ছিলেন। তিনি ফল মূল ও কন্দাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কুটীরাদি না থাকায় বৃক্ষের নিম্ন দেশেই অবস্থান করিয়া বর্ষার জল, শীতের হিম এবং গ্রীষ্মের প্রচণ্ড সূর্য্যকর হইতে আপনাকে রক্ষা করিতেন। এই অরণ্যের সন্নিকটে লোকালয় ছিল। সুতরাং তত্ত্ব-জ্ঞান লুব্ধ ব্যক্তিরা সময়ে সময়ে তাঁহার নিকটে আসিয়া ভগবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিষয়াসক্ত চিত্তের কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া যাইতেন। এই সাধুকে মধ্যে মধ্যে জনসমাজে উপস্থিত হইতে হইত বলিয়া লজ্জাবরোধক কৌপীন অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

সাধু প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নদীতে অবগাহন করিয়া শুষ্ক

কৌপীন ধারণ ও আর্দ্র কৌপীন পরিবর্ত্তন করিতেন এবং উহা শুষ্ক করিবার জন্য বৃক্ষের শাখায় রাখিয়া দিতেন।

কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর, সাধু একদা কৌপীন পরিবর্ত্তন কালীন দেখিলেন যে, ইন্দুরে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে। তিনি অগত্যা নূতন কৌপীন পরিধান করিতে বাধ্য হইলেন। সাধু যতই নূতন কৌপীন ব্যবহার করিতে লাগিলেন, ইন্দুর ততই নষ্ট করিতে লাগিল। সাধু ক্রমে কৌপীনের জন্য নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পাঁচ জনকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বিড়াল পোষিবার জন্য পরামর্শ দিল। সাধু তৎক্ষণাৎ গ্রাম হইতে একটী বিড়ালশাবক আনয়ন করিলেন, এবং তদপর দিবস হইতে তাঁহার কৌপীন বিনষ্ট হওয়া স্থগিত হইয়া গেল। সাধুর আনন্দের আর সীমা রহিল না।

বিড়াল স্বভাবত মৎস্যাদি এবং দুগ্ধ ব্যতীত আহার করিতে পারে না। অরণ্যে সাধুর নিকট যাইয়াও সে ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই। সুতরাং সাধুর সহিত ফল মূল ভক্ষণ করিতে পারিত না। আহার ব্যতীত উহা ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিল। সাধু তখন কৃষ্ণের জীব এবং তাঁহার উপকারী জ্ঞানে গ্রাম হইতে বিড়ালের জন্য দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে কোন ব্যক্তি বলিল যে, সাধুজী আপনার প্রত্যহ দুগ্ধের প্রয়োজন দুই এক দিবস ভিক্ষায় চলিতে পারে। বার মাস কে আপনাকে ভিক্ষা দিবে? আপনি একটী গাভী আনয়ন করুন, তাহাতে প্রচুর দুগ্ধ হইবে, আপনি এবং আপনার বিড়াল উভয়েই পরিতৃপ্ত রূপে দুগ্ধ পান করিতে পারিবে। সাধু এই পরামর্শ নিতান্ত অবস্থাসঙ্গত জ্ঞান করিয়া অবিলম্বে তাহাই করিলেন। সাধুকে আর দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে হইল না।

কাল সহকারে সেই গাভীর বৎস হইতে লাগিল এবং উহাদের জন্য বিচালী সংগ্রহ করা ক্রমে প্রয়োজন হইয়া উঠিল। তখন সাধু পুনরায় সকলের পরামর্শে পতিত জমিতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলেন। তদ্দ্বারা ধান, কলাই ও বিচালী অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইতে লাগিল। কৃষি কার্য্যের জন্য কৃষক নিযুক্ত ও তাহাদের জমা খরচ ও ধান্যাদির হিসাবে সদাই নিযুক্ত হইতে হইল। যখন ধান চাল সঞ্চিত হইয়া আসিল, তখন তাহা রক্ষার্থ গোলা বাড়ী ও বিচালী দ্বারা সাধুর নিজের ও ভৃত্য গবাদির

গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া প্রকৃত গৃহস্থের ন্যায় মহাব্যস্ত হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন সাধু আপন গৃহ প্রাঙ্গণে ভৃত্যাদি ও গ্রামবাসীদিগের সহিত অন্যান্য বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার গুরু আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে বিস্মিত হইয়া সাধুর কোন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই স্থানে একটী উদাসীন থাকিতেন, তিনি কোথায় গিয়াছেন বলিতে পার?" গুরু এই কথা বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, হয়ত তাঁহারই ভ্রম হইয়া থাকিবে। তিনি ভুলিয়া অন্য কোন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভৃত্য কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিল না। পরে তিনি ঐ সাধুর বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সম্মুখে তাঁহার শিষ্যকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! এ সকল কি? শিষ্য অপ্রতিভ হইয়া, অমনি গুরুর চরণে প্রণতি পূর্ব্বক বলিলেন প্রভু! "এক কৌপীন কো আস্তে।" এই কথা বলিয়া তাঁহার অবস্থান্তর হইবার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং সেই সকল বিষয়াদি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া গুরুর পশ্চাদ্গামী হইলেন *।

* তাৎপর্য্য।—সাংসারিক ব্যক্তিরা এইরূপে বন্ধনের উপর বন্ধন দ্বারা আপনাকে আপনি অজ্ঞাতসারে আবদ্ধ করিয়া থাকে। আত্মাসংরক্ষক জ্ঞান কৌপীন অজ্ঞান-মূষিক কর্ত্তৃক বিখণ্ডিত হওয়া নিবারণ হেতু যে সকল উপায় অবলম্বনের প্রণালী আছে, তাহাতে আশু উপকার হয় বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা পরিশেষে সমধিক ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। তখন প্রকৃত উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হইয়া বাহ্যিক কার্য্যেরই আড়ম্বর হইয়া পড়ে। যেমন আত্মরক্ষা হেতু বিদ্যা শিক্ষা, স্ত্রী লাভ এবং ধনোপার্জ্জনাদির নানাবিধ বিধি আছে। সংসার ক্ষেত্রে যাহাতে ভ্রমসঙ্কটে পতিত না হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানোপার্জ্জন করা যায়, তাহার জন্য বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু ইহা দ্বারা অহংভাবের এতদূর প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে যে, অভিমানের কার্য্যেই সমস্ত সময়াতিবাহিত হইয়া যায়। চরিত্র রক্ষাই স্ত্রী সহবাসের বিশেষ উদ্দেশ্য কিন্তু তাহাতে সন্তানাদি উৎপন্ন হইয়া নূতন চিন্তার স্রোত খুলিয়া দেয় অর্থাৎ সন্তানের শারীরিক মঙ্গলামঙ্গল কামনা, তাহাদের পরিণয় কার্য্যাদি দ্বারা কুটুম্বাদির সহিত সম্বন্ধ রক্ষা, সন্তানাদির সন্তান হইলে আনন্দে অভিভূত হওয়া ইত্যাদি। শরীর রক্ষার্থ ধনোপার্জ্জন। ধনের দ্বারা যেরূপ অভিমানের প্রাবল্য হইয়া থাকে, সে রূপ আর কিছুতে হইতে পারে না। ধনী ব্যক্তিরা যে প্রকার অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। মনুষ্যেরা এই রূপে আত্ম বিস্মৃত হইয়া কার্য্যের হিল্লোলে

আমরা অগত্যা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। পাঠক পাঠিকাগণ! পরমহংস-দেবের কতদূর অন্তর্দৃষ্টি ছিল, এই বার তাহা বুঝিয়া লইবেন। আমরা সাধু হইয়াছি তাহার পরিচয় দিলাম। কিন্তু এই বার সাধুদিগের পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইল। এ পর্য্যন্ত মনে বিলক্ষণ শান্তি রহিয়াছিল এবং পরমানন্দে দিন কাটাইতে ছিলাম। কি জানি কেন মন একেবারে অশান্তি সাগরে ডুবিয়া বুকের ভিতরটা শূন্য হইয়া পড়িল, এবং মরুভূমি প্রায় বোধ হইল। আমরা ভাবিয়া আর কূল পাইলাম না। পরমহংসদেবের নিকট পুনরায় দুঃখ কাহিনীর দোকান খোলা হইল। তখন তিনি আর এক ভাব দেখাইলেন। তিনি কহিলেন, আমি কি করিব সকলই হরির ইচ্ছা। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে বলিলাম, সে কি মহাশয়, আপনার আশায় এত দিন যাতা-য়াত করিতেছি, এখন এ প্রকার কথা বলিলে, আমরা কোথায় যাইব? তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আমি তোমাদের কিছু "থাইও নি লিইও নি" আমার দোষ কি? ইচ্ছা হয় আসিও, না হয় না আসিও। তোমরা যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী করিয়াছ, তাহা লইয়া যাও *।" এই নিদারুণ কথা তাঁহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আমরা দশদিক্ শূন্যময় বোধ করিলাম। এক বার মনে হইল যে, পৃথিবী তুমি বিদীর্ণ হইয়া আমাদের উদরস্থ করিয়া ফেল। আবার মনে হইল না, নিকটে গঙ্গা আছেন, রজনী যোগে জোয়ারের সময়ে ডুবিয়া মরিব। এই স্থির করিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলাম। তখন মনে হইল মরিব কেন, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। পরমহংসদেব বলিয়াছেন যে, স্বপ্নসিদ্ধ ব্যক্তি সৌভাগ্যবান্। আজ সেই মন্ত্রের বিক্রম পরীক্ষা করিব। শুনিয়াছি, ভগবান্ হইতে তাঁহার নাম বড়। তিনি যত রূপ ধারণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা গিয়াছে ও যাইতেছে, কিন্তু নাম চিরকাল সমভাবে রহিয়াছে ও থাকিবে। এই ভাবিয়া পরমহংসদেবের গৃহের উত্তর দিকের বারাণ্ডায় শয়ন করিয়া রহিলাম এবং

নিয়ত ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। যৎকালে তাহারা একেবারে আত্মহারা হয়, তখন ভগবান্ গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়া থাকেন।

এ স্থানে যদিও ভগবান্ পরিত্রাণ করেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইলে কর্ম্ম ফল জনিত অশেষ দুঃখ ভোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে।

* ভক্তেরা যখন পরমহংসদেবের নিকট থাকিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদের নিমিত্ত সুরেন্দ্র বাবু কিছু দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

মনে মনে সেই মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। অতি গভীর রাত্রে পরমহংসদেব সহসা সেই দিকের দ্বার খুলিয়া আমাদের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং ভক্ত সেবা করিবার আজ্ঞা দিয়া চলিয়া গেলেন। আবার কি বিপদ্! ভক্ত সেবা করিবে কে? তাহাতে অর্থ-ব্যয় আছে। অর্থ-ব্যয় করিয়া ধর্ম্ম করা তখনও সে শক্তি হয় নাই। কিন্তু ইতিপুর্ব্বে আমারা বৈরাগী লালাবাবুর মত হইতে গিয়াছিলাম। অত অনুরাগ, অত আত্মধিক্কার, গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব এসকল ভাব এক কথায় উড়িয়া গেল। ধন্য বৈরাগ্য! ধন্য তোমার লীলা। সে যাহা হউক আমরা ইচ্ছা করিয়া সে সকল কথা ভুলিতে চেষ্টা করিলাম, ফলে ভুলিয়া যাইলাম। দিনকতক পরে বৈশাখি পূর্ণিমার দিন পরমহংসদেব পূর্ব্বের ন্যায় আপন ইচ্ছায় আমাদের বাটীতে আসিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কি করিব চিন্তা করিয়া অন্য ভক্তের বাটীতেঁ যাহাতে তিনি সেই দিন গমন করিতে পারেন, তাহার বিধিমত চেষ্টা পাইতে লাগিলাম এবং বলিলাম যে আমাদের বাটীতে স্থানাভাব, নিকটে গয়লাপাড়া, অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত স্থান, পরমহংসদেবের কষ্ট হইবে, ইত্যাকার সহস্র আপত্তি উত্থাপন করিলাম। পরমহংসদেব যে সময়ে ভক্ত সেবার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন আমরা সেই সময়ে বলিয়াছিলাম যে, অর্থ দিবার কর্ত্তা যিনি তিনিই দিবেন, আমরা ভৃত্য বিশেষ দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিয়া দিব। এই সময়ে আমাদের অর্থোপার্জ্জনের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছিল এবং কয়েকদিনে শত শত মুদ্রা সংগ্রহ হইয়াছিল। পাষণ্ড আমরা সেই অর্থগুলি একত্রিত করিয়া স্ত্রীর নিকট লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। তখন একবার মনে হয় নাই যে এপ্রকার অর্থ আসিতেছে কেন? অর্থগুলি আপনারা আত্মসাৎ করিয়া অন্যের স্কন্ধে পরমহংসদেবকে ফেলিবার প্রয়াস পাইয়া কৃতকার্য্য হইলাম। যদিও কোন ভক্ত সেই দিনে তাঁহার বাটীতে পরমহংসদেবকে লইয়া যাইতে স্বীকার করিলেন বটে কিন্তু অন্তরের সহিত নহে। সে যাহা হউক যখন আমাদের মস্তকের বোঝা গেল, আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া রজনী যাপন করিলাম। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ কালে পূর্ব্বের যাবতীয় কথা একে একে, স্মরণ হইতে লাগিল। অর্থ কেন আসিয়াছে, কেন পরমহংসদেব বৈশাখিপূর্ণিমার দিন আসিবেন বলিয়াছেন, ইহার ভাব যেন দেখিতে পাইলাম। তখন মনে হইল যে, এই আমরা বৈরাগ্য লইতে গিয়াছিলাম? ধিক্! ধিক্,

এমন কীটানুকীট আমরা যে প্রভূর অর্থ আত্মসাৎ করিবার সময় মনে একবার চিন্তা হইল না! আমরা হইব বৈরাগী! বাস্তবিক বৈরাগীর ভাবই বটে। আপন পর বিচার নাই, হাতে এলেই আমার। বলিহারী বৈরাগ্য ভাব, সাবাস বৈরাগী ঠাকুর! এই ঘটনায় বাস্তবিক আমাদের নির্লজ্জ চক্ষে লজ্জা আসিয়াছিল। কেমন করিয়া পরমহংসদেবের নিকটে মুখ দেখাইব, কেমন করিয়া একথা অন্য ভক্তদিগকে বলিব, ভাবিয়া মৃয়মাণ হইয়াছিলাম। এবারে অতি সযত্নে হৃদয়ের সহিত ভক্তসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। যথা দিনে যথা সময়ে পরমহংসদেব শুভাগমন করিলেন এবং যথা নিয়মে মহোৎসব কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন পূর্ব্বক আনন্দের হাট বাজার সংস্থাপন করিয়া যথা সময়ে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কিছু দিন পরে আমরা চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। যতই চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করি, ততই যেন পরমহংসদেবকে দেখিতে পাই। মনে হইতে লাগিল এই গ্রন্থ খানি যেন পরমহংসদেবেরই জীবন বৃত্তান্ত বিশেষ। আমাদের মনে একটা নিতান্ত সন্দেহ জন্মিয়াছিল। সন্দেহ হইবারই কথা, কথাটাত একটা কথার কথা নহে। একদিন পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে রাত্রি যাপন করিতে আমাদের আজ্ঞা করেন। আমরা তাহা স্বীকার করিয়াছিলাম। ঠিক্ সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার গৃহে আমরা বসিয়া আছি, তথায় পরমহংসদেব ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না। তিনি অতি প্রশান্তভাবে কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিয়া আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখিতেছ? আমরা বলিলাম আপনাকে দেখিতেছি। পরমহংসদেব পুনরায় কহিলেন, আমাকে কি মনে কর? আমরা বলিলাম, আপনাকে শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়া জ্ঞান হয়। পরমহংসদেব কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিতে লাগিলেন, "বাম্‌নী ঐ কথা বল্‌ত বটে।" তদবধি আমাদের মনে এক প্রকার কি অস্পষ্ট ভাব হইয়া রহিল, উহা বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু সে দিনকার কথাটী নিতান্ত গুরুতর বলিয়া ধারণা হইয়াছিল। আমরা প্রতিদিন পরমহংসদেবের অমানুষী শক্তির অনেক কার্য্যই দেখিতাম তাহা স্থানে স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আমরা যে দিন যাহা শ্রবণ করিব বলিয়া মনে করিয়া গিয়াছি, সেই দিন সেই কথাই শ্রবণ

করিয়াছি। যে যেখানে যাহা করিত, তিনি সকল বিষয় জানিতে পারিতেন। তিনি জিলিপি খাইতে বড় ভাল বাসিতেন। সেই জন্য আমরা একদিন শ্যামবাজারের মোড়ের দোকান হইতে জিলিপি খরিদ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছিলাম। পুলের দক্ষিণদিকে একটা ৪।৫ বৎসরের ছেলে এক-খানি জিলিপির জন্য গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। আমরা প্রথমে তাহাকে ধমকাইয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিলাম। সে শুনিল না। পরে ভক্তমাল গ্রন্থের একটী গল্প আমাদের মনে হইল। "এক সাধু রুটী প্রস্তুত করিয়া ঘৃত আনয়ন করিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে, একটী কুক্কুর রুটীগুলি মুখে করিয়া লইয়া যাইতেছে। সাধু কুক্কুরের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া কহিলেন, রাম, অপেক্ষা কর, রুটীগুলি ঘি মাখাইয়া দি।" আমরা ভাবিলাম, এ ছোঁড়া বুঝি আমাদের ছলনা করিতেছে। কি জানি, যদি ঈশ্বরের কোন প্রকার কৌতুক হয়, তাহা হইলে, আমাদের অপকার হইবে ইত্যাকার চিন্তা করিয়া, তাহাকে একখানি জিলিপি ফেলিয়া দিলাম। এ কথা আর কেহ জানিল না। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উহা সংস্থাপন পূর্ব্বক সমস্ত দিবস আনন্দ করিয়া কাটাইলাম। অপরাহ্ণ-কালে পরমহংসদেব কিঞ্চিৎ জল পান করিতে চাহিলেন, আমরা ব্যস্ত সমস্তে সেই জিলিপিগুলি প্রদান করিলাম। আশ্চর্য্য ব্যাপার, তিনি বাম হস্তে তাহা স্পর্শ করিয়া উর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক জিলিপি কয়েক খানি চূর্ণ করিলেন এবং মস্তক নাড়িয়া ভক্ষণ করিবার অনভি-প্রায় প্রকাশ করিয়া হস্তধৌত করিয়া ফেলিলেন। এতদ্দৃষ্টে আমাদের বক্ষঃস্থলের ভিতর যে কি হইতেছিল, তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। জিলিপি-গুলি তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দেওয়া হইল। দুই চারি দিন পরে আমরা পুনরায় পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিলে, তিনি কহিলেন, "দেখ, তোমরা আমার জন্য যখন কোন সামগ্রী আনিবে, তাহার অগ্রভাগ কাহাকে প্রদান করিও না। আমি ঠাকুরকে না দিয়া ভক্ষণ করিতে পারি নাই। উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ঠাকুরকে কেমন করিয়া দিব!" এই প্রকার ঘটনা সর্ব্বদাই হইত সুতরাং তাঁহার প্রতি আমাদের অবতারের ভাবই জন্মিয়াছিল।

উল্লিখিত ভক্তসেবার পর দিন সন্ধ্যার সময় আমরা তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। কত উপদেশ দিলেন, কত কথাই বলিলেন,

কথায় কথায় রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল; সে দিন আকাশ মেঘাবৃত থাকায় অতিশয় অন্ধকার হইয়াছিল। দশটার পর আমরা বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখি যে, পরমহংসদেব আসিতেছেন, আমরা সম্মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি নিকটে আসিয়া কহিলেন, "কি চাও"? কি চাও কথা যেন বিদ্যুতের ন্যায় অন্তর ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। ভাবিয়া দেখিলাম চাহিব কি? মনে করিলাম ধন চাই। তখনি মনে হইল, ছি ছি কাঞ্চন লইব না। অর্থ কি, তা জানি, তবে কি লইব? সিদ্ধাই প্রার্থনা করি। না, তাহার পরিণাম অতিশয় ভয়ানক! তবে লইব কি? তখন মনে হইতে লাগিল, এই ত ভগবান্ প্রত্যক্ষ করিতেছি, এই ত আমাদেরই ইষ্টদেব বর প্রদান করিতে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। কি লইব? তখন মনে হইতেছে যে, এখন যাহা চাহিব, তাহাই প্রাপ্ত হইব। কারণ পরমহংসদেব আজ আমাদের প্রতি কল্পতরু হইয়াছেন। অদ্যাবধি যাহা কেহ পাইয়াছেন কি না জানি না, কত লোকে আসা যাওয়া করিতেছে, তাহারা হতাশের কথাই বলে, সাধন ভজনের কথাই বলে, ঈশ্বর লাভ করিতে হইবে বলিয়া কর্ম্ম অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, আমি কিছু পাইয়াছি আমায় সাধু কৃপা করিয়াছেন, এ কথা কেহ বলেন না, কাহার হৃদয়ে শান্তির কথা বাহির হয় না। এ কি নূতন কথা? এ কি আজ আমাদের নবভাব? প্রভু "কি চাও," বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আমরা চাহিব কি ভাবিয়া দিশেহারা হইলাম। অতঃপর কহিলাম, প্রভু! চাহিব কি তা জানি না। অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, আপনার নিকটে কি লইব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কি লইব আপনি বলিয়া দিন। তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "মন্ত্রটী আমায় প্রত্যর্পণ কর, আর জপ তপের প্রয়োজন নাই।" এই স্বর্গীয় কথায় প্রাণ মাতিয়া উঠিল। কি শুনিলাম! এ কি সত্য? না কি স্বপ্ন দেখিতেছি! আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহার চরণে মস্তকাবনত করিয়া মনে মনে মন্ত্রটী পুষ্পাঞ্জলি দিলেম। তিনি ভাবাবেশে মস্তকের ব্রহ্ম তালুর উপরিভাগে দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধ অঙ্গুলী সংস্পর্শ করিয়া কত ক্ষণ রহিলেন, তাহা জ্ঞান ছিল না। যখন তাঁহার ভাবাবসান হইল, তিনি চরণ সরাইয়া লইলেন এবং আজ্ঞা করিলেন যে, "যদি কিছু দেখিবার ইচ্ছা থাকে ত আমায় দেখ এবং যখন আসিবে এক পয়সার কোন দ্রব্য

আনিবে।” আমরা তদবধি শান্তির রাজ্য লাভ করিয়াছি। এখন এক দিন মনে হয় না যে আর আমাদের কোন কার্য্য আছে। তিনি আমাদের সর্ব্বস্ব ধন। যখন যে ভাবে, যে অবস্থায় যে প্রকারে রাখেন; তাহাতেই পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকি। আমরা এই নিমিত্ত তাঁহাকে পতিত পাবন বলিতে বাধ্য হইয়াছি। তাঁহার নিকটে যাইবার সময় আমাদের যাহা প্রয়োজন ছিল, এক্ষণে তাহা পরিসমাপ্তি হইয়া গিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের ন্যায় শত শত পাষণ্ডদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর অনেকের কথাই অনেকেই জানেন। আমরা তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া ঘটনা পরম্পরা লিপিবদ্ধ করিবার মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা সাধারণের নিকট নিজ নিজ পূর্ব্বপরিচয় প্রদান করিতে লজ্জিত এবং আপনাদিগকে এখন পরমহংসদেব কর্ত্তৃক বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন কি না বুঝিতে না পারায় সাধারণ সমক্ষে পরমহংসদেবের নামের সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখিতে চাহেন না। আমরা সেই সকল ব্যক্তিদিগের অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই। তাঁহারা পরমহংসদেবের শিষ্য বলিয়া পরিচিত, যে কেহ তাঁহাদের শ্রদ্ধা করেন, তাহা পরমহংসদেবের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই করিয়া থাকেন। কিন্তু সহসা তাঁহারা আমাদের নিকটে আসিয়া হস্ত বন্ধন করিয়া দেওয়ায়, আমরা তাঁহাদের অভিপ্রায় স্থির করিতে পারিলাম না। হয় তাঁহারা কিছু দিন পরে পরমহংসদেবকে উপেক্ষা করিয়া আপনাদিগকে সাধু মহান্ত করিয়া তুলিবে, না হয় এক্ষণে পূর্ব্বকাহিনী প্রকাশ করিলে পাছে সর্ব্বসাধারণ সকলে তাহাদের পূর্ব্বাবস্থা জ্ঞাত হইতে পারেন, সেই লজ্জায় এ প্রকার অবৈধাচরণ করিয়াছেন তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কোন কোন ভক্ত আমাদের এ প্রকার কথাও কহিয়াছেন যে, কাহার পূর্ব্বকার চরিত্র চিত্রিত করিলে, রাজদণ্ড পাইতে হইবে। আমরা রাজদণ্ডের ভয়ে যে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতে নিরস্ত হইয়াছি তাহা নহে। এই রূপ যাঁহাদের হৃদয়ের ভাব সে সকল লোকের বাস্তবিক পরমহংসদেবের নামের সহিত কোন সংস্রব না থাকাই কর্ত্তব্য। এই শ্রেণীর লোকেরা যে স্থানে থাকেন, সেই স্থানেই একটা বিভ্রাট ঘটাইবার চেষ্টা পান। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, যদি এই সকল ব্যক্তিরা কিঞ্চিৎ ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই দিন ইহাঁদের মুখেও হৃদয় ঠাকুরের ন্যায় কথা বাহির হইবে।

যে সকল ব্যক্তিরা তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাঁহারাও প্রত্যেকে পরমহংসদেবের কৃপায় অদ্য মনুষ্যমণ্ডলে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য হইয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আমাদের ন্যায় শত শত পাষণ্ড পরহংসদেবের কৃপায় পরিত্রাণ পাইয়াছেন। এই সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া পরমহংসদেবের মহিমা কত দূর বিস্তৃত তাহার পরিচয় দেওয়া যাইবে। সুরেন্দ্র বাবু (সুরেশ বলিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে) একজন কৃতবিদ্য এবং কলিকাতার সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব। ইনি সওদাগরী আফিসের প্রধান বাঙ্গালী কর্ম্মচারী সুতরাং অর্থোপার্জ্জন পক্ষে অসুবিধা ছিল না। সুরেন্দ্র বাবু বর্ত্তমান বাজারের লোক ছিলেন। ধর্ম্ম কর্ম্মাদি কিরূপ করিতেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ ভাব বা সংস্কার ছিল, তাহা সবিশেষ বলা যায় না; কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট গমনকাল পর্য্যন্তও তিনি দীক্ষিত হন নাই। এই নিমিত্ত বোধ হয়, তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল না। হিন্দু-সংস্কারাদি তিনি যদিও সমুদয় সমর্থন করিতেন না, কিন্তু তাঁহাকে অহিন্দু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। তবে ইংরাজী ঢংটা কিছু ছিল, তাহা বর্ত্তমান কালের নিয়ম। সুরেন্দ্র বাবুর অন্য বিশেষ কোন গুণের পরিচয় আমরা পাই নাই বটে, কিন্তু তিনি যে একজন হৃদয়বান্ লোক তাহার ভুল নাই। তিনি আমাদের মত নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার নিকটে শ্রবণ করিয়াছি যে, একদিন মধ্যাহ্ন কালে আহারান্তে বহির্বাটীতে তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, এমন সময়ে একটী কৃষ্ণবর্ণা আলুলায়িত কেশা, রক্তবস্ত্র পরিধানা, ত্রিশূল হস্তা, স্ত্রীলোক রাজপথ দিয়া গমন করিতে দেখিলেন। ভৈরবী, সুরেন্দ্রকে দেখিয়া কহিলেন, "বাবা! সব ফাঁকি কেবল সেই সত্য," এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। সেই ভৈরবীকে দেখিয়া সুরেন্দ্রর একটু সাময়িক ভাবান্তর হইয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবুর এই সময়ে নিতান্ত মানসিক ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণ সংশয় হইয়াছিল। এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সুরেন্দ্র বাবুর কোন পরমবন্ধু পরমহংসদেবের নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। পরমহংস-

দেব সুরেন্দ্র বাবুকে দেখিবামাত্র, তিনি এমন ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, সেই জ্ঞানালোকে তাঁহার দীর্ঘ সঞ্চিত পূর্ব্ব সংস্কার তিমিরপুঞ্জ এককালে বিদূরিত হইয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবু সেই দিনে ভবসমুদ্রের মধ্যে কূল পাইলেন, জীবনের লক্ষ্য কি বুঝিলেন এবং মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী উপদেশ মূলমন্ত্রবৎ কার্য্য করিয়াছিল। পরমহংসদেব কহিয়াছিলেন যে, লোকে বাঁদর ছানা হইতে চায় কেন, বিড়াল ছানা হইলে ত ভাল হয়। বাঁদরের স্বভাব এই যে সে ইচ্ছা করিয়া তাহার মাতাকে জড়াইয়া ধরিলে তবে তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবে, কিন্তু বিড়াল ছানার স্বভাব সেরূপ নহে। তাহার মাতা তাহাকে যে স্থানে রাখিয়া দেয় সে সেই স্থানে পড়িয়া ম্যোও ম্যোও করিতে থাকে। বাঁদর ছানার স্বভাব জ্ঞান প্রধান এবং বিড়াল ছানার স্বভাব ভক্তি প্রধান সাধক-দিগের সহিত তুলনা করা যায়। সুরেন্দ্র বাবুর মন এই কথায় একেবারে মজিয়া গেল। তিনি তদবধি প্রত্যেক রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে না যাইলে স্থির থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কার সকলেরই সমান। সুরেন্দ্র বাবু পরমহংসদেবের উপদেশে বিমোহিত এবং পরিবর্ত্তিত হইয়াও পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ মধ্যে মধ্যে আপন কু-অভ্যাসের অনুরোধে তথা হইতে পাস কাটা-ইতে চেষ্টা করিতেন, কখন তাহাতে কৃতকার্য্যও হইতেন। কোন রবিবারে তিনি আপিসের কর্ম্মের ভাণ দেখাইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন না। পরমহংসদেব তাহা শুনিলেন, এবং ভাবাবেশে কহিতে লাগিলেন, "দিনকত আমোদ আহ্লাদ করিবার সাধ আছে করুক, পরে ও সব কিছুই থাকবে না।" তখন একথার মর্ম্ম কেহই অনুধাবন করিতে পারিল না। পর-দিন সুরেন্দ্র বাবু কোন ভক্তের নিকট আগমন পূর্ব্বক পরমহংসদেবের নিকট কি কি কথা হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি যত দূর যাহা স্মরণ রাখিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কহিলেন, সুরেন্দ্র বাবু তখন আর কোন কথা ভাঙ্গিলেন না। পরের রবিবারে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন বটে, কিন্তু পরমহংসদেবের নিকটে না বসিয়া সকলের পশ্চাতে উপবেশন করিলেন। পরমহংসদেব সুরেন্দ্র বাবুর কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া বলি-লেন, "চোরটীর মত অমন করিয়া বসিলে যে? নিকটে আইস।" সুরেন্দ্র বাবু কি করেন, সম্মুখে যাইয়া বসিলেন। পরমহংসদেব সাধারণ উপদেশ-

চ্ছলে কহিতে লাগিলেন, "দেখ লোকে যখন কোথাও যায়, মা'কে সঙ্গে লইয়া যায় না কেন? তাহা হইলে অনেক বিষয়ে যাহা করিবার কোন সংকল্প ছিল না, তাহা হইতে রক্ষা পায়; পুরুষার্থ সর্ব্বদা প্রয়োজন।" সুরেন্দ্র বাবু, এই কথাগুলি তাঁহাকে কথিত হইতেছে বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তিনি পুরুষার্থের কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে কহিতেছিলেন, ঐ পুরুষার্থের জ্বালায় অস্থির হইয়াছি। পরমহংসদেব অমনি তাহা জানিতে পারিয়া তিনি রোষান্বিত ভাবে সুরেন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "কুক্কুর শৃগালের পুরুষার্থকে পুরুষার্থ বলে না। পুরুষার্থ ছিল অর্জ্জুনের, যখনই যাহা করিবেন বলিয়া মনে করিতেন, তখনই তিনি তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেন।" সুরেন্দ্র বাবু এই কথা শ্রবণ করিয়া অবাক্ হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, প্রভু! আর বাড়াবাড়ি করিবেন না। আপনার নিকটে আর গোপন করিব কি? মনের কথা টানিয়া বাহির করিলেন, কোথায় কি লুকাইয়া করিলাম, তাহা যদি দেখিতে পাইবেন, তবে আর যাইব কোথায়। ঠাকুর! আপনি জানিতে পারিয়াছেন, আর কেন? আর কিছু ভাঙ্গিবেন না, এখনি এই ভক্তমণ্ডলী সকলে জানিতে পারিবে। পরমহংসদেব নিরস্ত হইলেন। সুরেন্দ্র বাবু তদবধি তাঁহার পূর্ব্বের যে সকল কু-অভ্যাস ছিল তাহা ক্রমে পরিত্যাগ করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

পরমহংসদেবের শক্তির প্রভাবে সুরেন্দ্র বাবু কিছু দিনের মধ্যে একজন ভক্ত শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বাটীতে পরমহংসদেব সর্ব্বদাই আসিতেন এবং ভক্তগণ লইয়া মহা আনন্দ করিয়া যাইতেন। সুরেন্দ্র বাবুর পূর্ব্ব প্রকৃতি প্রায় পরিবর্ত্তন হইয়া আসিল, তিনি অতিশয় ভক্তি সহকারে প্রত্যহ তাঁহার ইষ্টদেবী কালীর পূজা করিতে লাগিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকটে যে সকল ভক্ত থাকিতেন তাঁহাদের জন্য যে সকল ব্যয় হইত এবং পরমহংসদেব সম্বন্ধীয় নানা কার্য্যের অর্থ ব্যয় তাহা সহ্য করিতেন। সুরেন্দ্র বাবু মুক্তহস্ত পুরুষ হইয়া উঠিলেন।

সুরেন্দ্র বাবু সর্ব্ব প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পান দোষটী কোন মতে যাইল না। এই পান দোষের নিমিত্ত ভক্তগণ সর্ব্বদাই দুঃখিত ছিলেন। একদা মহাষ্টমীর দিন নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময় কোন ভক্ত সুরা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করায় সুরেন্দ্র বাবু

কহিয়াছিলেন যে তিনি ইচ্ছা করিয়া কিছু করিতে পারিবেন না। তাহা তাঁহার সাধ্যাতীত পরমহংসদেব যে প্রকার আদেশ করিবেন সেইরূপ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গীকে আরও কহিয়াছিলেন যে, তুমি একথা তাঁহার নিকট উত্থাপন করিও না। তিনি আপনি যাহা বলিবেন তাহাই গ্রাহ্য করিব। সঙ্গের ভক্তটী চিন্তিত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন যদ্যপি পরমহংসদেব কোন কথা না বলেন তাহা হইলে সকল কার্য্যই ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। এই ভাবিয়া পরমহংসদেবকে স্মরণ করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা উভয়ে মন্দির উদ্যানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে পরমহংসদেব ভাবাবেশে বকুল তলার ঘাটের নিকটে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সুতরাং তখন তাঁহার সহিত কোন কথাই হইল না। কিয়ৎকাল পরে তিনি আপন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুরেন্দ্র বাবু ও তাঁহার সঙ্গী পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া গৃহ মধ্যে আসিয়া উপবেশন করিলেন। পরমহংসদেব তখন নয়নোন্মীলিত করেন নাই; কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও সুরেন্দ্র খাব বলে খাবে কেন? কুণ্ডলিনীকে দিবার নিমিত্ত অতি অল্প পরিমাণে কারণ-স্বরূপ পান করিবে। সাবধান! পা না টলে এবং মন না টলে। প্রথমে "কারণ" অবলম্বন পূর্ব্বক আনন্দ লাভ করিতে হয় যাহাকে কারণানন্দ কহে, তদনন্তর আপনি আনন্দ আসিয়া থাকে; তাহাকে ভজনানন্দ কহে।" সুরেন্দ্র বাবু ও তাঁহার সঙ্গী অবাক্ হইয়া রহিলেন। আক্ষেপের বিষয় সুরেন্দ্র বাবু এই দৈববাণীবৎ উপদেশ, যাহা কাহার ভাগ্যে কেহ কখন ঘটিতে দেখে নাই, তাহা শুভাদৃষ্ট গুণে প্রাপ্ত হইয়াও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন নাই। কেন যে তিনি এই দৈববাণী উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে আমরা অসমর্থ। বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত পাশ্চাত্য সংস্কার এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছিল। কিন্তু পরমহংসদেবের শক্তির কি মহিমা, সুরা সেবন করিয়াও সুরেন্দ্র বাবু এক দিন অন্য কথা কহিতেন না। সে সময়ে তাঁহার যেন ভক্তিস্রোত খুলিয়া যাইত। তাঁহার বালকবৎ মা মা শব্দে পাষণ্ডের হৃদয়েও প্রেমের সঞ্চার হইত। সে সময়ে তাঁহাকে দেখিলে অকপট সরল এবং ভক্তির মূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান হইত। এই নিমিত্ত সুরা সেবন করিয়াও সুরেন্দ্র বাবুর আধ্যাত্মিক উন্নতির হানি হয় নাই। তিনি পরমহংসদেবের সর্ব্ব-ধর্ম্ম-

সমন্বয় করা ভাব বুঝিয়া এক খানি ছবি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই ছবিতে শিবের মন্দির ও গির্জ্জার সম্মুখে গৌরাঙ্গদেব ও ঈশা উভয়ে উভয়ের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছেন। সঙ্গে সকল সম্প্রদায়ের একটী করিয়া ভক্ত আছেন; খোল, করতাল ও শিঙ্গা বাজিতেছে; পরমহংসদেব কেশব বাবুকে তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। এই চিত্রখানি প্রস্তুত করিবার দুইটী ভাব ছিল। প্রথম, এই ভাবটী পরমহংসদেবের নিজের সাধনের ফল স্বরূপ এবং দ্বিতীয়, উহা কেশব বাবু পরমহংসদেবের নিকট হইতে পাইয়াছেন। কেশব বাবুর অন্তরে যাহাই থাকুক, নববিধাম ভাবটী যে পরমহংসদেবের ভাবের বিকৃত, তাহা সুরেন্দ্রবাবুও বুঝিয়াছিলেন এবং এই নিমিত্ত ছবিখানি কেশব বাবুকে দেখাইতে পাঠাইয়াছিলেন। কেশব বাবু ছবিখানি দেখিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে এই বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, "যাঁহা হইতে এই ছবির ভাব বাহির হইয়াছে তিনি ধন্য।" সুরেন্দ্র বাবু এই মর্ম্মে আর একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের চিহ্ন বিশেষ যে সকল যন্ত্র আছে যথা বৈষ্ণবদের খুন্তি, খৃষ্টানদের ক্রুস্, মুসলমানদের পঞ্জা ইত্যাদি লইয়া একস্থানে মিলাইয়াছিলেন। কেশব বাবু ঐ যন্ত্রটী লইয়া একবার নগর কীর্ত্তনে বাহির হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু পরমহংসদেবকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন।

সুরেন্দ্র বাবু একজন নিতান্ত সহজ ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ইদানি কহিতেন যে, যে দিন তাঁহাকে প্রথমে পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিবার নিমিত্ত তাঁহার বন্ধু প্রস্তাব করেন, সেই দিন তিনি পরমহংস নাম শুনিয়া কহিয়াছিলেন, "দেখ, তোমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা কর ভালই আমায় কেন আর সে স্থানে লইয়া যাইবে? আমি হংস মধ্যে বক যথা ঢের দেখিয়াছি। তিনি যদ্যপি বাজে কথা কহেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার কান মলিয়া দিব।" সুরেন্দ্র বাবু এক্ষণে এই কথা কহিয়া রোদন পূর্ব্বক বলিতেন। "অবশেষে তাঁহার নিকটে আমি নাক্ কাণ মলা খাইয়া আসিলাম।"

বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ইতিবৃত্ত অতি সুন্দর। তিনি সর্ব্বপ্রথমে ধার্ম্মিক ছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মে বিশেষ আস্থা ছিল কি না, জানি না থাকিবার কথা নহে। তিনি কিন্তু সর্ব্বদা আদি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাদিতে যোগ দিতেন। একদা উৎসবের দিন প্রথমে বেচারাম বাবু এবং পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পূর্ব্বদেশীয় একজন প্রচারক মন্দিরে উপাসনা কার্য্য করিয়াছিলেন। পর-

দিন কেশব বাবুর বাটীতে বক্তৃতাদি সম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছিল। কেশব বাবু কহিলেন, বেচারাম বাবু কেমন বলিলেন? একজন উত্তর করিলেন, আহা! তাঁহার যেমন বলিবার কায়দা তেমনি শব্দ বিন্যাস করিবার ক্ষমতা। এই কথা শুনিয়া কেশব বাবু পুনরায় বলিলেন, বাঙ্গালটা কেমন বলিল। গিরিশ বাবু তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাঘাৎ পাইলেন এবং ভাবিলেন এ কি! ধর্ম্মের ভিতর এত কপটতা! বাঙ্গালটা— ইহাদের ভ্রাতৃভাব কেবল মুখের কথা মাত্র। এই বলিয়া একেবারে কালা-পাহাড় বিশেষ হইয়া দাঁড়াইলেন। শুনিয়াছি, সাধু দেখিলেই তাহার চিম্‌টে কাড়িয়া লইয়া প্রহার করিতেন। বাটীতে দুর্গা ঠাকুর আনা হইয়া-ছিল, তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি ঈশ্বর মানিতেন না। তাঁহার মন হইতে ঈশ্বর শব্দটী দূর করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এই প্রকার প্রবাদ আছে যে, কোন সময়ে বরাকরের সন্নিহিত পঞ্চকুট পাহাড়ের দুর্গম স্থানে পতিত হইয়া ভয়ে ঈশ্বর শব্দটী তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছিল। তেজীয়ান্ গিরিশ বাবু আপনাকে ধিক্কার দিয়া কহিয়াছিলেন কি? ভয়ে ঈশ্বর বলিলাম! কখন বলিব না। যদি কখন প্রেমে বলিতে পারি, তবে তাঁহার নাম গ্রহণ করিব।

গিরিশ বাবুর চৈতন্য-লীলা যখন অভিনয় হয়, পরমহংসদেব তাহা দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই দিন গিরিশ বাবুর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায় মধ্যে মধ্যে উভয়েরই যাতায়াত হইত। কিন্তু গিরিশ বাবু যাহাই থাকুন তিনি যে একজন অতি বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। তিনি জানিতেন যে, যিনি গুরু তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু এবং তিনিই মহেশ্বর। পরমহংসদেবকে তিনি অসা-ধারণ ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও তাঁহার চিত্ত, বোধ হয় পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। পরমহংসদেব একদিন থিয়েটারে অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়া-ছিলেন, অভিনয়ান্তে গিরিশ বাবু পরমহংসদেবের নিকট আগমন পূর্ব্বক কথায় কথায় তাঁহাকে এ প্রকার কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, তাহা লেখা পড়ায় প্রকাশ করা যায় না। বরং জগাই মাধাই কর্ত্তৃক নিত্যানন্দের কলসীর কাণার আঘাত সহস্র গুণে ভাল ছিল, কিন্তু গিরিশ বাবুর সেই দিনের গালাগালের তুলনা নাই। কারণ একবার প্রহার করিলে তাহার যন্ত্রণা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, কিন্তু কবির মুখের খেউড় যে কি প্রকার মর্ম্মে

মর্ম্মে যাইয়া বিদ্ধ হয়, তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এই গালাগালে উপস্থিত ভক্ত মণ্ডলী ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু পরমহংসদেবের অপূর্ব্ব মানসিক ভাব দেখিয়া সকলেই মনের আবেগ সম্বরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে যেমন হাসিতেছিলেন, এখনও তেমনি হাসিতে লাগিলেন, হাসিতে হাসিতে যথা সময়ে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইলেন।

এই সমাচার যখন ভক্তদিগের নিকটে প্রচারিত হইল, সকলেই দুঃখিত হইলেন, এবং তাহা না হইবেন কেন? দোষী ব্যক্তিকে অতিরিক্ত কটু বলিলে লোকের প্রাণে আঘাত লাগিয়া থাকে। সর্ব্ব শুভানুধ্যায়ী, নির-পরাধী পরমহংসদেবের সহিত সে প্রকার ব্যবহার যে নিতান্ত ধর্ম্ম, নীতি এবং লোক বহির্ভূত কার্য্য বলিয়া ধারণা না হইবে তাহার হেতু নাই।

অতঃপর পরমহংসদেব একদিন অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে আমরা যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা যাইবা মাত্র তিনি কহিলেন "গিরিশ আমায় গাল দিয়াছে।" আমরা কহিলাম "কি করিবেন।" তিনি পুনরায় কহিলেন, "আমায় যদি মারে।" আমরা কহিলাম "মার খাই-বেন।" তিনি কহিলেন, "মার খাইতে হইবে?" আমরা বলিলাম "গিরিশের অপরাধ কি? কালীয় সর্পের বিষে রাখাল বালকগণের মৃত্যু হইলে শ্রীকৃষ্ণ কালীয়ের যথা বিহিত শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, তুমি কি জন্য বিষ উদ্গীরণ কর? কালীয় সানুনয়ে কহিয়াছিল, প্রভু! যাহাকে অমৃত দিয়াছেন, সে তাহাই দিতে পারে, কিন্তু আমায় ঠাকুর বিষ দিয়াছেন, আমি অমৃত কোথায় পাইব? গিরিশের ভিতরে যাহা ছিল, সেই সকল পদার্থে দ্বারা তাহার হৃদয় ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল। সেই কালকূট সম বাক্য গুলি ফেলিয়া দিবার আর স্থান কোথায়? উহা যথায় নিক্ষিপ্ত হইত তথায় বিপরীত কার্য্য হইত সন্দেহ নাই। আমাদের বলিলে হয়ত এতক্ষণ তাঁহার নামে রাজদ্বারে অভিযোগ করা হইত, এই সকল বুঝিয়া প্রভু আপনি নিজে অঞ্জলী পাতিয়া লইয়া আসিয়াছেন।" সাধে কি বলি পতিতপাবন দয়াময়! অমনি তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল, তাঁহার অক্ষদ্বয়ে জল আসিল এবং তখনি গিরিশের বাটীতে গমন করিবার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়া-ইলেন। কোন কোন ভক্ত সেই দুই প্রহরের সূর্য্যোত্তাপে তাঁহার ক্লেশ হইবে বলিয়া আপত্তি করিলেন, কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া সেই দণ্ডে শকটা-

রোহণে গিরিশের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ দিকে গিরিশ তাঁহার নিজ কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া আপনাকে আপনি সহস্র লাঞ্ছনা করিতেছিলেন। তিনি কেমন করিয়া ভক্ত সমাজে মুখ দেখাইবেন ভাবিতেছিলেন। সে ভাবনা দূরীকৃত হইল। পরমহংসদেব এমন ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং ভক্ত সহ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলেন যে, গিরিশ বাবুর মনে যে সকল দুঃখ এবং লজ্জা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল। সেই গিরিশ আজ পরমহংসদেবের পরাক্রমে পরাজিত হইলেন।

গিরিশ বাবুর অন্য কোন প্রকার চরিত্র দোষ ছিল কি না, তাহা প্রকাশ নাই, কিন্তু মদে সিদ্ধ ছিলেন এ কথা বলা বাহুল্য। কেবল মদ কেন আবগারী মহল তাঁহার ইজারা ছিল বলিলে কি বেশী বলা হইবে? মদ ছাড়াইবার জন্য কোন ভক্ত পরমহংসদেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন. তিনি এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার এত মাথা ব্যথা কিসের? সে মদ ছাড়ুক আর নাই ছাড়ুক যে তাহার কর্ত্তা, সে বুঝিবে। বিশেষতঃ ওরা শূর ভক্ত—মদে দোষ হইবে না। ভক্ত আর কি বলিবেন, চুপ করিয়া রহিলেন।

পরমহংসদেব কর্ত্তৃক গিরিশ বাবুর ক্রমে সুখ্যাতি বিস্তার হইতে লাগিল। তিনি এই কথা শুনিয়া বড়ই বিরক্ত হইতেন এবং কহিতেন ঠাকুর, কথায় কিছু হবে না। আমি ঢের কথা জানি, কার্য্য চাই। সে আমি তাহাই আছি। এই বলিয়া এক দিন সন্ধ্যার পর মদের বোতল খুলিয়া বসিলেন। দুই এক জন বন্ধুও জুটিল। তাহারা দুই চারি গ্ল্যাস মদ খাইয়া কাৎ হইয়া পড়িল গিরিশের সে বিষয়ে মনোযোগের ত্রুটি হয় নাই। বোতলটী নিঃশেষিত হইলে একটী উদ্গার উঠিয়া সমুদায় নেশা কমিয়া গেল। দ্বিতীয় বোতল খোলা হইল, তাহাও যথা সময়ে ফুরাইয়া নেশা হইল না। পরে তৃতীয় বোতল ঐ রূপে যখন নেশার উৎপাদন করিতে অসমর্থ হইল এবং ওদিকে জলে উদর স্থলী ফুলিয়া উঠিল দেখিয়া বিরক্ত হইয়া সে দিন হইতে আর মদ খাইতেন না। গিরিশ বাবুর একাগ্রতা শক্তি অতিশয় প্রবল। তিনি যাহা করিবেন বলিয়া মনে করেন, তাহা হইতে কেহ তাঁহাকে মতান্তর করিতে পারিত না। কিন্তু কু-সংস্কার বা কু-অভ্যাস কেহ কাহার কথায় পরিত্যাগ করিতে পারে না, পরমহংসদেব তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তন্নিমিত্ত তিনি গিরিশ বাবুকে সুরা সেবন করিতে নিষেধ করেন নাই।

কয়েক দিন পরে জনৈক অভিনেত্রীর পীড়া দেখিতে গিয়া তথায় হুইসকী

সুরা পান করিতে আরম্ভ করেন। সে দিন তাঁহার অপরিমিত পরিমাণে নেশা হওয়ায় তথায় তাঁহাকে অজ্ঞানাবস্থায় রজনী যাপন করিতে হইয়াছিল। বেশ্যা বাটীতে রজনী যাপন করা গিরিশ বাবুর জীবনে এই প্রথম ঘটনা। প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিয়া তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বারনারীর গৃহে রজনী যাপন হইয়াছে জানিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া বাটীতে না গিয়া এক খানি গাড়ী ভাড়া করিলেন এবং সঙ্গে এক শিশি মদ লইয়া দক্ষিণেশ্বরে শুভ যাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়া তিনি উর্দ্ধ-শ্বাসে পরমহংসদেবের নিকট চলিয়া গিয়া তাঁহার চরণ দুইটী বক্ষে স্থাপন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী পরমহংসদেব তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিলেন, কিন্তু তখন কিছু প্রকাশ করিলেন না।

গিরিশ বাবু গৃহে প্রবেশ করিবার পর পরমহংসদেব, অন্য ভক্তের দ্বারা গাড়ী হইতে মদের শিশি ও গিরিশের চাদর এবং জুতা আনাইয়া রাখিয়া-ছিলেন। গিরিশের খোঙ্গারীর সময় উপস্থিত হইলে মনে হইল যে গাড়ীতে মদ ছিল। গাড়ী তখন চলিয়া গিয়াছে। কি হইবে ভাবিতেছেন, পরম-হংসদেব তখন সেই মদ বাহির করিয়া দিতে কহিলেন। গিরিশ আনন্দে তাহা ঢুক্ ঢুক্ করিয়া পান করিতে লাগিলেন। সে দিন জন্মাষ্টমীর বন্ধের জন্য তথায় অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল, গিরিশের মদ খাওয়া সকলে দেখিয়া আসিল।

এই ঘটনায় গিরিশ বাবু লজ্জিত হইয়া মদ খাওয়া এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সে দিন পরমহংসদেব গিরিশের নিকটে যে প্রতিশ্রুত হইয়া-ছিলেন, সেই সত্য পাশ হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত গিরিশের পরিত্রাণের ভার আপনি লইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, যে কয়েক দিন সংসারে আছ সে কয়েক দিন শীঘ্র শীঘ্র খেয়ে নে পরে নে ইত্যাদি।

গিরিশ বাবুর ভক্তির তুলনা নাই। পরমহংসদেব তাঁহাকে বীরভক্ত, সুরভক্ত বলিয়া ডাকিতেন। গিরিশকে পাইলে তিনি যে কি আনন্দিত হইতেন তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, গিরিশের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর দ্বিতীয় দেখেন নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত মথুর বাবুর বারো আনা বুদ্ধি ছিল এবং গিরিশের ষোল আনার উপরে চারি ছয় আনা বলিতেন।

এক দিন দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাটীতে পরমহংসদেব কৃতক-

গুলি ভক্ত সহিত একত্রিত হইয়াছিলেন। তথায় গিরিশ বাবুও উপস্থিত ছিলেন। পরমহংসদেবের ভাবাবেশ হইল। গিরিশ বাবু সেই সময় মনে মনে কি প্রার্থনা করিতেছিলেন,তাহা প্রকাশ নাই; কিন্তু পরমহংসদেব কিঞ্চিৎ জোর করিয়া কহিলেন "ও গিরিশ ভাবচ কি? এর পর তোমাকে দেখিয়া সকলে অবাক্ হইবে। যদিও এই রূপে বার বার গিরিশ বাবুর আকাঙ্ক্ষা মিটিতে লাগিল, তথাপি তাঁহার মনে বোধ হয় তখন কিছু কিছু সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাহা অচিরাৎ দূর হইয়াছিল। এক দিন অধরলাল সেনের বাটীতে পরমহংসদেব কয়েকটী ভক্ত সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে এক জনের নিকট সুরা ছিল। পরমহংসদেব তাহা জানিতেন। অধর বাবুর বাটীতে প্রবেশ কালে সেই ভক্তটী সুরার পাত্রটী গাড়ীর ভিতরে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল, পরমহংসদেব তাহাকে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, গাড়োয়ান খাইয়া ফেলিবে; সুতরাং বোতলটী সঙ্গে কাপড়ের ভিতর লুকান রহিল। সেই দিন তথায় চণ্ডীর গীত হইয়াছিল, তজ্জন্য অনেকের সমাগম হয়। ইতিমধ্যে সেই বোতলটী সভাস্থলে বাহির হইয়া, সুরার গন্ধে দিক্ পরিব্যাপ্ত হইল। অনেকে কহিল যে, পরমহংসদেবের যে নেশার মত হয় তাহা এই জন্য; লুকিয়ে লুকিয়ে মদ্য পান হইয়া থাকে। কেহ বলিল, তিনি তান্ত্রিক, তাহাতে দোষ নাই। পরে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যখন অনেকের জানাজানি হইল, তাহারা সকলে পরীক্ষা করিতে আসিয়া দেখিল যে, মদের লেশ মাত্র নাই, উহাতে ডি. গুপ্তের ঔষধের গন্ধ বাহির হইতেছে। এই কথা গিরিশ বাবু শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এক অদ্ভুত বুজরুকী হইতেছে। মদের দোষ কি? বেশ ত অমন গুরুর আমরা ঠিক্ চেলা হইতে পারি। বোতল উৎসর্গ করিয়া গুরুকে খাওয়াইব এবং সকলে প্রসাদ পাইব। এই রূপ চিন্তা করিয়া মদের বোতল খুলিয়া কার্য্য আরম্ভ হইল। দুই চারি গ্লাস সেবনের পর, সেই সুরার বোতলটী ডি. গুপ্তের ঔষধে পরিণত হইয়াছিল। তদনন্তর গিরিশ বাবুর অকপট বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অতঃপর তাঁহাকে এক দিন পরমহংসদেব কহিলেন যে, "আর কিছু করিতে পার আর নাই পার, প্রত্যহ এক বার ঈশ্বরকে ডাকিও। তুমি বলিবে, তাহা যদি না পারি? এক বার না হয় সন্ধ্যার পর একটা প্রণাম করিও। তুমি বলিবে তাহাও যদি সুবিধা না হয়, ভাল আমায় বকল্‌মা দিয়া যাও।" গিরিশ বাবুর মনের

আকাঙ্ক্ষা সেই ক্ষণ হইতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ কাল গিরিশ বাবুকে দেখিলে বাস্তবিক অবাক্ হইতে হয়। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে গিরিশকে যে ভাবে দেখা গিয়াছে, আজ আর তাঁহাকে তেমন দেখা যাইতেছে না।

গিরিশ বাবুর আর কোন সাধন ভজন নাই। তাঁহার মনে বিলক্ষণ শান্তি বিরাজ করিতেছে। তিনি এখন যে প্রকার তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বুদ্ধদেব চরিত, বিল্বমঙ্গল, নসিরাম এবং রূপসনাতনাদি গ্রন্থে দেদীপ্যমান্ রহিয়াছে। আমরা জানি, এই সকল পুস্তকের দ্বারা অনেকের ধর্ম্মের কপাট উদ্ঘাটন হইয়াছে।

অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনে বিশেষ বিশেষ ঘটনা আছে, তাহা এস্থানে সন্নিবেশিত করা দুঃসাধ্য। তাঁহারা প্রত্যেকে ত্রিতাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া মৃত প্রায় হইয়াছিলেন, পরমহংসদেবের চরণ ছায়ায় উপবেশন করিয়া সকলেই মুক্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

পরমহংসদেবের অনেকগুলি স্ত্রীলোক ভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের কি ভাব ছিল এবং পরমহংসদেব কর্ত্তৃক কি ভাবেই বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা কাহারও জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। তাঁহারা কেহ সন্ন্যাসিনী এবং কেহ পুরবাসিনী। যে সকল স্ত্রীলোক যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে বাবু মনমোহন মিত্রের জননী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া পরমহংসদেব কহিয়াছিলেন। তিনি যতদিন সধবা ছিলেন, তাঁহার ন্যায় পতি পরায়ণা স্ত্রী এই উনবিংশ শতাব্দীতে দেখিতে পাওয়া অতি দুর্ল্লভ। বৈধব্য দশায় পতিত হইয়া যে কয়েক দিন জীবিত ছিলেন তিনি প্রায় পাগলিনীর ন্যায় দিন যাপন করিতেন। বাম হস্তে লৌহ এবং ললাটে সিন্দূর ব্যতীত অন্য বৈধব্য লক্ষণ তাঁহার বিশেষ কিছু ছিল না, অর্থাৎ তিনি লাল পেড়ে ধুতি পরিধান এবং স্বর্ণ বলয় হস্তে ধারণ করিতেন। আহারে সম্পূর্ণ সন্ন্যাসিনীর ভাব ছিল। তিনি হিন্দু বিধবা হইয়া বালা ও লালপেড়ে

ধুতি ব্যবহার করিতেন বলিয়া অনেকে অনেক কথাই কহিত কিন্তু তিনি সে সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না। একদিন পরমহংসদেবের সমক্ষে অন্যান্য স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন, প্রসঙ্গ ক্রমে স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা উঠিল। পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতিদিগের পতিই একমাত্র ধর্ম্ম ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রায়। পতিতে শান্ত দাস্যাদি সকল রস আছে। পতি জীবিত অথবা মরিয়া যাইলেও সে ভাব থাকা উচিত। অনেকে পতির জীবদ্দশার পর শ্রীকৃষ্ণকে পতি জ্ঞান করিয়া থাকে। তিনি তদনন্তর একটী গল্প বলিয়াছিলেন। কোন রাজমহিষী স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিতেন না, তিনি সধবার ভাব রক্ষার জন্য রুলি পরিতেন। কত লোকে কত কি বলিত কিন্তু তিনি আপনার মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেন না। কাল সহকারে রাজার মৃত্যু হইল, রাণী তাড়াতাড়ি রুলি গুলি ভাঙ্গিয়া সোনার বালা পরিলেন। লোকে অবাক্ হইয়া রহিল। একদিন একটী প্রতিবাসিনী তাঁহাকে এ প্রকার অলঙ্কার পরিবার হেতু জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, এত দিন আমার পতি নশ্বর ছিলেন, তাই নশ্বর পদার্থের লক্ষণ রাখিয়াছিলাম। এখন আমার পতি অক্ষয় অমর এবং অজর, সেই জন্য অক্ষয় সোণার বালা পরিয়াছি। পরমহংসদেব কহিতে লাগিলেন, এঁর বালা পরা সেইরূপ। ভিতরকার ভাব অতি উচ্চ এবং সুন্দর। লোকের কথায় কি কেহ ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে? যে ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে তাহার তখনও প্রাণে সে ভাব হয় নাই বলিতে হইবে। মনমোহন বাবুর মাতার উচ্চভাব সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। তাঁহার তৃতীয় জামাতা পরমহংসদেবের উপাসক হওয়ায় পাড়ার স্ত্রীলোকেরা আক্ষেপ করিত। তিনি এই কথায় বলিতেন, আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, আমার জামাই সন্ন্যাসী হইয়া সাধু সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবে?

গৌরদাসী (গৌরী মা বলিয়া পরিচিত) নাম্নি আর একটী ব্রাহ্মণের কন্যা পরমহংসদেবের বিশেষ অনুগৃহীত পাত্রী ছিলেন। তাঁহার বালিকাবস্থা উত্তীর্ণ কাল হইতে পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ের সূক্ষ্ম ভাব সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি পতি-গৃহে পূজা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা দিনযাপন করিতেন। বিষয়াবৃত লঘুচেতা ব্যক্তিরা কে আপন স্ত্রীকে ইচ্ছা করিয়া সন্ন্যাসিনী সাজাইতে চাহেন? তাঁহার প্রতি পতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িল। তিনি একদিন নিশিথকালে একবস্ত্রে গৃহ হইতে বহির্গত

হইয়া দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শ্রীপাট নবদ্বীপে জনৈক বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত হইয়া গৌরদাসি নাম প্রাপ্ত হইলেন। বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি বলরাম বাবুর বাটীতে এবং কখন তাঁহাদের বৃন্দাবনের কুঞ্জে বাস করিতেন। এই সময়ে তিনি পরমহংসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তিনি পরমহংসদেবকে গৌরাঙ্গ বলিয়া চিনিলেন। একদিন তাঁহার মনে মনে সাধ হইয়াছিল যে প্রভু যেরূপে নবদ্বীপে ভক্ত লইয়া ভাবে মাতামাতি করিয়াছিলেন, আমায় সেই রূপ একবার দেখাইলে জীবন ধারণ সার্থক জ্ঞান করি, কিন্তু প্রকাশ করিয়া কিছুই বলেন নাই। অন্তর্যামী ভক্তবৎসল পরমহংসদেব ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে কখন বিলম্ব করিতেন না।

একদা কতকগুলি ভক্ত একত্রিত হইলেন। মধ্যাহ্নকালে গৌরীমাতা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া পরমহংসদেবকে পরিবেশন করিলে পর ভক্ত প্রবর কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরমহংসদেব তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। কেদার বাবু তাঁহাকে বিনয় সহকারে মাতৃ সম্বোধন পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, তিনিও কেদার বাবুকে প্রণাম করিলেন। উভয়ে উভকে প্রণাম করনান্তর একবার পরস্পর চারি চক্ষে দেখাদেখি হইল এবং উভয়ের নয়নধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পরমহংস-দেব তখন দুই একগ্রাস ভোজন করিয়াছিলেন। তিনি গৌরী মাতা এবং কেদার বাবুর প্রেমাবেশ দেখিয়া আপনি মাতিয়া আহার পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অন্যান্য ভক্তগণ সকলেই একেবারে উন্মত্ত প্রায় হইয়া পড়িলেন; ভাবের বন্যা আসিল। কাহার বক্ষস্থলে হু হু করিয়া আনন্দ বায়ু উত্থিত হইয়া উচ্চ হাস্যের ঘোর-ঘটা উপস্থিত করিয়া দিল, কেহ সংজ্ঞা শূন্য হইয়া কাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল, কেহ উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ নয়ন মুদিয়া গদ্‌গদ্‌স্বরে জয় রামকৃষ্ণের জয় বলিয়া মাতালের ন্যায় ঢলিতে লাগিল, কেহ এই দেখিয়া শুনিয়া ভয়ে তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। গৌরী মাতা প্রেমাবেশে খিচুড়ী প্রসাদ ভক্তদিগের মুখে অর্পণ করিবেন বলিয়া চেষ্টা করিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তাঁহার হাতের অন্ন হাতেই রহিল; তিনি জড়বৎ হইয়া পড়িলেন। চতুর্দ্দিকে লোক দাঁড়াইয়া গেল সকলেই অবাক্। কিয়ৎকাল এই রূপে

অতিবাহিত হইলে পরমহংসদেব সকলের বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া সহজ ভাবে আনিয়া দিলেন। গৌরী মা অতিশয় ভক্তি পরায়ণা ছিলেন। পরমহংস-দেবের ভক্তদিগের প্রতি তাঁহার বাৎসল্যভাব ছিল। তিনি সর্ব্বদা মাল্পো ও অন্যান্য পক্কান্ন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাইতেন। ভক্তেরা উদর পূর্ণ করিয়া সেই সকল মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতেন।

যে সময়ে দক্ষিণেশ্বরে স্ত্রীলোকেরা যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে মাতাঠাকুরাণী (পরমহংসদেবের স্ত্রী) সেবা করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলেন। পরমহংসদেব কখন কখন তাঁহাকে নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে দিতেন এবং কখন নিষেধ করিতেন। সেই সময়ে মাতা ঠাকুরাণী একদিন পরমহংসদেবকে ভাবাবেশে দেখিয়া মন পরী-ক্ষার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি বলুন দেখি আমি কে?" পরমহংসদেব অতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিয়াছিলেন, "তুমি আমার আনন্দময়ী মা।" মাতা সেই কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ওকথা বলিতে নাই।" পরমহংসদেব কহিলেন, "আমি জানি একরূপে মা আনন্দময়ী এই দেহ প্রসব করিয়াছেন, একরূপে মা আনন্দময়ী কালী-রূপে কালী ঘরে আছেন, আর একরূপে মা আনন্দময়ী আমাব সেবা করিতেছে।" মাতার চক্ষে জল ধারা বহিয়া পড়িল। তিনি তদবধি আর সে প্রকার কথা মুখে আনেন নাই। তাঁহার নম্র প্রকৃতি ও উদার স্বভাবের জন্য সকল স্ত্রীলোকেই বশীভূত ছিলেন। পরমহংসদেবের নিকট সর্ব্বদা স্ত্রীলোকেরা অগ্রসর হইতে পারিতেন না তাঁহারা মাতার নিকট আরাম পাইতেন।

আমরা একটী ভৈরবীকে দেখিয়াছি, তিনি কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া পরমহংসদেবের সহিত নানা প্রকার রঙ্গরসের কথা বলিতেন। তাঁহার হাতে ত্রিশূল, এবং ললাটে সিন্দুরের প্রলেপ এবং গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতেন। পরমহংসদেবের সহিত যে সকল কথা কহিতেন তাহা আমরা এক বিন্দু বিসর্গ বুঝিতে পারি নাই। সহজ বাঙ্গালা কথায় কথা কহিতেন, কিন্তু তাহার মাথামুণ্ডু স্থির করিতে আমাদের মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। এই ভৈরবী ভিক্ষা করিয়া খাবার আনিয়া পরমহংসদেবকে খাওয়াইতেন।

আর একটী ভক্ত স্ত্রীলোকের কথা না উল্লেখ করিয়া এ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

করিতে পারিলাম না। পটলডাঙ্গার গোবিন্দ দত্তের কামারহাটীর ঠাকুর বাড়ীতে একটী প্রাচীণা অদ্যাপি আছেন। তিনি পরমহংসদেবকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহার বাৎসল্য রস-প্রধান প্রকৃতি ছিল। তিনি তন্নিমিত্ত পরমহংসদেবকে আহার করাইতে ভাল বাসিতেন। তত্ত্ব কথার বড় একটা এলাকা রাখিতেন না। পরমহংসদেব সম্বন্ধে অতি অদ্ভুত কথা তাঁহার নিকট শুনা গিয়াছে। তিনি বলিতেন যে পরমহংসদেব একটী শিশুর ন্যায় আকার ধারণ পূর্ব্বক হামাগুড়ী দিয়া আমার অঞ্চল ধরিয়া খাবার চায়; না দিলে আঁচল ছাড়িয়া দেয় না। ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা কিরূপে পূর্ণ করিয়া থাকেন তাহা কাহার সাধ্য বলিতে পারে? ভক্ত-ভগবানের লীলা অতি অপূর্ব্ব এবং লোকের গবেশনার অতীত বিষয়। যেমন স্ত্রী পুরুষের লীলা ভুক্তভোগি না হইয়া অনুমান দ্বারা তাহা কাহার স্থির নির্ণয় হইতে পারে না ও কথন কস্মিন কালে হইবার নহে, সেই প্রকার ভক্তবৎসল দয়াময় হরি, ভক্তের প্রাণের কতদূর আকাঙ্ক্ষা তাহা কি রূপে পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন, ভক্তই সে কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারেন। ভক্তের রস ভক্তেই পান করিতে সক্ষম, ভক্তের মহিমা ভক্তেই বুঝিয়া থাকেন, অভক্তের তাহা অধিকার নহে। সেই জন্য গায়ের জোরে উষ্ণ মস্তিষ্কের উত্তেজনায়, আপনার বিষয়াত্মক বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রভাবে ভক্ত কাহিনী পর্য্যালোচনা করিতে যাইলে নিশ্চয় সর্ব্বতোভাবে কু-ফল ফলিয়া থাকে। এই স্ত্রীলোকটী গোপালের মা বলিয়া পরিচিত আছেন।

ইতি পূর্ব্বে আভাষে কথিত হইয়াছে যে পরমহংসদেবের ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই সস্ত্রীক তাঁহার নিকটে গমন করিতেন। পরমহংসদেব সেই সকল ভক্তদিগের বাটীতে আসিলে সুতরাং অন্তঃপুরে যাইয়া আহারাদি করিতেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কুটুম্বদিগের মহিলাগণ আসিয়া জুটিতেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলকে ভক্তিমতি দেখা যাইত না কিন্তু অনেকেই পরমহংসদেবের কৃপা লাভের জন্য লালায়িত হইতেন। এই রূপে ক্রমশঃ স্ত্রীলোক সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছিল। পুরুষ দিগের মধ্যে বিষয়ীরা যেমন আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ, বাজারের শাক মাছ কিম্বা বাটীর চাকর চাকরাণী যেমন খুসীর বিষয়, নিজ নিজ ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন, তাঁহারা মনে করেন ধর্ম্মটাও তদ্রূপ। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই শ্রেণীর সংখ্যা প্রত্যেক পরিবারে শতকরা ৯৮ জনেরও কিছু অধিক হইবার সম্ভাবনা। আমরা

দেখিতাম যে এই স্ত্রীলোকেরা পরমহংসদেবকে দেখিয়া তাঁহাদের স্বভাব সিদ্ধ বিকৃত নাসোত্তলন ভঙ্গিতে কহিতেন, ওমা! ইনি আবার সাধু! জটা নাই, গায়ে ভস্ম নাই, গেরুয়া বসন নাই, এক খানা বাঘছাল সঙ্গে নাই, এ কোন দিশি সাধু! কালে কালে কতই দেখ্‌বো, এই বলিয়া অভিমানের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন। পরমহংসদেব এমনই সুচতুর ছিলেন যে, তিনি বাছিয়া বাছিয়া ভক্ত করিতেন। যে বাটীতে উপরোক্ত প্রকার স্বভাব বিশিষ্ট স্ত্রী কিম্বা পুরুষ অধিক থাকিত তিনি সেই বাটীতে প্রবেশ করিতেন এবং দর্পহারী পরমহংসদেব তাঁহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ঈশ্বরানুরাগ বৃদ্ধি করিয়া দিতেন। যে পুরুষ কিম্বা যে স্ত্রী আত্মাভিমানে পরমহংসদেবকে প্রথমে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাহারাই আরার তাঁহার জন্য পাগল পাগলিনী প্রায় হইয়া গিয়াছিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

ক্রমে পরমহংসদেবের একটী রীতিমত সম্প্রদায় হইয়া উঠিল। এই সম্প্রদায়, সম্প্রদায় বলিলে যে প্রকার বুঝায় সে রূপ নহে। সম্প্রদায়ে এক মতে এবং এক ভাবে সকলেই পরিচালিত হইয়া থাকে, কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট তাহা ছিল না। পূর্ব্বে স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে যে তাঁহার নিকট সকল সম্প্রদায়ের লোকজন যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহারা সকলে পরমহংসদেবকে তাঁহাদের স্ব সম্প্রদায়ের সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া জানিতেন। এই সকল ব্যক্তিগণ সকলে একত্রিত হইলে জনাকীর্ণ হইয়া পড়িত। পরমহংসদেব তাঁহাদের মধ্যস্থলে থাকিলে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখাইত। তিনি যাহা উপদেশ দিতেন কার্য্যে তাহাই দেখাইতে পারিতেন। তিনি বলিতেন, এক ঈশ্বর ভাব অনন্ত, এ স্থানে সেই ভাবের কার্য্যই হইত। এই নানাবিধ ভাবের, ভক্তেরা কোন কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা আপন স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য আসিতেন এবং তাহা পূর্ণ হইয়া যাইলে প্রস্থান করিতেন। কার্য্যকারী ভক্তদিগের মধ্যে ভক্তবীর সুরেন্দ্র নাথ মিত্র, বলরাম বসু, কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র মুস্তফী, দেবেন্দ্র নাথ মজুমদার,

গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অতুল চন্দ্র ঘোষ, মনমোহন মিত্র, কালী দাস মুখোপাধ্যায়, নব গোপাল ঘোষ, কালীপদ ঘোষ, উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্ত শ্রেষ্ঠ মহাত্মারা সকলে মিলিত হইয়া পরমহংসদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে মহোৎসব কার্য্যটী আরম্ভ করিলেন। ভক্তবীর সুরেন্দ্র এই মহোৎসবের প্রস্তাব কর্ত্তা এবং প্রথম বৎসর তিনি নিজ ব্যয়ে তাহা সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়া সকলের তন্দ্রা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন। পর বৎসর হইতে অদ্যাপি সাধারণ ব্যয়ে আবির্ভাব মহোৎসব সমাধা হইয়া আসিতেছে। জন্মোৎসবের দিন পরমহংসদেবের ভক্ত ও অন্যান্য যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন তাঁহাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হইত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ব্যতীত কত রকমের ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইতেন। প্রাতঃকাল হইতে ভক্তদিগের সমাগম আরম্ভ হইত। ত্রৈলোক্য বাবু এবং তাঁহার কর্ম্মচারীরা এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতেন, না করাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যে সকল ব্যক্তিরা তথায় গমন করিতেন তাঁহারা এই উপলক্ষ ব্যতীত কস্মিন কালে সে প্রদেশে যাইতেন কি না সন্দেহ। দশটার পরে পরমহংসদেব স্নানাদি করিতেন, পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইত। এই কীর্ত্তনে যে কি আনন্দ হইত, তাহা বর্ণনা করিবার যদ্যপি প্রভু কর্তৃক কেহ শক্তি লাভ করেন, তিনি ব্যতীত আর কাহার শক্তি নাই; এ ক্ষেত্রে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব,যদ্যাপি তদ্দ্বারা পাঠক পাঠিকারা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইতে পারেন। কীর্ত্তনের রস অক্ষরে (আঁকর) বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরমহংসদেব মধ্যে মধ্যে অক্ষর দিয়া গানটীকে মাতাইয়া আপনি মাতিয়া উঠিতেন, তিনি মাতিলে আর কাহার রক্ষা থাকিত না। ভক্তেরাও বিহ্বল হইতেন। এই মাতান ভাবটীর বাস্তবিক সংক্রামকতা শক্তি ছিল। এক জনের হইলে আর এক জনকে আক্রমণ করিবেই তাহার সন্দেহ নাই। ফলে সেই স্থানের উপস্থিত ব্যক্তিরা কাষ্ঠ পুত্তলের ন্যায় হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। পরমহংসদেবের এ অবস্থায় জ্ঞান থাকিত না তাহা স্থানান্তরেও বলা গিয়াছে। এই সময় উপস্থিত হইবার জন্য বিশেষ ভক্তেরা অপেক্ষা করিতেন। সেই সময়ে তাঁহাকে মনের সাধে সাজান হইত। জনৈক স্ত্রীলোক ভক্ত তাঁহার বস্ত্রখানি চাঁপা ফুলের রং করিয়া দিতেন। আহা! সেই বস্ত্র পরিধান করাইয়া দিলে তাঁহার কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বাহির হইত। গৌরীমা পুষ্পের মালা ও চন্দন আনিয়া দিতেন। যখন সেই মালা গলদেশে শোভা

পাইত, যখন শ্বেত চন্দনের বিন্দু সকল চরণ এবং ললাটে প্রকাশিত হইত, তখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া নয়ন এবং মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। আহা! সে রূপের তুলনা কি আছে? সে রূপ উপমা বিরহিত। সে রূপে যাহার নয়ন একবার ধাবিত হইয়াছে, সে আর প্রত্যাগমন করিতে পারে নাই। যেন রূপের জালে নয়ন-বিহঙ্গী আবদ্ধ হইয়া পড়িত। সে রূপ দেখিলে আর অপরূপ বলিয়া জগতে, দ্বিতীয় বস্তু স্বীকার করা যায় না। তখন মনে হইত, দেখিবার বস্তু বুঝি এত দিনের পর দেখা গেল। যাহা আমরা দেখি, সুন্দর মনোহর বলিয়া দেখি, তাহা সে রূপের নিকট কি সুন্দর বা মনোহর? তুলনা করিব কি? সেরূপ অনুপমের। চাঁদের তুলনা চাঁদ, সূর্য্যের তুলনা সূর্য্য, স্বর্ণের তুলনা স্বর্ণ, তেমনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সে রূপের তুলনা তাঁহা-রই রূপ; তাঁহার তুলানা তাঁহারই নিকট। রূপ দেখিয়া মন ভুলিল, আপনাকে আপনি ভুল হইল, সকলে রামকৃষ্ণময় হইয়া পড়িল। জয় ধ্বনিতে দিক্ কম্পিত হইতে লাগিল, প্রাণের উৎসাহ সূচক ভাব যেন হৃদয় ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। কেহ ঊর্দ্ধ-বাহু হইয়া, কেহ করতালী দিয়া, কেহ ত্রিভঙ্গ ঠামে এবং লম্ফে ঝম্ফে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে কেহ প্রেমে বিহ্বল হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন; কেহ ভক্তের গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন, কেহ আনন্দে অশ্রু বরিষণ করিতে লাগিলেন, কেহ হাসিতে হাসিতে যেন শ্বাস বায়ু পর্য্যন্ত প্রশ্বাস করিয়া ফেলিলেন এবং কেহ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ক্রমে সকলে অর্দ্ধ মৃতপ্রায় হইয়া আসিলেন। আর বাক্য সরে না, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাসে কাশি আসিয়া স্বরভঙ্গ করিতে লাগিল, সকলের গলদ্ঘর্ম্ম ছুটিল, খুলির হস্ত ফুলিয়া উঠিল, সুতরাং সঙ্কীর্ত্তনের বিরাম হইল। শান্তি শান্তি প্রশান্তি আসিয়া সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

পরমহংসদেব ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। অমনি গলার মালা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন, বস্ত্রান্তর্ভাগের দ্বারা ললাটের চন্দন মুছিয়া ফেলিলেন, কিন্তু চরণের চন্দন কখন মুছিতে পারিতেন না। ঠাকুর! ভক্তদিগের নিকট আপনার চতুরালী চলিতে পারে না। সচ্ছন্দে মালা ছিঁড়িলেন, কপালের চন্দন মুছিলেন; এই বার মুছিয়া ফেলুন? অপেক্ষা কিসের? উহাতেও ত রজোগুণের প্রকাশ পাইতেছে; লোকে দেখিতে

পাইতেছে যে, ভক্তেরা পূজা করিয়াছে—মুছিয়া ফেলুন? বলিয়া রসিক ভক্ত-দিগের মনে ইত্যাকার আনন্দোচ্ছ্বাস হইতে লাগিল। তিনি চরণের চন্দন মুছিতে পারিলেন না। পারিবেন কেন? চরণ তাঁহার নয়, তিনি যাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অধিকার কি? ভক্তেরা চরণ পাইয়াছে, সে চরণ তাহাদের হৃদয়ের ধন, সুতরাং তাহার শোভা বিনষ্ট করিতে পারিলেন না।

তিনি তদনন্তর ভক্তদিগের সহিত একত্রে ভোজন করিয়া অশেষ প্রীতি-লাভ করিতেন কিন্তু এরূপ স্থানে তিনি বর্ণানুরূপ ব্যবস্থা করিতে কহি-তেন। যে সকল ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইত, তাহার অগ্রভাগ কেহ পাইত না অথবা কোন দেবদেবীকে নিবেদন করিয়াও দেওয়া হইত না। সমুদয় দ্রব্য গুলি পরমহংসদেবের গৃহে একত্রিত করিয়া তাঁহাকে তাহা দেখান হইত এবং সমস্ত দ্রব্যের অগ্রভাগ তাঁহাকেই প্রদান করা হইত। ভক্তেরা এই প্রকার ভোগের ব্যবস্থা করিতেন।

আজ সে দিন আর নাই। আজ সে রাম নাই, সে অযোধ্যাও নাই। সেই ভক্তগণ আছেন, সেই দক্ষিণেশ্বর, কালী মন্দির ও পঞ্চবটী আছে, সেই আবির্ভাব মহোৎসবও প্রতি বৎসর হইতেছে, কিন্তু সে ভাব কোথায়? সে আনন্দ কোথায়? সে প্রেমের বন্যা কোথায়? সে সকল ফুরাইয়াছে, এ জীবনের মত ফুরাইয়াছে। আর সে দিন আসিবে না, আর তেমন করিয়া বস্ত্র পরিধান করাইয়া মনের সাধ মিটিবে না! আর সে সচন্দন চরণ যুগল দেখিতে পাইব না, আর সে শ্রীমুখের মধুর নাম শ্রবণ বিবরে ঢালিয়া মানব জন্ম সার্থক করিতে পাইব না। কালের স্রোতে সকলই চলিয়া গিয়াছে, কেবল স্মৃতি মাত্র এক্ষণে মৃতপ্রায় দেহকে জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

পরমহংসদেব ধনীদিগকে বড় পছন্দ করিতেন না, তিনি কাঙাল ব্যক্তি-দিগের প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন ছিলেন। একদা আবির্ভাব মহোৎসবের দিন কোন একটী স্ত্রীলোক ৪টী রসগোল্লা লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি মাতা ঠাকুরাণীর নিকট যাইয়া তাহা প্রদান করেন। তথায় অনেকগুলি ভক্ত-স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, তাহারা তদ্দৃষ্টে কহিলেন যে, বাছা, ঠাকুর এখন ভক্তদিগের সহিত মাতিয়াছেন, কেমন করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইবেন, বিশেষতঃ তাঁহার এখন ভোজন হইয়া গিয়াছে, এখন ত আর কিছু খাইবেন না? খাইলে অসুখ হইবে। এই কথা ভক্তের প্রাণে যে কি গুরুতর শেলবৎ বিদ্ধ হইয়া-

ছিল, তাহা ভক্ত ব্যতীত কেহ বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। তাহার চক্ষে জল আসিল এবং মনে হইল ঠাকুর তুমি ত অনাথনাথ! তোমার ভক্তেরা বড়লোক তাহারা অনেক অর্থ-ব্যয় করিয়া মহোৎসব করিতেছে, তুমি তাহাতে আনন্দ করিতেছ; আর আমি দীন হীনা কাঙালিনী। অনেক ক্লেশে আমি চারিটী পয়সা সংস্থান করিয়াছি। কি করিব আমার শক্তি নাই, আমি বুঝিলাম তুমি কাঙালের ঠাকুর নও! যিনি তাঁহাকে ডাকিতে জানেন, যিনি তাঁহার হৃদয় তন্ত্রী টানিতে শিখিয়াছেন, যিনি তাঁহার ডাক-নাম শুনিয়াছেন, তাঁহার ডাকের প্রত্যুত্তর না দিয়া পলাইবার উপায় নাই। পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ আসিয়া রসগোল্লা ভক্ষণ করিয়া যাইলেন। হায় প্রভু! আমাদের এমন অভাজন করি-লেন কেন? আমাদের আপনার সেই নাম, যে নামে ডাকলে আপনি শুনিতে পান, আপনি কথা ক'ন, আপনি আসিয়া ভক্ত প্রদত্ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করেন, তাহা আমাদের দিলেন না। তাহা হইলে আমরা যখন তখন আপনার সহিত প্রাণ ভরিয়া আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া, কথা কহিয়া লইতাম। কি জানি কেন তাহা দেন নাই। ভাল বুঝিয়াছেন যাহা, তাহাই করিয়াছেন, তাহাতে আর আমাদের বক্তব্য কি থাকিতে পারে।

আর একদিন শশী-নামক একটী কুমার ভক্ত (শশী সাক্ষাৎ হনূমানের মূর্ত্তি। অমন সেবা, বলিতে কি বোধ হয় স্বয়ং লক্ষ্মীও জানেন না) পরমহংস-দেবের জন্য এক পয়সার বরফ চাদরের প্রান্তভাগে বাঁধিয়া কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বর লইয়া গিয়াছিল। এক পয়সার বরফ দুই প্রহরের সূর্য্যোত্তাপে চাদরের খুঁটে বাঁধা, প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ পথ, বালক লইয়া গেল, যেমন বরফ প্রায় তেমনি ছিল, পরমহংসদেব সেই বরফ পাইয়া অপরিমিত আনন্দিত হইয়াছিলেন। ভগবান্ ভক্তের বাসনা এইরূপে রক্ষা করিয়া থাকেন।

আর একদিন বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, বরদাকান্ত শিরোমণি ও অপর দুই একটী ভক্ত একত্রিত হইয়া উদ্যানে ভোজের নিমিত্ত পঞ্চবটীর নিম্নে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতেছিলেন। ভক্তেরা নিতান্ত স্বার্থপর জাতি, আপনাদের উদ্দেশ্য সাধন হইলেই হইল। যাঁহার নিকট যাইয়া ঘূর্ণায়মান সংস্কার কুলাল চক্রের বিভীষিকা হইতে অব্যাহতি পাইলেন, যাঁহার কৃপায় কালের বিকট দশনাঘাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন, তাঁহার সমক্ষে অন্ন প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিবেন বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিলেন, কিন্তু সেই মহা-

পুরুষকে তাহা প্রদান করিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করিতে হইবে, এ বুদ্ধি কাহারও ঘটে আইসে নাই। তাই ত বলি, এমন অবস্থা না হইলে রামকৃষ্ণের জন্ম হইবে কেন? পরমহংসদেব স্নানাদি করিয়া পঞ্চবটীতে যাইবা মাত্র সকলে সসব্যস্ত হইলেন। তিনি প্রথমে কি কি পাক হইয়াছে সংবাদ লইলেন। পরে খিচুড়ির কথা শুনিয়া, "তাই ত বড় গরম, আমায় তোমরা অন্ন প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি আহার করিব।" লজ্জায় সকলের মাথা হেঁট হইল, কাহার মুখে আর কথা নাই। সকলে চতুর্দ্দিক্ ধূমময় দেখিলেন। পরমহংসদেব কহিলেন, দেখ আমার ঘরে যে সন্দেশের হাঁড়ি আছে তাহাতে ভাত রাঁধিতে পার। ভক্তদিগের নিকট চাউল ছিল, কিন্তু হাঁড়ি ছিল না তাই তাঁহারা চিন্তা করিতেছিলেন, অমনি কোন ভক্ত সেই হাঁড়ি আনিয়া দিলেন এবং শিরোমণি মহাশয় অন্ন প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। কি বিভ্রাট! সে হাড়িতে সন্দেশ ও চিনি থাকিত, তাহা অগ্নির সংস্পর্শ হইবা মাত্র অমনি ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল এবং ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ হইতে লাগিল। যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল। আজ বিষম পরীক্ষার দিন। যদি প্রভুর আহার না হয়, আজ বুঝিব যে, আমাদের অন্ন চিরদিনের মত উঠিয়াছে। সম্মুখে ভাগিরথী, মা দেখিও! যদি প্রভুর অন্ন ভোজন না হয়, তাহা হইলে এ মুখ যেন লোকালয়ে আর না দেখাইতে হয়। মাগো! তুমি এই পাপিষ্ঠদিগের জন্য একটু স্থান দিও মা! বলিয়া মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগিল। যতই ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ হইতে লাগিল, কথকের শরীর হইতে যেন একসের পরিমাণে শোণিত বহির্গত হইয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে ভাত ফুটিতে আরম্ভ হইল। বেলাও তখন প্রায় দুই প্রহর, একে হাওয়ায় উনুনের তাপ বাহির হইয়া যাইতেছ, তাহাতে হাঁড়ির জল বাহির হইয়া ফোঁস ফোঁস করিতেছে, তাহাতে আবার পরমহংসদেবের আহারের সময় অতীত হইয়া যাইতেছে, কি হইবে ভাবিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। শিরোমণির কথকতার ব্যবসা আছে, তিনি ভাবিলেন, হায় ঠাকুর! এমন করিয়া আমার শাস্তি না দিয়া পূর্ব্ব হইতে বিদায় করিয়া দিয়া কথকদিগের ন্যায় মূর্ত্তিমান কলির রূপ বিশেষ করিয়া রাখিলে আমার সহস্র গুণে ভাল হইত। আমি অপবিত্র, হরিনাম ব্যবসায়ী, আপনি জেনে শুনে কেন এ কলঙ্ক সাগরে নিমগ্ন করিলেন। আমার কলঙ্ক হউক তাহাতে আমি ভীত নহি। কলঙ্কের পসরা যখন মস্তকে লইয়াছি, তখন কলঙ্কে আর ভয় কি? কিন্তু

আমা কর্ত্তৃক যে আজ আপনার আহার হইল না, এই মনস্তাপ যে আর রাখিবার স্থান নাই। কলঙ্ক ভঞ্জন হরি! লজ্জা নিবারণ মধুসূদন! আজ রক্ষা কর—এই বিপদ সাগর থেকে উদ্ধার কর। এই রূপে সকলেই বিমর্ষ হইয়া এক দৃষ্টিতে অন্নের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। পরমহংসদেব কহিলেন, "ভাত হইয়াছে কি?" সর্ব্বনাশ উপস্থিত—অরে বজ্র তুই এখন কোথায়? মস্তকে পতিত হইয়া আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দে, যেন আর একেবারে উত্তর দিবার শক্তি না থাকে। আবার বলিলেন এত দেরি হ'চ্চে কেন? প্রভু! আর না—আর এই ক্ষুদ্র আধার আপনার তাড়না সহ্য করিতে পারে না। আমরা ত দোষ করিয়াছি। প্রভু! আমরা নির্দ্দোষী ছিলাম কবে? যে আজ আমাদের পরীক্ষা করিতেছেন। ক্ষমা করুন, যাহা হয় একটা করিয়া দিন, আমরা নিশ্চিন্ত হই। এই বলিয়া তখন সকলে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি আবার কহিলেন, "এতক্ষণে হয় ত হইয়াছে।" এই কথায় ভক্তদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল। শিরোমণি কি করিবে কাঁপিতে কাঁপিতে একটী অন্ন টিপিয়া দেখিলেন যে, অন্নগুলি সুসিদ্ধ হইয়াছে। তিনি অতি সাবধানে হাঁড়ি হইতে যখন পাত্রান্তরে অন্নগুলি ঢালিলেন, হাঁড়িটীর তলা কুটিকাটার ন্যায় চারি-চির হইয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা সমুদয় জল নির্গত হইয়া যাওয়ায় অন্নগুলি যেন শোলার ন্যায় লঘু বলিয়া দৃষ্ট হইল। পরমহংসদেবের আনন্দের সীমা রহিল না। শিরোমণিকে কহিতে লাগিলেন দেখ, তোমার আরূঢ় ভক্তিতে এই ভগ্ন হাঁড়িতে রাঁধিতে পারিয়াছ; তাহা না হইলে কখনই হইত না। শিরোমণি মনে করিলেন, আর কথায় কাজ নাই, আরূঢ় ভক্তি থাকে থাকুক আর না থাকে নাই থাকুক, কিন্তু এমন পরীক্ষায় আর কখন ফেলিবেন না। আমাদের যদি পরীক্ষা দিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আপনি কি জন্য আসিয়াছেন? যাহারা পরীক্ষা দিতে পারে, তাহারা ত আপন জোরে চলিয়া যায়। শক্তি বিহীন আমরা আপনার শরণাগত—এই বুঝিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই বুদ্ধি দৃঢ় রূপে সংস্কার হইয়া যায়।

পরমহংসদেব এইরূপে দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া নানাবিধ ভক্ত * লইয়া

---

* একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যদিও সকল মতের ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট উপদেশাদি লইতেন; কিন্তু ইহাদের সহিত পরমহংসদেবের মোটের উপর ত্রিবিধ ভাব দেখা যাইত। এক শ্রেণীর ব্যক্তিরা পরমহংসদেবকে গুরু এবং

বিহার করিতেছিলেন, আনন্দের আর অবধি ছিল না। নিত্য নব নব ভাব, নব নব রস ও নব নব উপদেশে মন প্রাণ দেহ যেন পুলকে আর্দ্র হইয়া থাকিত। তখন প্রত্যেক ভক্তের মনে যে কি অপার আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন অবস্থিতি করিত, তাহা এখন স্মরণ করিলে স্বপ্নবৎ জ্ঞান হইয়া থাকে। তখন সমস্ত দিন কিরূপে যে অতিবাহিত হইয়া যাইত, তাহা বুঝা যাইত না। প্রত্যেক রবিবারে এবং ছুটীর দিন লোকে লোকারণ্য হইত? পরমহংস-দেব সকলকে মাতাইয়া তুলিতেন। এতদ্ভিন্ন পরমহংসদেবকে নিভৃতে পাইয়া দুটো প্রাণের কথা কহিতে অনেকেই অবসর অন্বেষণ করিতেন, তাহারা অন্যবারে আসিয়া কার্য্য সাধন করিয়া যাইতেন। এই সময়ে এক দিন সন্ধ্যার সময় ভাবাবেশে বলিয়া ছিলেন, "এখানে যে আসিবে, কেমন করিয়া ঈশ্বর দর্শন ও জ্ঞান ভক্তি পাইব বলিয়া যে আসিবে, তাহারই মনোরথ পূর্ণ হইবে।"

একদিন অপরাহ্নে আমরা তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলাম; পরমহংসদেব একাকী বসিয়াছিলেন, প্রণাম করিয়া আমরা উপবেশন করিলে তিনি কহিলেন, "দেখ আমি মা'কে কহিতেছিলাম যে, আর আমি লোকের সহিত কথা কহিতে পারি না। গিরিশ, বিজয়, কেদার, মহেন্দ্র এবং আর একটী শিষ্যের নাম উল্লেখ করিয়া, এদের একটু শক্তি দে। তাহারা উপদেশ দিয়া প্রস্তুত করিবে, আমি একবার স্পর্শ করিয়া দিব। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া রহিলাম। তখন আমরা তাঁহার এ প্রকার কথার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তিনি যে আমা-দের অকূলে নিক্ষেপ করিয়া পলাইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহা কে জানিতে পারিবে?

ইহার কিছু দিন পরে তিনি গলদেশে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন।

ঈশ্বর বলিতেন। পরমহংসদেব ইহাদের অনেকেরই পরিত্রাণের জন্য বকল্‌মা বা নিজে দায়ী হইয়াছেন। এই ভক্তদিগকে আমরা বিশেষ ভক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তেরা পরমহংসদেব হইতে কোন প্রকার প্রাচীন মতের দীক্ষা লইয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহার সহিত গুরু শিষ্য সম্বন্ধ মাত্র। তৃতীয় শ্রেণীর ভক্তেরা অপর কর্ত্তৃক, যথা কুলগুরু ইত্যাদি, দীক্ষিত হইয়া আপন অভীষ্ট পূরণের নিমিত্ত পরমহংসদেবের সহা-য়তা লইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত পরমহংসদেবের উপগুরু সম্বন্ধ।

প্রথম কয়েক দিন সে বিষয়ে কিছুই মনোযোগ করা হইল না। ক্রমে বেদনা বৃদ্ধি হওয়ায় গলাধঃকরণ করা অতিশয় ক্লেশকর হইয়া পড়িল। কঠিন দ্রব্য আহার করিতে অপারক হইলেন এবং তরল পদার্থ দ্বারা জীবন রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই বেদনা ক্রমে গণ্ডমালায় পরিণত হইল। ইহাদের মধ্যে একটী বিচি স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত হইয়া পাকিয়া উঠিল এবং গলনালিতে ফাটিয়া উহা হইতে পূঁজ নির্গত হইতে লাগিল। চিকিৎসার নিমিত্ত প্রথমে ডাং রাখালদাস ঘোষ কিয়দ্দিবস যাতায়াত করিয়াছিলেন। তিনি অকৃত কার্য্য হইলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিয়া বিশেষ রূপে উপকার করিতে পারিলেন না। রোগের বৃদ্ধি এবং তাঁহার শারীরিক দৌর্ব্বল্য হওয়ায় ভক্তেরা বড়ই চিন্তিত হইলেন। তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইতেছিল, তথাপি কীর্ত্তন করিতে অথবা উপদেশাদি দিতে একদিনও বন্ধ করেন নাই। যে দিন অতিশয় মাতামাতি হইত, সেই দিন রোগের যন্ত্রণাও অত্যন্ত বৃদ্ধি হইত, তজ্জন্য অশেষ প্রকার ক্লেশ পাইতেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাহা ভুলিয়া গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ করিতেন।

যত দিন যাইতে লাগিল ব্যাধিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহার শরীর একেবারে যারপরনাই অসুস্থ হইয়া আসিল। সময়ে সময়ে এত অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব হইত যে, পর দিবস অতি ক্লেশে শয্যাত্যাগ করিতেন। কিছুতেই ব্যাধির উপসম না হওয়ায় আমরা কালীপদ, গিরিশ ও দেবেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে, একজন বহুদর্শী ইংরাজ-ডাক্তারের দ্বারা ব্যাধি নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে আমরা দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া দেখিলাম যে, পরমহংসদেব অতি বিষাদিত ভাবে একাকী বসিয়া আছেন। সেদিনকার ন্যায় অমন হৃদয় বিদারক ভাব ইতি পূর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই। আমরা আনন্দময়ের বিরস বদন দেখিয়া চতুর্দ্দিক শূন্যময় বোধ করিলাম। কি বলিয়া সম্ভাষণ করিব ভাবিয়া অস্থির হইলাম। চলিত সামাজিক কথা, “কেমন আছেন”, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাহাও বলিতে পারিলাম না। কিন্তু তিনি আপনি কহিলেন, গত কল্য প্রায় এক পোয়া রক্ত উঠিয়াছিল। সে সময়টী শ্রাবণ মাসের শেষ, সর্ব্বদাই বৃষ্টি হইতেছিল এবং গঙ্গার জল বৃদ্ধি হওয়ায় বাগানের উপরেও জল উঠিয়াছিল। তাঁহার একে গলনালীর পীড়া তাহাতে অমন বর্ষায় এবং একতলা

আর্দ্রযুক্ত স্থান, তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসাস্থ্যকর জ্ঞান করিয়া আমরা নিতান্ত কাতর হইয়া বলিলাম, যদ্যাপি অনুমতি করেন, তাহা হইলে একটী কথা বলি। তিনি মস্তক নাড়িয়া আদেশ করিলেন। আমরা কহিলাম যে, দিনকত কলিকাতায় যাইয়া যদ্যপি অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে ইংরাজ ডাক্তার দ্বারা আপনার চিকিৎসা করান যায়; এরূপ প্রকারে আর সময় নষ্ট করা উচিত হইতেছে না বলিয়া বোধ হইতেছে। হায়! কি অশুভক্ষণেই সেই কথা আমাদের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল। আমরা যদি তাহা না বলিতাম, হয় ত তাঁহার দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করা হইত না। আমরা অগ্র পশ্চাৎ না বুঝিয়া মনের আবেগে একটা কথা বাহির করিয়া পরিণামে এত যন্ত্রণা, এত মর্ম্মাঘাৎ পাইয়াও তাহার বিরাম হইতেছে না। অথবা কি বলিতে কি বলিতেছি, ইহা তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত তাঁহার আসন পরিবর্ত্তন করা কি এক জন ভৃত্যের কর্ম্ম? কখন নহে। এ প্রস্তাবে তিনি মহা আনন্দিত হইয়া বাগবাজার এবং গঙ্গার সন্নিহিত একটী বাটী ভাড়া লইবার জন্য আজ্ঞা দিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র রামলালকে ডাকাইয়া তখনি পঞ্জিকা দেখিতে বলিলেন। শনিবার বেলা তিনটার পর দিন স্থির হইল। সে দিন বৃহস্পতিবার সুতরাং মধ্যে একটী দিন রহিল। আমরা তৎক্ষণাৎ তথা হইতে কলিকাতাভিমুখে প্রত্যাগমন করিয়া বাগবাজারের রাজার ঘাটের পূর্ব্বগলির ভিতরে একটী নূতন দ্বিতল বাটী ভাড়া লইলাম। পরমহংসদেব শনিবার প্রাতঃকালেই কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন। তিনি ভাড়াটিয়া বাটীতে গমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, "আমাকে কি এরা গঙ্গা যাত্রা করিয়াছে। এ বাটীতে আমি থাকিতে পারি না।" কি কারণে তিনি যে এ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। তিনি তখনি বলরামবাবুর বাটীতে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন।

পরমহংসদেব কলিকাতায় আসিয়াছেন এই কথা প্রচার হইয়া গেল, তাহাতে লোকের সমাগম ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বলরাম বাবুর বাটী যেন উৎসব ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। এখানে আসিয়া তিনি ইংরাজ ডাক্তার দেখাইতে আপত্তি করিলেন; সুতরাং প্রতাপ বাবুই ঔষধ বিধান করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেবের শরীর বালক অপেক্ষা দুর্ব্বল ছিল, তন্নিমিত্ত হোমিওপ্যাথিক একটী দানা সেবন করিলেও তাঁহার শরীর বিকৃত হইয়া যাইত। প্রতাপ বাবুকে বিশেষ সাবধানে ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইত।

বলরাম বাবুর বাটীতে এক পক্ষের অধিক বাস করিবার সুবিধা হইল না। তিনি তন্নিবন্ধন শ্যামপুকুরে শিবু ভট্টাচার্য্যের বাটীতে আসন পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই স্থানে আসিয়া রোগ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইল। প্রতাপ বাবুর অনুরোধে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে আনয়ন করিবার জন্য মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে প্রেরণ করা হয়। ডাং সরকার পরমহংস-দেবকে মথুর বাবুর সময় হইতে জানিতেন এবং এই ব্যাধির চিকিৎসার জন্য একদা তাঁহার শাঁখারিটোলার বাটীতে পরমহংসদেবকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ডাং সরকারকে প্রতাপ বাবু পরামর্শের জন্য আনাইয়াছেন, এই ভাবেই ডাকা হয় এবং তাঁহার ১৬৲ টাকা দর্শনীও সংস্থান করিয়া রাখা হইয়াছিল। পরমহংসদেবকে দেখিয়া ডাং সরকার কহিলেন, "তুমি যে এখানে ?" চিকিৎসার জন্য এরা এখানে আনিয়াছে বলিয়া, পরম-হংসদেব উত্তর করিলেন। ডাং সরকার পূর্ব্বেই তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন; এবারেও অতি যত্ন সহকারে লক্ষণাদি দ্বারা রোগ নিরূপণ করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। তাঁহাকে সেই সময় দর্শনীর টাকা দেওয়া হইল। তিনি টাকা না লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বাটী কাহার ? মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, পরমহংসদেবের ভক্তেরা ভাড়া লই-য়াছে। ডাং সরকার ভক্তের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং বলিলেন, ওঁর আবার ভক্ত কি ? ডাং সরকার তখন পর্য্যন্ত জানিতেন যে, ইনি মথুর বাবুর পরমহংস অর্থাৎ বড়লোকের নানা প্রকার সখের জিনিস থাকে, মথুর বাবুর পরমহংসও সেই ভাবে বলা হইয়াছিল। কিন্তু অদ্য তিনি নূতন কথা শুনিলেন। মথুর বাবুর পরমহংস আর এক্ষণে এক স্থানে সীমাবদ্ধ নহেন। অতঃপর তিনি অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভক্তদিগের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। গুপ্ত মহাশয়ও তাহা ব্যক্ত করিলেন। ডাং সর-কারের পূর্ব্ব সংস্কার দূরীভূত হইয়া আরও উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়া গেল। তিনি যদিও এক জন ঈশ্বর বিশ্বাসী ব্যক্তি বটেন, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রাদি ও দেবদেবী এবং সাধু মহাত্মাদিগের অদ্ভুতশক্তি আদৌ বিশ্বাস করিতেন না এবং বোধ হয় আজও করেন না। বর্ত্তমান শতাব্দীর যে প্রকার পরিমার্জ্জিত ধর্ম্মভাব অর্থাৎ জীবের হিত সাধন করা, তাহা ডাং সরকারের ধারণা ছিল এবং আছে। সে যাহা হউক, তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের নাম শুনিয়া বাস্তবিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। পরমহংসদেব কর্ত্তৃক গিরিশ,

প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে শুনিয়া, যার পর নাই বিমোহিত হইয়া কহিলেন, "ইহা অপেক্ষা হিতসাধন আর কি হইতে পারে? একটী ব্যক্তিকে কুপথ হইতে স্থপথে আনিতে পারিলে, একজনের দায়িত্ব দূর হইতে পারে। পরমহংসদেব সাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি। অতএব আমি টাকা লইব না। মহেন্দ্র বাবু বিশেষ অনুরোধ করায় বলিলেন, পরমহংসদেবের ভক্তেরা ধনী না হইলেও কেহ অক্ষম নহেন, তাঁহারা অর্থ ব্যয় করিবার জন্যই তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়াছেন, আপনি সে জন্য কিছু মনে না করিয়া টাকা গ্রহণ করুণ। ডাং সরকার হাসিয়া কহিলেন, "আমাকেও সেই পাঁচ জনের মধ্যে পরিগণিত করিয়া লউন। আমি বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক চিকিৎসা করিব। যত বার প্রয়োজন হইবে আমি আপনি আসিব। আপনারা মনে করিবেন না যে, আপনাদের সন্তুষ্ট করিতে আসিব, আমার নিজের প্রয়োজন আছে জানিবেন।" পর দিন ডাং সরকার সন্ধ্যার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে দিন তথায় লোকারণ্য হইয়াছিল এবং গিরিশ বাবু প্রভৃতি যাবতীয় ভক্তগণও উপস্থিত ছিলেন। ডাং সরকারের সহিত গিরিশ বাবুর পরিচয় হইল এবং নানাবিধ বিচারাদি হইতে লাগিল। গিরিশ বাবু এবং অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত আলাপ করিয়া ডাং সরকার যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছিলেন। সে দিন ডাং সরকার প্রায় দুই তিন ঘণ্টা তথায় বসিয়াছিলেন।

ডাং সরকার প্রত্যহ দুই প্রহরের পর পরমহংসদেবকে দেখিতে আসিতেন, ব্যাধি সম্বন্ধে কথা কহিয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং গিরিশ বাবু সহিত নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া কোন দিন সন্ধ্যার পর চলিয়া যাইতেন। এই বিচারের সারাংশ এই স্থানে প্রদত্ত হইতেছে।

ডাং সরকারের মত এই যে, মনুষ্য গুরু হইতে পারে না, কেহ কাহার চরণ ধূলি লইতে পারে না। ভাব, সমাধি মস্তিষ্কের বিকার সাকার রূপাদি বা অবতার কখন হইতে পারে না এবং ঈশ্বর অসীম তিনি কদাচ সীমা বিশিষ্ট নহেন। ইত্যাকার গুরুতর বিষয়গুলি লইয়া বিচার হইয়াছিল। যে দিন এই সকল কথা হইল তাহার পরদিন সন্ধ্যার সময় ডাং সরকার প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন এমন সময়ে ভাবের কথা উঠিল। ভাব অর্থে ঈশ্বরের নামে যে অচৈতন্যাবস্থা উপস্থিত হয়, আবার সেই নামে তাহা বিদরিত হইয়া থাকে। ডাং সরকার এপ্রকার ভাব

কখন দেখেন নাই। বলিতে বলিতে একজন অচৈতন্য হইলেন ডাং সরকার তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছেন, এমন সময় আর একটী ভক্ত ঢুলিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিতেছেন, তৃতীয় ব্যক্তির ভাব হইল। এইরূপে এক সময়ে কয়েকটী ব্যক্তি ভাবাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ডাং সরকার বিমুগ্ধ হইয়া কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। ঐশ্বরীক শক্তির বৃত্তান্ত নৈসর্গিক তত্ত্বে যদ্যপি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে ভাবনা কি থাকিত! যাহা হউক ডাং সরকার বোধ হয় সে ঘটনার কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।

চরণ ধূলি গ্রহণ করা সম্বন্ধে গিরিশ বাবুর সহিত তাঁহার নানাবিধ তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। সেই তর্কে ডাং সরকার এতদূর উৎসাহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি পরমহংসদেবের চরণ ধূলি লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবের প্রতি ডাং সরকারের দিন দিন শ্রদ্ধা ও ভক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং এক দিন বলিয়াছিলন যে, এত দিনের পর আমি হৃদয়গ্রাহী বন্ধু পাইয়াছি। আর একটী ভক্তের সহিত ডাং সরকারের অনন্ত এবং খণ্ড সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার হইয়াছিল। ভক্ত কহিয়াছিলেন, পৃথিবীতে কোন্ বস্তু খণ্ড বা সীমা বিশিষ্ট এবং কোন বস্তু অখণ্ড বা অসীম তাহা স্থির করা যায় না। একটী বালুকা কণা—স্থূল দৃষ্টিতে খণ্ড পদার্থ বলা যায় বটে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই অবস্থাটী উহার স্বভাব সিদ্ধ নহে। ভূবায়ুর গুরুত্ব এবং উত্তাপের তারতম্যে পদার্থেরা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ, বালুকাকণা যাহা আমাদের দৃষ্টিতে খণ্ড বলিয়া বোধ হইতেছে; উহা অণুবীক্ষণে প্রকাণ্ড দেখাইবে। বলুকাকণা একটী পদার্থ নহে, উহা দ্বিবিধ পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ পদার্থদিগের পরমাণুরাই সংযোগ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। পরমাণু কথাটীও আনুমানিক এবং অবস্থার কথা। বস্তুতঃ পরমাণুর আয়তন কি কেহ বলিতে পারেন না এবং বলিবারও অধিকার নাই। যদ্যপি পরমাণুর স্থির না হয়, তাহা হইলে তাহার সমষ্টি লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা করা কর্ত্তব্য নহে। ফলে সকল বস্তুই অসীম বলিতে হইবে। ডাং সরকার কোন উত্তর দেন নাই।

একদিন পরমহংসদেব ডাং সরকারের পুত্রটীকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। ডাং সরকার পর দিন তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলেন।

পুত্রটী যাইবামাত্র পরমহংসদেব তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিয়াছিলেন, বাবা! আমি তোমার জন্য এখানে আসিয়াছি, এই বলিয়া তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

শ্যামপুকুরে অবস্থান কালীন ডাং সরকার ব্যতীত অন্যান্য কয়েক জন ডাক্তার এবং কয়েকটী কবিরাজ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু কাহারও দ্বারা রোগের উপসম হইল না। কখন দশ দিন ভাল থাকিতেন এবং কখন রোগ এত অধিক বাড়িয়া উঠিত যে, তাঁহার দেহের প্রতি আর কোন আশা ভরসা থাকিত না। এই স্থানে তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত কয়েকটী ভক্ত এবং একটী ব্রাহ্মণ কন্যা আসিয়া জুটিয়াছিলেন। এই স্ত্রীলোকটী ভক্তিমতী বটে, কিন্তু তাঁহার কিঞ্চিৎ তমোগুণাধিক্য বশতঃ সেবা কার্য্যে বিশেষ ক্রটি হইতে আরম্ভ হইল। মাতাঠাকুরাণী এ পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বরেই ছিলেন। আমরা পরমহংসদেবের চরণ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্মত করিয়া মাতাঠাকুরাণীকে শ্যামপুকুরের বাটীতে আনয়ন করিয়াছিলাম।

পরমহংসদেব সর্ব্বদাই ভক্তগণ বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। ভক্তেরা তাঁহাকে কথা কহিতে নিষেধ করিতেন; কিন্তু তিনি তাহা শুনিতেন না এই স্থানে ভক্ত ব্যতীত বিস্তর ভদ্রলোকের সমাগম হইত।

এই রূপে শ্যামপুকুরের বাটীতে তিন মাস অতিবাহিত করেন। চিকিৎসায় উপকার হউক, আর নাই হউক, প্রচার কার্য্যই বিশিষ্ট রূপে হইত। দিবারাত্র নৃত্য গীত, দিন রাত ঈশ্বরালোচনায় কাটিয়া যাইত। এই স্থানে প্রত্যহই অদ্ভুত ঘটনা দেখা যাইত, সে সকল লিপিবদ্ধ করিতে যাইলে একজনের জীবনে সংকুলান হইতে পারে না। অন্যান্য ঘটনার মধ্যে কালী পূজার দিনের ব্যাপার এই স্থানে বর্ণিত হইতেছে।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে তিনি গুপ্ত ভাবে কহিয়াছিলেন যে, কালী-পূজার দিনটী বিশেষ দিন। সে দিনে মাতার পূজা হওয়া উচিত। গুপ্ত মহাশয় কালীপদ ঘোষের নিকট তাহা ব্যক্ত করেন। কালীপদ গিরিশ বাবুর দলস্থ একজন ব্যক্তি, পরমহংসদেব কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। কালীপদ তদবধি একজন প্রধান ভক্ত মধ্যে পরিগণিত। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি অনুকরণীয়। তিনি পরমহংসদেবের তত্ত্বাবধারক ছিলেন। কালীপদ এই কথা শুনিয়া কালী পূজার রীতিমত আয়োজন করিয়া দিলেন।

দীপ মালায় বাটী আলোকিত করিলেন এবং সন্ধ্যার পর ধূপ, দীপ, ফুল, বিল্বপত্র, গঙ্গাজল এবং সুজি, লুচি ও মিষ্টান্নাদি পরমহংসদেবের সম্মুখে সাজাইয়া দিলেন। চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য। পরমহংসদেবের দুই পার্শ্বে দুইটী মোমের বাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। সকলের সংস্কার ছিল যে, পরমহংসদেব নিজে পূজা করিবেন, কিন্তু কোন প্রতিমা আনয়ন করা হয় নাই। কিছু কাল স্থির ভাবে সকলে উপবেশন করিয়া রহিল। অতঃপর কোন ভক্তের মনে উদয় হইল যে, উনি পূজা করিবেন কি আমরা ওঁকে পূজা করিব। এই ভাবিয়া তিনি গিরিশ বাবুকে সে কথা বলিলেন। গিরিশ একেবারে উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, বলেন কি? আমাদের পূজা গ্রহণ করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছেন? তিনি জয় রামকৃষ্ণ বলিয়া পুষ্পাদি গ্রহণ পূর্ব্বক পরমহংসদেবের পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। পরমহংসদেব আনন্দময়ীর ভাবে সমাধিস্থ হইয়া যাইলেন। তাঁহার সেই নব ভাবে সকলেই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। জয় রামকৃষ্ণ ধ্বনিতে দিক্ সমূহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, নৃত্যের ঘটায় সেই বাটীর ছাদ অসহ্য বোধ করিয়া থাম্ থাম্ শব্দে আত্ম দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সময়ে একটী ভক্ত পরমহংসদেবের ভাবাবসান হইতে দেখিয়া সুজির পাত্রটী সম্মুখে উত্তোলন করিয়া ধরিলেন। পরমহংসদেব তাহা ভক্ষণ করিলেন। তদনন্তর সকল প্রকার মিষ্টান্ন ও তাম্বুলাদি ভক্ষণ করিয়া ভক্তদিগের অপার আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। এই মহাপ্রসাদ লইয়া যে সে দিন কি আনন্দোৎসব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা লেখনীর অধিকার বহির্ভূত। সেবকমণ্ডলীর দ্বারা এই উৎসবটী অদ্যাপি কাকুঁড়গাছীর সমাধি-মন্দিরে যথা নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ক্রমে ব্যাধি বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। অন্নের মণ্ডও গলাধঃকরণ হওয়া দুষ্কর হইতে লাগিল। স্বর ভঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পাইল, এবং শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িল। কোন চিকিৎসাই ফল দায়িনী হইল না। ডাং সরকারের পরামর্শে কলিকাতার বাহিরে বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত চেষ্টা হইতে লাগিল পরমহংসদেবের শারীরিক অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়া পড়িয়াছিল, উঠিয়া এক পদ চলিবার শক্তি ছিল না এবং ক্ষত স্থানে বেদনা উপস্থিত হইত। কিন্তু স্থান পরিবর্ত্তন করা অনিবার্য্য হইয়াছিল। বাটী ওয়ালারাও সেই সময় বাটী ছাড়িয়া দিবার জন্য বড় বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু করা যায় কি?

কোন্ বাটীতে যাইবেন, জিজ্ঞাসা করিলেও বলিবেন না। পরমহংসদেবের অভিমত হইবে, এমন বাটী কোথায়, তাহা কেহ জানে না। এই রূপ নানাবিধ ভাবিয়া তাঁহার জনৈক সেবক কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, প্রভু! কোন্ দিকে বাটী অনুসন্ধান করা যাইবে। পরমহংসদেব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, আমি কি জানি। সেবক, সে সময়ে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, প্রভু! আমাদের সহিত এখন আপনার এই ভাব। বলে দিন কোন্ দিকে যাইব। অনর্থক ঘুরাইয়া মারিবেন না। সেবক প্রকাশ্যে বলিলেন, কাশীপুর বরাহনগর অঞ্চলে অন্বেষণ করিব; তিনি ইঙ্গিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ সেই সেবক তথায় যাত্রা করিলেন এবং মহিম চক্রবর্ত্তী নামক তাঁহার জনৈক ভক্তের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করায় একটী সুবৃহৎ উদ্যানের অনুসন্ধান বলিয়া দিলেন। পরে উদ্যান স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৮০ টাকা মাসিক ভাড়া ধার্য্য হইয়া তিন মাসের জন্য ঐ উদ্যানটী আবদ্ধ করা হইল। যে দিবস বাটী ভাড়া হইল, সেই দিবসেই পরমহংসদেব তথায় গমন করিয়াছিলেন। স্থান পরিবর্ত্তন করায় তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ উপকার হইয়াছিল। গলার ক্ষত আরোগ্য প্রায় হইয়া বিশেষ বল পাইয়াছিলেন। তিনি উপর হইতে নামিয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ডাং সরকার একদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং উদ্যানের চারিদিক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের কি দুরদৃষ্ট! পীড়া পুনরায় প্রবল বেগে আক্রমণ করিল। এবার বহুবাজার নিবাসী রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্রমাগত তিন চারি মাস ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোন ফল দর্শাইতে পারিলেন না। রাজেন্দ্র বাবু নিরস্ত হইলে বৃদ্ধ নবীন পালকে আহ্বান করা হইল। নবীন পালের ঔষধ ক্রমান্বয়ে কিছু দিন চলিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে অন্যান্য ডাক্তারেরাও আসিয়া দেখিতেন। যখন দেখা গেল যে কাহার দ্বারা কোন প্রকার উপকার হইতেছে না, তখন পরমহংসদেবের সম্মতি ক্রমে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সর্ব্বপ্রধান ডাং কোট্স্ সাহেবকে একবার দেখান হয়, তিনি তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসাতীত বলিয়া ব্যক্ত করেন।

যদিও এতগুলি ইংরাজী চিকিৎসক এবং কবিরাজ মহাশয়েরা তাঁহাকে দেখিলেন, কিন্তু রোগটী কি তাহা প্রকৃত পক্ষে কেহ স্থির করিতে পারিলেন

না। কেহ কণ্ঠরোগ বলিলেন, কেহ গণ্ডমালা এবং কেহ ক্যান্সার বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। মধ্যে মধ্যে ঐ অন্তর্ক্ষত শুষ্ক হইয়া স্ফোটকাকার ধারণ করিত, তাহাতে তিনি অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করিতেন। এমন কি কথন কথন এই স্ফোটক এত বিস্তীর্ণ হইত যে, তদ্দ্বারা শ্বাস ক্লেশ উপস্থিত হইত। যত দিন উহা বিদীর্ণ হইয়া না যাইত, ততদিন আর কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। সে সময়ে আহার বন্ধ হইয়া যাইত। একপোয়া দুগ্ধ সেবন করাইলে এক ছটাক উদরস্থ হইত এবং অবশিষ্টাংশ বাহির হইয়া পড়িত। এমন সূত্রবৎ লাল নির্গত হইত যে, সে সময় কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারিতেন না। কিয়ৎদিন পরে এই স্ফোটক বহির্দ্দিকে ফাটিয়া পুঁজ বহির্গত হইতে লাগিল। তাহাতে সাময়িক কিঞ্চিৎ সুস্থতা বোধ করিতেন বটে, কিন্তু রোগের বিক্রম কিছুই কমিত না। এই নিদারুণ রোগের যন্ত্রণা তিনি হাস্যাননে সহ্য করিয়াছেন। এক দিন বিমর্ষ অথবা চিন্তিত হন নাই। যখনই যে গিয়াছে তাহাদের সহিত ঐশ্বরীক বাক্যালাপ করিয়াছেন। লোকে ব্যাধির বিভীষিকা দেখাইলে তিনি হাসিয়া উঠিতেন এবং বলিতেন, "দেহজানে দুঃখজানে, মন তুমি আনন্দে থাক।" কোন ব্যক্তির নিকট তিনি রোগের কথা কহিয়া চিন্তাকুল হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার মনোগত ভাব ছিল না।

শশধর তর্কচূড়ামণি পরমহংসদেবকে কতবার অনুরোধ করিয়াছিলেন যে সমাধির সময় ক্ষত স্থানে কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিলে তৎক্ষণাৎ উহা আরোগ্য হইয়া যাইবে। পরমহংসদেব সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "সমাধি করিয়া রোগ আরোগ্য করিতে হইবে? এ অতি রহস্যের কথা।"

পরমহংসদেব যৎকালে দক্ষিনেশ্বরে ছিলেন তিনি একদিন কহিয়াছিলেন যে আমি যখন যাইব সেই সময়ে প্রেমভাণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইব, এই কথা আমাদের শ্রবণ করা ছিল। ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখ উপস্থিত হইল। সে সময়ে তিনি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সুস্থ ছিলেন। ছুটির দিন বলিয়া সে দিন ঐ উদ্যানে অনেক লোকের আগমন হইয়াছিল।

পূর্ব্ব সপ্তাহে তাঁহার কোন সেবক হরিশ মুস্তফীর পরিত্রাণের জন্য পরমহংসদেবের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে দিবস তিনি কোন উত্তর দেন নাই। ১লা জানুয়ারির দিন হরিশ বাবু পরমহংসদেবের

নিকটে গমন করিবামাত্র তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। হরিশ আনন্দে উন্মত্তের ন্যায় অশ্রুপূর্ণ লোচনে নিম্নে আসিয়া উপরোক্ত সেবককে কহিলেন, ভাই রে! আমার আনন্দ যে ধরে না? এ কি ব্যাপার! জীবনে এমন ঘটনা এক দিনও দেখি নাই। সেবকের চক্ষেও জল আসিল। তিনি কহিলেন, ভাই! প্রভুর অপূর্ব্ব মহিমা।

সকল ভক্তগণ একত্রে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পরমহংসদেব দেবেন্দ্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দেবেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন রাম যে আমায় অবতার বলে, এ কথাটা তোমরা স্থির কর দেখি? কেশবকে তাহার শিষ্যেরা অবতার বলিত। তিনি কেন যে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কারণ কে বলিতে পারেন? সে ক্ষেত্রে কেহ তাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। অপরাহ্ন কালে ভক্তেরা বাগানে বেড়াইতেছেন। এমন সময়ে দেখিলেন যে, পরমহংসদেব সেই দিকে আসিতেছেন। ভক্তেরা সকলে আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই দিনকার রূপের কথা স্মরণ হইলে আমরা এখনও আশ্চর্য্য হইয়া থাকি। তাঁহার সর্ব্বশরীর বস্ত্রাবৃত এবং মস্তকে সবুজ বনাতের কাণ ঢাকা টুপি ছিল, কেবল মুখমণ্ডলের জ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইয়াছিল। মুখের যে অত শোভা হইতে পারে, তাহা কাহার জ্ঞান ছিল না। সেইরূপ আর এক দিন ইতি পূর্ব্বে নবগোপাল ঘোষের বাটীতে সঙ্কীর্ত্তনের সময় দেখা গিয়াছিল। তিনি নিকটে আসিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি আর কি তোমাদের বলিব? আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক। এই বলিতে বলিতে তাঁহার ভাবাবেশ হইল। ভক্তেরা পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক জয় রামকৃষ্ণ! বলিয়া তাঁহার চরণে অঞ্জলী প্রদান করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ পুষ্প গুলি উর্দ্ধে নিক্ষেপ করায় যেন, পুষ্প বৃষ্টির ন্যায় দেখাইতে লাগিল; সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। পরমহংসদেব কিঞ্চিৎ ভাবাবসান করিয়া অক্ষয়কুমার সেনের বক্ষে হস্তার্পণ করিলেন। তাঁহার শরীর হইতে যেন, প্রেমের বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইল। অক্ষয় বাবু বিভোর হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তৎপরে নবগোপাল ঘোষ, তাহার পর উপেন্দ্রনাথ মজুমদার, তাঁহার পর রামলাল চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার পর অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, তাঁহার পর গাঙ্গুলী, ইত্যাদি

কয়েক জনের পরিত্রাণ হইলে হরমোহন মিত্রকে সম্মুখে আনয়ন করা হইল। তিনি হর মোহনকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন তোমার আজ থাক। (ইতি পূর্ব্বে হরমোহনের নিমিত্ত আর একবার পরমহংসদেবের নিকট কৃপা প্রার্থনা করা হইয়াছিল; কিন্তু সেবারেও তিনি "এখন থাক" বলিয়াছিলেন) এই বলিয়া তিনি গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। ভক্তদিগের সে দিন আনন্দের আর অবধি ছিল না, কিন্তু হায়! কে জানিত যে, এই তাঁহার শেষ অভিনয়। কে জানিত যে, আর আমাদের প্রেমদাতা রামকৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করিবেন না। তখন আমরা ছন্দাংশেও জানিতে পারি নাই, অথবা একথা মনে উদয় হয় নাই যে, এই সেই পূর্ব্ব কথিত প্রেমভাণ্ড ভঙ্গ করিবার দিন ফুরাইয়া গেল! তখন ত আমরা আভাষেও জানিতে পারি নাই যে, পরমহংসদেব লীলা-রহস্য পরিসমস্ত করিয়া আনিলেন। মনের কত আশা, কত ভরসা, কত হবে, কত দেখ্‌বো, সে সকল যে এক কথায় সম্পূর্ণ করিয়া দিবেন, তাহা কেহ আমরা স্বপ্নেও দেখিতে পাই নাই, কখন কল্পনায়ও ভাবি নাই। আমরা আনন্দ করিয়া লইলাম, আমাদের স্বার্থ চরিতার্থ হইল, শান্তি আসিয়া সকলকে অধিকার করিল, সে দিনকার রঙ্গ-ভূমির যবনিকা পড়িয়া গেল।

তাহার পর আর তাঁহাকে সেরূপ অবস্থায় দেখা যায় নাই, রোগের ক্রম ক্রমাগত বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। কথিত হইয়াছে যে, আহার কমিয়া গিয়াছিল; সুতরাং ক্রমশঃ দেহের মাংস বসা শোষিত হইয়া কেবল চর্ম্মাচ্ছাদিত অস্থি ক'খানি অবশিষ্ট ছিল মাত্র। এক দিনের শোণিত স্রাবের কথা মনে হইলে অদ্যাপি অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। এত শোণিত বহির্গত হইত; কিন্তু তথাপি সে সময়ে কখন বিমর্ষযুক্ত হইতেন না বরং কত রহস্য করিতেন।

এই সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত সন্ন্যাসী ভক্তদিগের মধ্যে রাখাল, যোগেন, শশী বাবু রাম লালটু শরৎ এবং গোপাল প্রভৃতি কয়েক জন সেবা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সকলেই প্রাণপণে সেবা করিয়াছেন; তাহার বিরুদ্ধে কে কহিবে? তাঁহাদের সেবাই ধ্যান, সেবাই জ্ঞান, মনঃপ্রাণ যেন সেবাতেই নিমগ্ন ছিল। তাঁহারা সংসার সুখ এক দিকে কাকবিষ্ঠাবৎ জ্ঞান করিয়া, অপর দিকে প্রভুর সেবাই সংসারের একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করিয়া আত্ম নিবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু শশীর সেবা তুলনা রহিত এবং অনুকরণীয়। যদ্যপি সেবা বলিয়া সংসারে কোন কথা থাকে, তাহা হইলে শশীই তাহা

জানিত, যদ্যপি কাহাকেও সেবাৎ বলিয়া কহা যায়, তাহা হইলে শশী-কেই সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া কহা যাইবে? যদ্যপি অহৈতুকী ভক্ত কেহ দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি শশীকে আদর্শ দেখিবেন। শশীর গুণই সব, দোষ নাই; তবে মনুষ্য নির্দ্দোষী হইতে পারে না এইটী প্রবাদ আছে। বিনা বিচারে, বিনা স্বার্থপক্ষে দৃষ্টি রাখিয়া, বিনা বাক্‌বিতণ্ডায়, এক মনে পরমহংসদেবের সেবা করিত? ইহাকে যদ্যপি দোষ কহা যায়, এইটী তাহার দোষ ছিল। হনুমানের দাস্য ভক্তি আমরা শ্রবণ করিয়াছি; শশী দাস্য ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। অমন ভক্ত-চূড়ামণি আমরা পরমহংসদেবের একটী ভক্তকেও দেখি নাই। একথা আমরা অতিরিক্ত বলিতেছি না। যে কেহ পরমহংসদেবের নিকট গিয়াছেন, সকলেই একটা স্বার্থের সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন। কিসে পরিত্রাণ হইব, কিসে সাধন ভজন হইবে, কিসে যোগমার্গ পরিভ্রমণ করিতে সক্ষম হইব, এইরূপ একটা না একটা ভাব সকলেরই ছিল। শশী সে বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সে নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রভু সেবা, আত্ম-নিবেদন করিয়া প্রভু সেবা করিতে শিখিয়া-ছিল; তাহা জীবনে সাধন করিয়া নিজে কৃতার্থ হইয়াছে এবং যে কেহ শশীর এই দাস্য ভক্তির উপাখ্যান শ্রবণ করিবে তাহার সেই ভক্তি লাভ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। শশী! তুই ভাই ধন্য! তুই যথার্থ সেবা শিক্ষা করিয়াছিলি? পৃথিবীর সারধর্ম্ম, সারাৎসার কর্ম্ম গুরুসেবা! যদি দেখিবার কিছু থাকে, তাহা শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্ম! যদ্যপি করিবার কিছু থাকে তাহা শ্রীগুরুর শ্রীচরণ বন্দনা, এবং যদ্যাপি শ্রবণ করিবার কিছু থাকে, তাহা শ্রীগুরুর গুণ-গাথা! শশী তুই তা করিয়াছিস্? প্রাণ ভরিয়া, আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া করিয়াছিস্! কখন মনে হয়, তুই বুঝি জন্মান্তরে সেবা করিবি বলিয়া পঞ্চ-তপা করিয়াছিলি—অথবা গলা কাটিয়া শোণিত দান করিয়াছিলি, তাই প্রভু তোর জন্যে উৎকট ব্যাধি গ্রস্থ হইয়া সেবা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তোর নিকট জড়বৎ শয়ন করিয়া-ছিলেন। তুই ভাই মানব দেহ ধারণ করিয়া প্রকৃত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিয়া-ছিলি, তুই সেই নিমিত্ত প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র। তাঁহার দয়াতে তুই আজ সেবক মণ্ডলীর শিরোমণি। প্রভু যেমন আমাদের গুরু—গুরু বলিয়া স্পর্দ্ধা জ্ঞান হয়, তেমনি তুই তাঁহার সেবক। পরিচয় দিবার যোগ্য পাত্র তুই অদ্বিতীয়।

মাতা ঠাকুরাণী যদিও নিকটে ছিলেন, কিন্তু সেবার জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইত না। শশী সকল দিকে দৃষ্টি রাখিত। অন্যান্য সন্ন্যাসী ভক্তেরা পরমহংসদেবের সেবায় আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের জপ-তপ করিবার বড় বাসনা হইয়াছিল। কখন কৌপীন পরিয়া চিম্‌টে লইয়া গাত্রে ভস্ম মাখিয়া সন্ন্যাসী সাজিতেন, কখন ধূনি জ্বালাইয়া অগ্নির উত্তাপ সম্ভোগ করিতেন, কখন উপবাসাদি নিয়ম করিয়া দিন যাপন করিতেন, শশীর এ সকল কিছুই ছিল না।

পরমহংসদেব নাকি কয়েকটী সন্ন্যাসী ভক্তদিগকে ভিক্ষা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই জন্য মধ্যে মধ্যে ভিক্ষা করিতে যাইতেন। তিনি সন্ন্যাসী ভক্তদিগের কথা গৃহী ভক্তদিগকে বলিতেন না এবং গৃহী ভক্তদিগের কথা সন্ন্যাসীদিগকে বলিতেন না। কিন্তু কখন কখন উভয় পক্ষের নিকট উভয় পক্ষের দোষ বলিয়া দিতেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে শাসন করিতেন। এই রূপে এই উভয় শ্রেণীদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ বৈরীভাব ছিল এবং অদ্যাপিও আছে।

এই কাশিপুরের উদ্যানে পরমহংসদেব আট মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তথাকার যাবতীয় ব্যয় গৃহী ভক্তেরা সরবরাহ করিতেন।

পরমহংসদেবের অবস্থা দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। যখন আহার কমিয়া গেল, যখন উত্থান শক্তি রহিত হইল, যখন একেবারে স্বর ভঙ্গ হইয়া গেল, তখন অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। অনেকেই মনে করিলেন যে, আর রক্ষা নাই। চেষ্টার ত্রুটী কিছুই হইল না, ডাক্তারী, কবিরাজী, অবধৌত, টোট্‌কা প্রভৃতি সকলেরই সাহায্য লওয়া হইয়াছিল কিন্তু কিছুই হইল না। কোন কোন ভক্ত স্ত্রীলোক তারকনাথের সোমবার করিতেন এবং নারায়ণের চরণে তুলসী দিতেন, কোন ভক্ত তারকনাথের চরণামৃত ও বিল্ব পত্রাদি আনাইয়া ধারণ করাইলেন এবং কেহ হত্যা দিয়াছিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইয়া গেল, সুতরাং সকলের আশা ভরসা আর কিরূপে থাকিতে পারিবে? পরমহংসদেবের নিকটে কত বার ভক্তেরা কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন যে, আপনি নিজে না আরোগ্য হইলে কেহ ব্যাধির শান্তি বিধান করিতে পারিবেন না। তিনি হাসিয়া কহিয়াছিলেন, শরীরটা কাগজের খাঁচা, আর গলায় একটা ছিদ্র হইয়াছে দেখিতে পাই। ইহার জন্য আবার করিব কি? এইরূপে সকল কথা উড়াইয়া দিতেন।

ক্রমে শ্রাবণ মাস অতীত প্রায় হইল। ৩১ শে শ্রাবণ পূর্ণিমা রবিবার। প্রাতঃকালে তিনি কোন ভক্তকে ডাকাইয়া পঞ্জিকা দেখিতে কহিলেন। ৩১ শে শ্রাবণের সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া যেই ১লা ভাদ্র মাসটী তাঁহার কর্ণগোচর হইল, অমনি তাহাকে চুপ করিতে কহিলেন। সেই দিন কেমন এক রকম হইয়া উঠিয়াছিলেন। অপরাহ্ণের কিঞ্চিৎ পরে নবীন পাল ডাক্তার পুনরায় উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেব কহিলেন; আজ আমার বড় ক্লেশ হইতেছে, দুইটী পার্শ্ব যেন জ্বলিয়া উঠিতেছে। বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন। নাড়ী দেখিয়া ডাক্তারের চক্ষু স্থির হইল। পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন উপায় কি? ডাক্তার কি বলিবেন ভাবিয়া অজ্ঞান হইলেন, কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। পরমহংসদেব পুনরায় কহিলেন, কিছুতেই কিছু হইতেছে না। রোগ দুঃসাধ্য হইয়াছে? ডাক্তার "তাই ত" বলিয়া অধোবদন হইলেন। পরমহংসদেব দেবেন্দ্রকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক তুড়িয়া দিয়া কহিলেন, এরা এত দিন পরে বলে কি? রোগ আরোগ্য হইবে বলিয়া আমায় চিকিৎসা করাইতে আনিয়াছে। যদি রোগই না সারে, তবে বৃথা কেন এ যন্ত্রণা? তিনি রোগের কথা কিম্বা ডাক্তারের কথা আর মুখে আনিলেন না। অতঃপর তিনি কহিতে লাগিলেন দেখ আমার হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল ভাত খাইতে ইচ্ছা হইতেছে। দেবেন্দ্র ছেলে ভুলাইবার মত কত কি বলিল, কিন্তু তাঁকে ভুলাবে কে!

সে রাত্রে সুজি ও দুগ্ধ অপর দিনের অপেক্ষা সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং সুখে প্রায় রাত্র ১টা পর্য্যন্ত নিদ্রিত ছিলেন। ১টার পূর্ব্বে উঠিয়া বসিলেন এবং সুজি ভক্ষণ করিলেন। সুজি ভক্ষণানন্তর, ১টা ৬ মিনিটের সময় তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া যাইলেন। ভক্তদিগের প্রাণ পূর্ব্ব হইতে কেমন বিকৃত হইয়াছিল, তাঁহার সমাধিস্থ হওয়ায় সকলেরই আতঙ্ক হইল। তাহাদের প্রাণ হু হু করিতে লাগিল এবং যেন সে গৃহ শূন্যময় বোধ হইল।

অমন পূর্ণিমার রাত্রি, বিশেষতঃ সেই দিন পাইকপাড়ার কাশিপুরের ঠাকুর বাটী হইতে কাঙ্গালী বিদায় হইতেছিল, তজ্জন্য ঐ স্থান দিয়া সমস্ত রাত্রি লোকজন যাতায়াত করিতেছিল, কিন্তু ভক্তদিগের হতাশ বিভীষিকা আসিতে লাগিল। তাঁহারা নিশ্চয় মহা-সমাধি বলিয়া জ্ঞান করিলেন।

সে রাত্রে আকাশে নানাবিধ পরিবর্ত্তন ও চন্দ্রমণ্ডল দেখা গিয়াছিল। এই বিষম সমাচার রজনীযোগেই অধিকাংশ স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল এবং সেবকগণ সকলেই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এ দিকে কাল রাত্র বিদায় হইল। ১লা ভাদ্রের প্রাতঃ সমীরণ রামকৃষ্ণ মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, এই বার্ত্তা ঘরে ঘরে কাণে কাণে প্রদান করিল। যে সংবাদ কেহ প্রত্যাশা করেন নাই, যে সংবাদ পাইবার জন্য কেহ প্রস্তুত ছিলেন না, আজ সেই অভাবনীয়, অচিন্তনীয় সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। হায় রে! এ ত সংবাদ নহে, এ যে বজ্রাঘাত, বজ্রাঘাত অপেক্ষাও কঠিন। বজ্রাঘাতে প্রাণ যায়, তাহাতে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না, কিন্তু এর আঘাত বজ্রের ন্যায়,—কিন্তু প্রাণ বহির্গত না হওয়ায় যন্ত্রণার বিরাম হয় না। যেমন তাঁহার সহিত নিত্য নব নব আনন্দ সম্ভোগ হইয়াছিল, এখন তেমনি নব নব বিরহ জ্বালা সমুত্থিত হইয়া দেহ দাহ করিতে লাগিল। যখনই মনে হয় যে, তিনি আর নাই, আর তাঁহার আদর পূর্ণ অমিয়বৎ কথা শুনিতে পাইব না, নিকটে যাইলে আর তিনি তেমন করিয়া বসিতে বলিবেন না, বিষয় সন্তাপে উত্তাপিত হইয়া যাইলে আর তিনি শান্তি বারি প্রদান করিবেন না, আর তিনি আমাদের লইয়া সংকীর্ত্তনে মাতিবেন না, আর তাঁহার অপূর্ব্ব নৃত্য দেখিতে পাইব না, আর তাঁহার বদন বিনিঃসৃত হরিনাম ধ্বনি শুনিতে পাইব না। হায় হায়! আমাদের কি হইল! কেন এমন সর্ব্বনাশ হইল! আর কাহার কাছে যাইব, কোথায় গিয়া প্রাণ মন শীতল করিব। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর হিল্লোলে পড়িয়া পথ হারা হইয়া যাঁহার চরণ কৃপায় স্থির হইতে পারিয়াছিলাম, আজ তিনি কোথায়? আমাদের অকূলে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন? কুল-বালারা যাহাদের কেহ কখন চন্দ্র সূর্য্য দেখিতে পায় নাই, তাহারা পর্য্যন্ত কুলের মস্তকে পদাঘাত করিয়া জন্মের মত সেই রামকৃষ্ণ মূর্ত্তি দর্শনের জন্য রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। আর ভয় নাই, আর লজ্জা নাই, এখন কুল মান যেন জলাঞ্জলি দিয়া রামকৃষ্ণ গুণ-সাগরে লম্ফ প্রদান করিল। কোন সেবিকা, প্রভুকে শেষ দেখা দেখিয়া আসিবার জন্য তাঁহার স্বামীর অনুমতি চাহিয়াছিলেন, তাঁহার স্বামী কোন উত্তর করিতে পারেন নাই। কি বলিবেন? এক দিন যে সহধর্ম্মিণীকে স্বামী যাহা স্ত্রীকে কদাপি প্রদান করিতে সমর্থ হয়, এমন অমূল্য রত্ন, রত্নের বিনিময়ে যে রত্ন লাভ হয় না, হইবার নহে, তাহাও

দিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহাকে কি দেখাইতে লইয়া যাইবেন! এই ভাবিয়া উত্তর দিলেন না। আর যদিই তাঁহাকে দেখিবার সাধ হইয়া থাকে, এ জন্মে ত আর সে রূপ দেখিতে পাইবে না, আজ সেই রূপ চির দিনের জন্য পঞ্চীকৃত করা হইবে; কিন্তু যাইলেও ত দেখিতে পাইবে না। ভক্তেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে, এই ভাবিয়া নিরুত্তর ছিলেন। যাহার প্রাণ উচাটন হয়, যাহার প্রাণ যে কার্য্যে ধাবিত হয়, মন কি তাহার গতি রোধ করিতে পারে? সেবিকা শুনিল না—সে যথা সময়ে আপনি যাইয়া উপস্থিত হইল।

নেপাল রাজ-প্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এই হৃদয় ভেদী সংবাদ প্রাপ্ত হইবা মাত্র প্রাতঃকালেই তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, যদিও তাঁহার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত ও কঠিন হইয়াছে এবং চক্ষু স্থির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহার মেরুদণ্ড উষ্ণ রহিয়াছিল। তিনি এই লক্ষণ দ্বারা মহা-সমাধি বা মৃত্যু কহিলেন না। তাঁহার এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক ডাং সরকারকে আহ্বান করা হইয়াছিল। তিনি আসিয়া মৃত্যু স্থির করিলেন। এক্ষণে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। ভক্তেরা তখন একে দিশেহারা পথিকের ন্যায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞান বিবর্জ্জিত বাতুল প্রায়, তাঁহারা এই ভব জলধির মধ্যস্থলে দেহ তরীর কর্ণধার বিহীন হইয়া স্রোতের আকর্ষণে ইতস্ততঃ বিঘূর্ণিত হইতেছিলেন। তাঁহাদের জীবন মরণের একমাত্র সহায়, সম্পত্তি, সম্বল, জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, গুরু শাস্ত্র বন্ধু অভাব জনিত কর্ত্তব্য বিমূঢ় প্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ের পূর্ণ শশধর সহসা কাল মেঘাবৃত হইয়া সর্ব্বতোভাবে তমসাচ্ছন্ন করিয়াছিল; সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা এ গুরুতর বিষয় মীমাংসা হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। এমন কি অনেকে তাঁহাকে কি দেখিব, কেমন করিয়া দেখিব ভাবিয়া নিকটেই যাইতে পারিলেন না। তাঁহারা এই বিপদ কাহিনী সাধারণকে বিজ্ঞাপন করিলেন। যে খানে যে কেহ ছিলেন, সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোকে লোকারণ্য হইল। তৎকালে কয়েকটী সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পরমহংসদেবের মহা সমাধি সাব্যস্থ করিয়া যান। তাঁহাদের কথাই বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা হইলেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হইয়াছিল।

পরদিন পাঁচ ঘটিকার সময় দ্বিতল গৃহ হইতে মহা-সমাধিস্থ মহাপুরুষের শরীর বাহিরে আনয়ন পূর্ব্বক এক বিস্তীর্ণ পর্য্যঙ্কোপরে উপবেশন করাইয়া আর্দ্র বস্ত্রে অঙ্গ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইল। তদনন্তর পীতাম্বর পরিধান

করাইয়া শ্বেত চন্দন দ্বারা সর্ব্ব শরীর আবৃত করা হইল। শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া আজ বর্ষাধিক কাল, চন্দন দেওয়া হয় নাই, অদ্য মনের সাধে জন্মের মত চন্দন পরান হইল। গলদেশে ফুলের মালা, মস্তকে ফুলের চূড়া, কটিদেশে ফুলের বেড়া, চরণে ফুলের নূপুর। প্রভু আমার আজ যেন ফুল, শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। পালঙ্ক খানি ফুলের মালায় সুশোভিত করিলে, ভক্ত মণ্ডলীসহ ফটোগ্রাফ্ লওয়া হইল। প্রভুর সে দিনের শোভা কত হইয়াছিল, তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনি তাহার পক্ষপাতা হইয়াছেন। এমন সময় ভক্তবীর সুরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বাটী হইতে পুষ্প ও বিল্বপত্র লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি সরোদনে কহিলেন, গুরু-দেব! আজ আপনাকে এই অবস্থায় দেখিতে হইল! আর বলিব কি? সকল আশা ভরসা আপনার সহিত বুঝি শেষ হইল, এ পাপিষ্ঠের এই শেষ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করুন, বলিয়া তাঁহার চরণে পুষ্প বিল্বপত্রাদি প্রদান করিলেন।

৬টার পর মৃদঙ্গ করতাল সহকারে হরিনাম সংকীর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে জাহ্নবীতটে আনা হইল। পথিমধ্যে হাহাকার রবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। এই সময় বৃষ্টিবারি পতিত হওয়ায় অনুমান হইয়াছিল যেন, তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া রামকৃষ্ণ পতিত পাবন রূপে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার অকালে দেহ ত্যাগে অগতিদিগের গতি হইবে না ভাবিয়া স্বর্গের দেব দেবীগণ নয়ন ধারা দ্বারা তাঁহাদের মনদুঃখ জানাইয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নে চিতা প্রস্তুত হয় এবং রামকৃষ্ণের দেহ তদুপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক অগ্নি সংস্কার করা হইয়াছিল। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল সেই ক্ষেত্রে তৎকালোপযুক্ত গান করিয়াছিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে চিতা সকার্য্য সাধন করিয়া লইল। যখন চিতানল পূর্ণ প্রভাবে জ্বলিতে ছিল সেই সময় ঠিক চিতার উপর পুষ্প বৃষ্টি হইয়াছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে রামকৃষ্ণ মূর্ত্তি পঞ্চী-কৃত করিয়া তাঁহার চিতাবশিষ্ট অস্থি পুঞ্জ একটী তাম্রের পাত্রে রক্ষা পূর্ব্বক কাশিপুরের ঘাটে অবগাহনাদি কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত সকল ভক্তেরা শূন্য মনে ও শূন্য প্রাণে সমাগত হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে এক অভাবনীয় বিভ্রাট উপস্থিত হইল। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক ভক্তটীর পায়ে কাল ভুজঙ্গ দংশন করিল। সর্পাঘাতে উপেন বসিয়া পড়িল। তাহার পায়ের উপরিভাগে বন্ধন দেওয়া হইল এবং ক্ষত স্থানটী উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা দগ্ধ করান হইল; কিন্তু প্রভুর মহিমায় উপেনের আর কোন ক্লেশ হয় নাই। সেই ক্ষত স্থানটী প্রায় ৪।৫ মাস নীলবর্ণ ও স্ফীত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণের লীলা ফুরাইল। যাঁহাকে লইয়া আমরা গত কয়েক বৎসর হইতে আনন্দ রঙ্গভুমির অভিনয় করিতেছিলাম, আজ তাহার যমনিকা পতিত হইল। আমাদের ন্যায় পাপীদিগের সহবাস কি পুণ্যময়ের অধিক দিন ভাল লাগে? যাহাদের সহবাস সহোদরও কামনা করিয়া পরিত্যাগ করে, সে সহবাস তিনি বলিয়া এত দিন করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা তাঁহাকে কৌশল করিয়া তাড়াইয়া দিলাম। সমুদ্র মন্থনের হলাহল শিব পান

করিয়া আপনি নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবও আমাদের পাপ বিষ ধারণ করিয়া সেই বিষের অসহ্য জ্বালা আপনি সহ্য করিলেন। পরে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা দ্বারা তাঁহার দেহ ভস্মীভূত করিয়া নিরস্ত হইলাম। কর্ম্ম ভিন্ন কর্ম্ম সূত্র কাটে না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই, কিন্তু এতগুলো জুয়া-চোর, লম্পট, বিশ্বাসঘাতক, বিনা সাধনে, বিনা কর্ম্মে, পরিত্রাণ পাইল কি রূপে? তিনি বার বার বলিয়াছেন যে, তোমাদের সকলের পাপ ভার গ্রহণ করিয়া আমি অসুস্থতা ভোগ করিতেছি। হায় প্রভু! আমরা না বুঝিয়া পাপের ভার দিয়াছি। আমরা যদি জানিতাম যে আমাদের জন্য আপনি এত ক্লেশ পাইবেন। তাহা হইলে হয় ত আনন্দের সহিত সে দুঃখ আমরা সহ্য করিতাম। কিন্তু আমরা স্বার্থপর, একথা পূর্ব্বে স্বকর্ণে শুনিয়াও তখন চেতন হয় নাই, তখন উহা প্রভুর রহস্য বলিয়াই জ্ঞান ছিল। যে দিন রাত্রে অ্যাসেটিক অ্যাসিড সেবন করিয়া শোণিত বমন করিয়া আমাদের গ্রীবা ধারণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, এত রক্ত বাহির হইতেছে তথাপি প্রাণ যাইতেছে না কেন? আমরা পাষণ্ড বর্ব্বর, সচ্ছন্দে কহিয়াছিলাম "যাওয়া উচিত ছিল।" এখন সে রহস্য কোথায়? এখন সেই কথা স্মরণ হইয়া আপনার শিরোদেশে আপনি করাঘাত করিতেছি। এখন মনে হইতেছে যে কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি? কেন তখন গর্দ্দভের ন্যায় অমন বুদ্ধি হইয়াছিল। আরে পামর মন! তোর কথা শুনে এমন বিষাদের দিনেও হাসি পায়। তুই গর্দ্দভ ব্যতীত মনুষ্য ছিলি কবে? প্রভুর চরণ ধূলি স্পর্শে মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারিয়াছিস্, এখন কি সে কথা মনে নাই?

রামকৃষ্ণ বিসর্জ্জন দিয়া কেহ পুতনীরে অবগাহন করিলেন এবং কেহ আপনাকে পবিত্র জ্ঞানে কাশিপুরের উদ্যানে অস্থিপূর্ণ পাত্রটী রাখিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

অস্থিপুঞ্জ সপ্তাহকাল কাশিপুরের উদ্যানে রহিল। প্রত্যহ রীতিমত পূজা ও ভোগ রাগাদি হইত। জন্মাষ্টমীর দিন অস্থিগুলি কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে যথা নিয়মে সমাহিত হইয়া তিরোভাব মহোৎসব কার্য্য মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। তদবধি এই স্থানে নিত্য পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতি বৎসর এই স্থানে দুইটী মহোৎসব হইয়া থাকে। কালীপূজার দিন পরমহংসদেব যেরূপে পূজা করাইয়াছিলেন, অবিকল সেই-রূপে তাঁহার পূজা করা হয় এবং তিরোভাব উপলক্ষে জন্মাষ্টমীর পূর্ব্ব এক সপ্তাহ বিশেষ ভোগ রাগ এবং সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়া শেষ দিনে নগর কীর্ত্তনাদি হইয়া তাঁহার শেষ দিনের আজ্ঞা "হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল ভাত" ভোগ দেওয়া হয় এবং তাহা উপস্থিত নিমন্ত্রিত এবং অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত শুক্লপক্ষিয় ফাল্গুনী দ্বিতীয়া, বিজয়া, ১লা জানু-য়ারী এবং বৈশাখী পূর্ণিমা এই দিবসচতুষ্টয় তথায় পর্ব্বদিন বলিয়া পরিগণিত করা যায়।

পরিশিষ্ট।

—*—

পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত এক প্রকার সংক্ষেপে আভাস দেওয়া হইল। তাঁহার এক দিনের কাণ্ড কলাপ সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে এই গ্রন্থ অপেক্ষা সুবৃহৎ একখানি গ্রন্থতেও সম্পূর্ণ ভাবে তাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে কি না সন্দেহের বিষয়। তাঁহার ইতিবৃত্ত অতি-ায় কঠিন, পাঠকেরা অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি কোথায় পল্লীগ্রামে সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিলেন, লেখা পড়া, যাহা দ্বারা মনুষ্যদিগকে উন্নত এবং বহুদর্শী করিয়া থাকে, তাহা যে প্রকার শিক্ষা করিয়াছিলেন, সে প্রকার পাণ্ডিত্যে বাস্তবিক জ্ঞানী হওয়া যায় না এবং রাস-মণির দেবালয়ে সাত টাকা বেতনের চাকরী করায় তাহার স্পষ্ট পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু তিনি এই অবস্থাপন্ন হইয়াও তাঁহার ভিতরে ভিতরে যে ধর্ম্মভাব ছিল, তাহার দ্বারা বাল্যকালে তিনি সমাদৃত এবং যুবা ও প্রৌঢ়াবস্থায় সাধারণের নিকট ভক্তিভাজন হইয়াছেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে, যে, বিবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া জ্ঞানী হওয়াই যে ধর্ম্মোপার্জ্জন এবং জীবন গঠন করিবার একমাত্র উপায়, এবং পার লৌকিক পুণ্যধামে যাইবার রাজপথ বিশেষ তাহা পরমহংসদেবের জীবনী পর্য্যালোচনা করিয়া বিষম সন্দেহের স্থল হইয়া দাঁড়াইতেছে। যদ্যপি এ কথা বলা হয় যে, শুনিয়া শিক্ষা হইতে পারে এবং ইহাও প্রকাশ আছে যে, তিনি প্রত্যেক সাধন ভজন গুরুকরণ দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তখন আশ্চ-র্য্যের বিষয় কি? গুরুকরণ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যেক ভাব আপনা আপনি উপস্থিত হইত এবং তিনি আপনি সমাধা করিয়া লইতেন, গুরু কেবল নিমিত্ত মাত্র থাকিতেন। ভাল, তাহা স্বীকার করিলেও আর একটী আপত্তি আসিতেছে। যে সকল সাধন ভজন পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে অদ্যাবধি একজনে নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সিদ্ধ হইতে পারে নাই, তিনি কেমন করিয়া তাহাতে তিন দিনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন? একটী দুইটী নহে সংখ্যাতীত। উপযুক্ত সিদ্ধ গুরু পাইলে কার্য্য বিশেষের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু এ প্রকার দৃষ্টান্ত আমরা যত দূর জানি আর নাই

তাঁহার মস্তিষ্ক সাধারণের ন্যায় ছিল না, তাহা অসাধারণ বলিতে হইবে। তাঁহার সহিত চলিত কথা কহিতে পণ্ডিত, জ্ঞানী, কর্ম্মী, কেহই পারিতেন না। তাঁহার প্রত্যেক কথা গভীরতম ভাবে পরিপূর্ণ থাকিত। যখন যে প্রকার লোক তাঁহার নিকট যাইত, তিনি তাহারই মত কথা কহিতেন। আবার যখন বহু ভাবের ব্যক্তি একত্রে মিলিত হইত, তখন এক কথায় সকলের মনঃ সাধ পূর্ণ করিতেন।

আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই যে, কেহ কিঞ্চিৎ ভক্তিতত্ত্ব অথবা জ্ঞান পন্থার কণা বিশেষ লাভ করিয়া আস্ফালনের ইয়ত্তা রাখেন না; আজ এ স্থানে বক্তৃতা, কাল ও স্থানে শাস্ত্র ব্যাখ্যা, পরশ্ব শিষ্য বৃদ্ধি, তদ্‌পরদিন নিজ চিহ্নিত ভেক ধারণ করাইয়া নাম বাহির করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। কিসে সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা তাঁহার দুটো সুখ্যাতি করিবেন, কিসে ছাপার কাগজে তাঁহার নাম উঠিবে, এই কামনায় সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকেন। পরমহংসদেবের সে ভাব একেবারেই ছিল না। তাঁহার সে ভাব থাকিলে অদ্য এ প্রদেশে একটা হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। পাছে লোকে তাঁহাকে জানিতে পারে, এই জন্য তিনি অতি কুৎসিত ভাবে দিন যাপন করিতেন। তাঁহার কার্য্য কলাপ দেখিয়া নিকটের ব্যক্তিরাই ভ্রমে পতিত হইত, অপরে বুঝিবে কি? লোকে কখন ভক্তির কার্য্য দেখিত, আবার কখন তাহার বিপরীত ভাব দেখিয়া মনের ভিতর নানা প্রকার সন্দেহ আনিয়া উপস্থিত করিত। পাছে তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে, তজ্জন্য তিনি কোন প্রকার ভেকের লক্ষণ ধারণ করিতেন না। এমন সামান্য ভাবে থাকিতেন যে, লোকে তাঁহাকে একজন ভদ্রলোক বলিয়াও বুঝিতে পারিতেন না। একদিন তিনি গঙ্গাতীরে বেড়াইতেছিলেন, একজন কলিকাতার ডাক্তার দক্ষিণেশ্বরে রোগী দেখিতে গিয়া রাসমণির ঠাকুর বাটী দর্শনাভিলাষে সেই সময়ে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি পরমহংসদেবকে বাগানের মালী মনে করিয়া যূঁই ফুল তুলিয়া দিতে হুকুম করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। এই ডাক্তারটী তাঁহার ব্যাধির সময় দেখিতে যাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, কি সর্ব্বনাশ! আমি করিয়াছিলাম কি! এঁকেই ত ফুল তুলিয়া দিতে বলিয়াছিলাম!

অভিমান নাশ করিবার নিমিত্ত যে সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নিশ্চয় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে ডাক্তারের আজ্ঞা পালন করিতে

পারিতেন না অথবা তাঁহার জীবনে এমন অনেক ঘটনা হইয়া গিয়াছে, যাহাতে পূর্ণ অভিমান শূন্য ভাব দেখা গিয়াছে। একদা তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, বোধ হয় কামাদি রিপুগণ গিয়াছে আর ভয় নাই। তিনি তখন বকুল তলার ঘাটে বসিয়া ছিলেন। এই কথা মনে হইবামাত্র তাঁহার মনের ভিতর কামবৃত্তি পূর্ণ ভাবে উদ্দীপন হইয়া যাইল। তিনি বলিতেন যে, সে সময়ে যদ্যপি প্রৌঢ়া কিম্বা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সেই পথে গমন করিত তাহা হইলে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত কি না বলিতে পারি নাই। তিনি তন্নিমিত্ত বলিতেন কোন বিষয়ে কাহার অভিমান করিবার অধিকার নাই। অদ্য যাহা আছে কল্য তাহা না থাকিতে পারে। কখন কাহার মনে কি হয়, কে বলিতে পারে।

জীব শিক্ষা, লোকের হিত সাধন, এই সকল সম্বন্ধে তাঁহার নিতান্ত আপত্তি ছিল। ইচ্ছা করিয়া তিনি কখন কাহাকেও কোন কথা কহিতেন না। এক সময়ে ব্রাহ্মণী প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত কত অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি বলিতেন—"ভাব নিয়ে ঘরে বসে থাক।" পরমহংসদেবকে বার বার এই কথা বলিলে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিতেন, কালী যাহা করিবেন তাহাই হইবে তাঁহার কথা ছিল।

তাঁহার অভিমান না থাকায় তিনি ইচ্ছা করিয়া কিম্বা মনে কোন বিষয় সঙ্কল্প করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারিতেন না। যখন যাহা করিতেন, তাহা ভাবে করাইয়া লইত। তিনি উপদেশে বলিতেন, "ঝড়ের এঁটো পাত হওয়া সকলের উচিত। বাতাসে তাহাকে যে দিকে লইয়া যাইবে, এঁটো পাতের এ প্রকার কোন অভিমান থাকিবে না যে তাহার বিরুদ্ধে কিছু করিবে।" পরমহংসদেব বাস্তবিক এই ভাবে থাকিতেন। তিনি কখন কাহাকে কালীর ইচ্ছা ছাড়া কোন কথা আপনি বলিতেন না। অনেক সময়ে লোকে দেখিত যে, তিনি বলিতেছেন কিন্তু বাস্তবিক তিনি বলিতেন না। একথা সাধারণ লোকেরা বুঝিতে পারিবেন না। তবে আভাসে একটু বুঝাইতে চেষ্টা করি। যেমন কাম ক্রোধাদি হইলে মনুষ্যেরা যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে, সহজাবস্থায় তাহা তাহারা কখন করিতে পারে না এবং অনেকে রিপুর পরাক্রমে কোন প্রকার অবৈধাচরণ করিলে, পরে তাহার জন্য সে আপনি অনুশোচনা করিয়া থাকে। এস্থানে যেমন তাহাকে ভাবে কার্য্য করাইয়া লইল। তেমনি

পরমহংসদেব সকল কার্য্যই ঈশ্বরের ভাবে করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ কথাটী বুঝা অতিশয় কঠিন। ঈশ্বরের ভাবে তাঁহার কার্য্য না হইলে অমানুষী কার্য্য করিতে পারে কে? কি বাল্যকালে, কি কিশোর সময়, কি যুবা বয়সে, কি প্রৌঢ়াবস্থায়, তাঁহার যে সকল কার্য্য কলাপ হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান কালে নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু ঐ সকল ঘটনা কল্পিত নহে, তাহা যথার্থই ঘটনা বিশেষ। অমানুষী কার্য্য যে স্থানে হয় সেস্থানে ঐশ্বরীক শক্তি না বলিয়া আর উপায়ান্তর নাই। এই ঐশ্বরীক শক্তির কার্য্য তাঁহার ভিতর দিয়া সম্পন্ন হইত বলিয়া যাহা অভাবনীয় অচিন্তনীয় বিষয় তাহাও তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব অধিক লেখা পড়া জানিতেন না। এ কথা বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে বলা হইল। সংস্কৃত জানিতেন না; কিন্তু সকল প্রকার সংস্কৃত শ্লোক তিনি বুঝিতে পারিতেন। কেবল বুঝা নহে, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য বাহির করিয়া দিতেন। ইংরাজী জানিতেন না কিম্বা অন্য কোন ভাষা তাঁহার জানা ছিল না, তাহার প্রমাণ কিছুই নাই। এই পাণ্ডিত্যে তিনি কি দর্শন, কি জড়বিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, কি ধর্ম্মতত্ব, কি সমাজ-তত্ব, তাঁহার নিকট কোন তত্বেরই অভাব ছিল না। যে ব্যক্তি মনোবিজ্ঞানে পণ্ডিত তাঁহাকে অন্য কোন কথা কহিতেন না যে জড়বিজ্ঞানে পণ্ডিত তাঁহাকে তাহারই উপদেশ দিতেন। এই প্রকার পাত্র বিচার করিয়া উপদেশ দেওয়া মনুষ্য শক্তির বহিভূর্ত কথা। কেবল তাহা নহে। তিনি সময়ে সময়ে শাস্ত্রের মীমাংসাও করিয়া দিয়াছেন। একদা অধরলাল সেন কাশীপুরের মহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত তন্ত্রের কোন শ্লোক লইয়া বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। মহিম বাবু এবং তাঁহার বাটীস্থ জনৈক পণ্ডিত সেই শ্লোকের এক প্রকার অর্থ করিয়াছিলেন। অধর বাবু তাহার স্বতন্ত্র অর্থ করেন। পরস্পর অমিল হওয়াতে সে ক্ষেত্রে কোন প্রকার মীমাংসা হইল না। অধর বাবু তথা হইতে পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিয়া সে কথা কিছুই উত্থাপন করিলেন না। কারণ পরমহংসদেব শাস্ত্র পাঠ করেন নাই, তাহা তাঁহার অধিকার বহিভূর্ত এই বিশ্বাস ছিল। অধর বাবু বসিয়া আছেন এমন সময় পরমহংসদেবের ভাবাবেশ হইল। তিনি অধর বাবুকে ডাকিয়া সেই শ্লোক গুলির সমুদয় অর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। অধর বাবুর আর আশ্চর্য্যের

সীমা রহিল না। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে পরমহংসদেবের কখন শক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইত না। এই প্রকার শক্তির বিকাশ হইলে তিনি বলিতেন, যেমন ছাদের জল নল দিয়া পড়ে। কখন বাঘের মুখ কিম্বা স্থানান্তরে কুকুর অথবা মানুষের মুখের ভিতর দিয়া বাহির হয়। নিম্ন হইতে ছাদের জল দেখা যায় না, কেবল যাহা দিয়া জল পড়ে, তাহাই দেখা যায়। লোকে মনে করে যে বাঘের মুখের ভিতর দিয়া জল আসিতেছে। তেমনি হরি কথা যাহা বাহির হয়, তাহা হরিই বলেন। আধারটী বাঘ মুখ বিশেষ নল মাত্র। পরমহংসদেবের পক্ষে এ কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য তাহাতে তিলাংশ সন্দেহ নাই।

পরমহংসদেব ঘোর সন্ন্যাসী, ঘোর গৃহী, ঘোর ভক্ত এবং ঘোর জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার কোন দ্রব্যেই প্রয়োজন ছিল না। স্ত্রী বল, পুত্র বল, কন্যা বল, মাতা বল, পিতা বল, ভাই বল, বস্ত্র বল, অর্থ বল কিছুতেই তাঁহার আবশ্যকতা দেখা যায় নাই। কাহার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি এই প্রকার বিবিধ সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক সংসার করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা তিনি সংসারী ছিলেন। স্ত্রীর কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না, তথাপি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই; কাল সাপিনী বলিয়া ঘৃণা করিতেন না, তিরোভাবের দিন পর্য্যন্ত যে কোন হেতুতেই হউক সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। আমরা শত শত তাঁহার পুত্র রহিয়াছি। আমাদের কল্যাণের জন্য তিনি যে পরিমাণে কাতর, এবং ব্যস্ত চিত্ত হইতেন, বাপ মা তেমন কাতর হন না। একদা আমাদের বাটীতে বিসূচিকা রোগের প্রাচুর্ভাব হওয়ায়, অল্প দিন মধ্যে তিনটী সন্তান কাল-গ্রাসে পতিত হয়। আমরা এই নিমিত্ত একটী রবিবারে তাঁহার নিকটে গমন করিতে পারি নাই। তিনি তাহা জানিতে পারিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "এরা আজ আসে নাই, এদের বড় বিপদ তুমি যাইয়া সংবাদ লইবে।" আমরা যখন তাঁহার নিকটে গমন করিলাম আমাদের জন্য তাঁহার কাতরতা দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম যে, আমাদের পিতা যতদূর দুঃখিত না হইয়াছেন, তাঁহা অপেক্ষা তিনি যে কত গুণে কাতর হইলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী তিনি, তাঁহার এ সকল কেন? মায়িক দুঃখ তাঁহার কেন? ভাব বুঝিবে কে? পরক্ষণে তিনিও যেমন হইলেন, আমাদেরও তেমনি পরিবর্ত্তিত করিলেন। ভক্ত,

কি অভক্ত, সকলের জন্য তিনি কাঁদিতেন। একদা কালী বাটীতে একটী কাঙ্গালী তিন চারি দিবস প্রসাদ পাইতে আসিয়াছিল, দ্বারবান তাহাকে তিন দিনের অধিক আসিতে দেখিয়া ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। এই কথা পরমহংসদেব শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন "মা! এ কি তোর বিচার! আহা! দুটী অন্নের জন্য মার্ খাইল।" তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের হৃদয় বিচূর্ণ হইয়া গেল আমরাও তাঁহার সহিত কাঁদিয়াছিলাম। তাঁহার হৃদয় দয়ায় গঠিত ছিল, অথবা যে স্থানে দয়াময় নিজে বসিয়া রহিয়াছেন, সে স্থানের কার্য্য কেন কঠোর হইবে? তিনি যাহার জন্য কাতর, তিনি যাহার জন্য চিন্তিত, যাহার জন্য তাঁহার চক্ষে জল আসে, তাহার কত দূর সৌভাগ্য! যাহার হৃদয়ের ব্যথায় তিনি ব্যথিত হন, তাহার দুঃখ কোথায়? তখনি একটী লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে ত্রৈলোক্য বাবু সেই কাঙ্গালীকে একটী টাকা দিয়াছেন এবং আর তাহাকে কেহ কিছু বলিবে না। পরমহংসদেবের আর হাসি ধরিল না। তিনি আমাদের সামাজিক উন্নতির জন্য সর্ব্বদা যেন ভাবিতেন। উহার এত টাকায় হইতেছে না, উহার মাসে এত খরচ, উহার কিছু টাকা চাই ইত্যাকার কতই ভাবিতেন। তিনি যাঁহা ভাবিতেন, তাহার কার্য্য হইতে কত বিলম্ব? এ বিষয়ের একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। তাঁহার কোন ভক্তের অতি অল্প আয় ছিল। তাহার বেতন বৃদ্ধির জন্য যখন উপর আপিসে দরখাস্ত যাইল, পরমহংসদেব অপর ভক্তের মুখে সে কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আহা! উহার এত টাকার কমে চলে না, বেতন বৃদ্ধি কি হইবে? ভক্ত কহিলেন, মহাশয় তাহার জন্য চিন্তিত, অবশ্যই হইবে—হইবে কি, হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য ব্যাপার! সে সময়ে সরকার বাহাদুরে তহবিল বড়ই খাঁকৃতি। যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য সকল ব্যয় কমিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তাহার যাহা বৃদ্ধি পাইবার আশা ছিল, তাহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। আশ্চর্য্য এই জন্য বলি, যে যত টাকা প্রার্থনা করে, উপর ওয়ালারা তাহা কমাইয়া দিতে পারিলে কোন মতে ছাড়ে না, কিন্তু প্রার্থনা অপেক্ষা বেশী দিতে কেহ কি কখন শুনিয়াছেন? এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল।

পিতা মাতা যেমন যে ছেলেটী যাহা ভালবাসে, তাহার জন্য সেই

জিনিষটী সংগ্রহ করিয়া রাখেন যে জিনিষটি খাইতে ভাল লাগে, তিনি না খাইয়া তাহার জন্য ঢাকা দিয়া রাখেন, পরমহংসদেব তাহাই করিতেন। কোন সেবক পরমান্ন খাইতে বড় ভাল বাসিত তিনি তাহার জন্য তাহা তুলিয়া রাখিয়া দিতেন। কোন কোন ভক্তের বাটীতে বেদানা, মিছারী বড় বাজারের ক্ষীরের দ্রব্যাদি হয় আপনি যাইয়া দিয়া আসিতেন, না হয় অপরের দ্বারা পাঠাইয়া দিতেন। এই জন্য বলি তাঁহার পুত্র কন্যা ছিল। এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোন ভক্ত সন্তান লইয়া গিয়াছিল; তাঁহার স্ত্রীকে টাকা দিয়া ছেলেটী দেখিতে বলিয়াছিলেন। তিনি কাহাকে টাকা, কাহাকে জামা, কাহাকে বস্ত্র, যাহার যাহা প্রয়োজন বুঝিতেন, তিনি আপনি তাহা দিয়াছেন। একদিন তাঁহার কোন ভক্তকে কোন কথা না বলিয়া একখানি গরদের কাপড় দিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন "দিলাম লইয়া যাও।" পরে শ্রবণ করা গেল যে, সেই দিন তাহার মাতার একখানি গরদের কাপড় সম্বন্ধে কোন গোলমাল হইয়াছিল। ঘটনাটী ঠিক্ মনে নাই, তিনি তাহা জানিতে পারিয়া সেই অভাব পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তিনি সামান্য দ্রব্য দিয়া ভক্তের কি ভাল করিয়াছেন? ইহার ভিতরে অর্থ আছে। তিনি কহিতেন যে, যাহার যাহা প্রয়োজন তাহার অধিক হইলে গোলযোগ হয়। সাঁকোর জল যেমন এক দিকের মাঠ হইতে অপর মাঠে যায়, ভিতরে কিছু থাকিতে পারে না; ভক্তদিগের পক্ষেও সেই রূপ জানিবে। আহার বিহনে তাহারা মরিবে না, আবার তাহা অধিক হইয়া নষ্টও হইবে না। ইহার দ্বারা রজঃ তমগুণের আধিক্যতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

তিনি কাহার নিকটে কিছু গ্রহণ করিতেন না এবং বলিতেন যে, আমি কাহার কিছু গ্রহণ করি নাই। এ কথা লইয়া অনেক কথাই হইত। তিনি যদিও রাসমণির দেবালয়ে থাকিতেন; কিন্তু তাঁহার কথা প্রমাণ তিনি তথায় কিছু লইতেন না বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, অথচ মন্দিরের সকল দ্রব্যই লইতেন। এই কথায় যে সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? এই নিমিত্ত অনেকে তাঁহাকে দোষারোপ করিত, এখন করিয়া থাকে; কিন্তু স্থূলদর্শী ব্যক্তিরা মহাপুরুষের চরিত্র যদি সহজে অর্থকরী বিদ্যা বুদ্ধিতে ভেদ-

করিতে পারিত, তাহা হইলে ধর্ম্ম-কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা আর থাকিত না। তাহা হইলে কি বর্ত্তমান শতাব্দীর পাস করা বাবুরা নিরক্ষর ব্যক্তির চরণ প্রান্তে পড়িয়া গড়াগড়ি দিত? তাহা হইলে কি কেশব বাবু প্রভৃতি মহাবিদ্বান ব্যক্তিগণ চরণ রেণুর প্রত্যাশায় কৃতাঞ্জলী হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে কি প্রতাপ বাবু অধ্যাত্মিকতা এবং বৈরাগ্য শিক্ষার নিমিত্ত চরণ যাচ্ঞা করিতেন? তাহা হইলে বিজয় বাবু "জয় রামকৃষ্ণের জয়!" ধ্বনি দিয়া রাজপথে নৃত্য করিতে পারিতেন? সে যাহা হউক পরমহংসদেব কি কারণে যে, "কাহার কিছু গ্রহণ করি নাই" কথা ব্যবহার করিতেন তাহা আমরা তাঁহার নিকট শ্রবণ করি নাই। এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হয় নাই। আমরা যখন সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার নিকটে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করি, সেই সময়ে কিয়দ্দিন শনিবারে রজনী শেষ না হইতেই আমরা কলিকাতা হইতে হাঁটীয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতাম। মধ্যাহ্নে তথায় প্রসাদ পাইতাম। কয়েক মাস এই রূপে অতিবাহিত হইলে একদিন আমরা পরস্পর বলাবলি করিলাম যে, বেশ মজা হইয়াছে? পরমহংসদেব কত আদর করিয়া আমাদের আহার করান। সেই দিন অপরাহ্নে তিনি আমাদের ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা এখানে আহার কর কেন? এস্থান ত তোমাদের জন্য হয় নাই। সন্ন্যাসী ফকিরের নিমিত্ত হইয়াছে। এ অন্ন খাইলে গৃহীদিগের অনিষ্ট হয়। একদা এক ব্যক্তি এই স্থানে এক ছিলিম তামাক খাইয়া যাইবার সময় সে একটী পয়সা দিয়াছিল। আমাদের চক্ষুস্থির হইল, মনে মনে শত ধিক্কার দিলাম এবং তদবধি আমরা জলখাবার লইয়া যাইতাম। দোল পূর্ণিমার পূর্ব্ব রবিবারে আমরা যখন প্রণামপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করি, তিনি দোলের দিন তথায় ভোজন করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবে কে? যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলাম; কিন্তু বাহিরে আসিয়া কতই বিচার করিলাম যে, যিনি এক দিন যাহা করিতে নিষেধ করিলেন, তিনিই আবার আপনি তাহাই করিতে আজ্ঞা দিলেন। এ কথা কেমন করিয়া মীমাংসা হইবে? লোকে যে কথা লইয়া আপত্তি করিত, আমরা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম; কিন্তু তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কিছু দিনের পর পরমহংসদেবের একদিন ঐ কথার দুইটি কারণ মনে হইল। প্রথমটী এই যে ঐ দেবালয়ে রাসমণির কোন সত্ব নাই। শিবালয় কটী তাঁহার

নিজনামে প্রতিষ্ঠিত; তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধ আছে, কিন্তু পরমহংস-দেবের কোন সংস্রব ছিল না এবং কালী ও রাধাকৃষ্ণ গুরুর নামে হওয়ায় রাসমণির সম্বন্ধ ছেদন হইয়া গিয়াছিল। ভোগ রাগ যাহা হয় তাহা ঠাকুরের জন্য, সেই প্রসাদে কাহার নিজ স্বার্থ থাকিতে পারে না। এ হিসাবে তিনি অন্যায় বলিতেন না। কারণ কালীর নামে যে বিষয় আছে তাহাতে রাসমণি নিজেই নিস্বত্ব হইয়া কালীকে প্রদান করিয়াছেন। দান গ্রহণের দোষ গুণ যদি কিছু হইয়া থাকে, তাহা রাসমণি এবং কালীতে হইয়াছে। পরমহংসদেব কেন, যে কেহ সেই বিষয়ের সত্ব ভোগ করিবে, তাহা কালীর বুঝিতে হইবে। কালীর অকর্ম্মণ্য সন্তানে এই বিষয় ভোগ করিবে; কিন্তু কর্ম্মী-সন্তানেরা তাহাতে ভাগ বসাইলে অকর্ম্মণ্যেরা আবার যাইবে কোথায়? এই নিমিত্ত গৃহীদিগের তাহাতে অপরাধ হইবে বলিয়া কথিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ এই যে পরমহংসদেব তথায় কিছু দিন চাকরী করিয়াছিলেন। যখন কর্ম্ম করিতেন তখন কার্য্যের বিনিময়ে বেতন এবং খোরাক পোষাক পাইতেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহার শক্তি ছিল, সে পর্য্যন্ত পরস্পর বিনিময়ে কার্য্য চলিয়াছিল। যখন অশক্ত হইলেন তখন তাঁহার পূর্ব্বের কার্য্যকারী শক্তি সমুদয় দেবীর সেবায় ব্যয়িত হইয়াছে জ্ঞান করিয়া কালীর সেবায়েৎ তাঁহাকে তদবস্থায় জাবজ্জীবন রাখিবার নিমিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যদিও বাঙ্গালীর পেন্‌সন দিবার প্রণালী প্রচলিত নাই; কিন্তু একেবারে এরূপ দৃষ্টান্ত যে অপ্রতুল তাহাও নহে। রামপ্রসাদ সেনের ইতিহাসে পেন্সনের কথা উল্লেখ আছে। অতএব পরমহংসদেব "কাহার কিছু গ্রহণ করি নাই" বলিবার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। পেন্সন পাওয়া বাস্তবিক দাতব্যের হিসাব নহে। এই নিমিত্ত বলি পরমহংসদেব এক বিচিত্র প্রকার সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসীও বটেন আবার গৃহীও বটেন।

কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব সমুদায় ধর্ম্মপ্রণালী, সাধন দ্বারা বিশ্লেষণ পূর্ব্বক দুই ভাগে পর্য্যবশিত করিয়াছিলেন। যথা জ্ঞান বা আত্মতত্ত্ব এবং ভক্তি বা লীলাতত্ত্ব। তিনি জ্ঞানীর শিরোমণি অর্থাৎ জ্ঞান পথে যখন ভ্রমণ করিতেন, তখন সাকার ভাব, প্রেম কিছুই স্থান পাইত না, তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন থাকিতেন। তখন কোন মতে সে সমাধি ভঙ্গ করা যাইত না, এমন কি ওঁ তৎ সৎএর তৎ ব্যতীত সৎ শব্দটীও প্রয়োগ করা যাইত না। তিনি তখন সকলই তন্ময়ত্ব দেখিতেন বা বুঝিতেন। সৎশব্দের

দ্বারা দ্বৈত ভাব আসিয়া থাকে অর্থাৎ সৎ বলিলে অসৎ শব্দ অনুমিত হয়। তাঁহার সাধনের মধ্যে সৎ অসৎ একাকার করা ছিল।

লীলা বা ভক্তি পক্ষে তাঁহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের প্রভাবে আধুনিক নিরাকার বাদীরাও সাকার ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি যখন কালীর সহিত কথা কহিতেন, সে কথা শুনিলে কে বলিবে যে তথায় তিনি নাই। একদা দোলের দিন তিনি কীর্ত্তন করিতে করিতে একটী ধুয়া ধরিলেন, "সব সখিগণ তোরা সাখি থাক্, আজ ফাগ্ রণে তুমি হার কি আমি হারি!" তখনি নিজে যেন শ্রীমতি হইলেন এবং কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ঐ গান করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে দৌড়াইয়া গিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা কৃষ্ণের বক্ষ-দেশ স্পর্শ করিয়া "তুমি হার" এমন ভাবে বলিতে লাগিলেন, যেন সেই দৃশ্যটী প্রকৃত রাধাকৃষ্ণের ফাগুয়া খেলা হইতেছে বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। সে ঘটনা দেখিলে আর মনে হয় না যে, জগতে রাধাকৃষ্ণ প্রেম বিহার হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাব আর কিছু আছে। আহা! সে দিনের ব্যাপার এখন স্মরণ হইলে আমরা হতবুদ্ধি হইয়া যাই। ভগবান! আমাদের বল দিন, আমাদের একটু কৃপাকণা বিতরণ করুন, যাহাতে এই অদ্ভুত রামকৃষ্ণ চরিত কিয়ৎ পরিমাণেও লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হই। চক্ষের দেখা, প্রাণের জিনিস, শক্তি নাই, ভাব নাই, শব্দ নাই, যে তাহা আভাসেও প্রকাশ করিতে পারি। একদা শিবপুর নিবাসী শ্যামাচরণ পণ্ডিত মহাশয় পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মহাশয় ঈশ্বর দর্শন করিলে কিরূপ অনুভব করেন, আমার সে কাহিনী শ্রবণ করিতে বড় সাধ হইতেছে। পরমহংসদেব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন দেখ, "একদিন প্রাতঃকালে দুইটী সমবয়স্ক যুবতী পুষ্করিণীতে আসিয়া একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিল হ্যাঁলা! তোর্ ভাতার এসেছিল না? সে কহিল হ্যাঁ। সঙ্গিনী কহিল তুই কেমন সুখ পেলী? সে কহিল সে কথা কি মুখে বলা যায় লা? তোর্ ভাতার যখন আসিবে তখন তুই বুঝ্‌তে পার্‌বি। ঈশ্বরের রূপ কি? কেমন? সে কি বলবার কথা?" শ্যামাচরণ পণ্ডিত এই কথা শ্রবণ করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। আমাদের সেই কথার ভাব আজ স্মরণ হইতেছে; এখন বুঝিতে পারিতেছি সে বাস্তবিক সম্ভোগের কথা, কথায় বলিবার উপায় নাই।

পরমহংসদেব এইরূপে একদিকে জ্ঞান ও অপর দিকে ভক্তি উভয়বিধ মতে কখন কি ভাবে থাকিতেন তাহা কে অনুধাবন করিতে পারিবে। তিনি

সেই জন্য কখন জ্ঞানী, কখন ভক্ত এবং কখন এতদুভয়ের সাম্যভাবে অবস্থিতি করিতেন। এই নিমিত্ত তিনি কখন কখন বলিতেন যে বেদপুরাণ তন্ত্রাদি সমুদায় সত্য। আবার কোন সময়ে এ সকল উড়াইয়া দিয়া অনন্ত সচ্চিদানন্দে ডুবিয়া বসিয়া থাকিতেন।

তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। ধনী নির্ধনীর প্রভেদ রাখিতেন না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ধনীদের সহিত বড় মিশিতেন না, তাহার কারণ স্বতন্ত্র ছিল। তিনি বলিতেন ধনীরা পূর্ব্বের সঙ্কল্প হেতু অর্থ পাইয়াছে। তাহাদের কিছু কাল তাহা ভোগ না হইলে হরি কথা লইবে না। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ সঙ্কল্পের দাস। যখন সঙ্কল্প ফুরাইয়া আসিবে, তখন তাহাদের ঈশ্বরের দিকে যাইতে চেষ্টা হইবে, তখন তাহাদের চমক্ ভাঙ্গিবে। ইচ্ছা করিয়া যাহা পাইয়াছে, তাহা ইচ্ছা করিয়াই পরিত্যাগ করিবে। যেমন "যে মুখে কাঁটা ফোটে তাহাকে সেই মুখ দিয়া বাহির করিতে হয়। যেমন কেহ সঙ্ সাজিয়া আসরে আসিয়াই কি তাহা ত্যাগ করিতে পারে? তাহা করিলে রসভঙ্গ হয়। কিয়ৎ কাল রঙ্ তামাসা করিলে তাহার পর আপনি চলিয়া যাইয়া রঙ্‌কালী তুলিয়া ফেলিবে।"

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি ব্যক্তি বিশেষে উপদেশ দিতেন। কাহাকে তিনি সন্ন্যাসী হইতে বলিতেন, কাহাকে গৃহই ধর্ম্ম শিক্ষার স্থান বলিয়া উপদেশ দিতেন এবং কাহাকে দিন কতক আম্‌ড়ার অম্বল খাইয়া আসিতে বলিতেন। যাহাদের সন্ন্যাসীর ভাব শিক্ষা দিতেন, সংসার একেবারে নিতান্ত অপদার্থ, হেয় বলিয়া তাহাদের বুঝাইতেন; সুতরাং তাহাদের সেই প্রকার সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে। যাঁহাদের গৃহে রাখিয়া সংসারকে কেল্লার সহিত তুলনা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সংসারের ভিতরেই পূর্ণশান্তি লাভ করিয়া পরমানন্দে দিনযাপন করিতেছেন। আর যাঁহারা দিন কতক আম্‌ড়ার অম্বল খাইয়া অর্থাৎ সংসার সুখ কি জানিয়াই সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহারা উভয় পক্ষেরই পক্ষপাতী হইয়া আছেন। এই প্রকার যাঁহার ভাব, তিনি সন্ন্যাসীও বটেন, গৃহীও বটেন এবং গৃহী-সন্ন্যাসীও বটেন। পূর্ব্বে গৃহী এবং সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে পরস্পর যে বৈরীভাবের কথা উল্লেখ হইয়াছে, তাহা এই নিমিত্তই জন্মিয়াছে। তাহা বোধ হয় অচিরাৎ তিরোহিত হইবে।

পরমহংসদেব সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের ভাব, সর্ব্বধর্ম্ম সাধন করিয়া লাভ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার নিকটে অসাম্প্রদায়িক ভাব ছিল। তাই সকল

ভাবের ব্যক্তিরা আনন্দ লাভ করিতেন; সুতরাং পরমহংসদেবের সম্প্রদায় হয় নাই এবং হইবেও না। কিন্তু এক হিসাবে তাঁহার সম্প্রদায় আছে এবং হইবে। অন্যান্য সম্প্রদায় যে প্রকার আপন মতকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা খাঁটি মনে করেন, পরমহংসদেব তাহা করিতেন না। তিনি চলিত সকল মতকেই সত্য বলিতেন। যাহার ভিত্তি এক ঈশ্বর, সেই ভাবকে অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহার নিকট পরিগণিত হইত। এই ভাবে তাঁহার সম্প্রদায় কিরূপে হইবে? কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়া তাঁহারা যথন ঐ কথা কহিবেন, তথন পরোক্ষ সম্বন্ধে এক মতে এক ভাবে কার্য্য হইবে, সুতরাং তাহাকে একটী সম্প্রদায় বলিলেও ভুল বলা হইবে না; এ প্রকার সম্প্রদায়কে সম্প্রদায় বলা যায় না। তাহাতে সম্প্রদায়ের গোঁড়ামী থাকিবে না, দ্বেষাদ্বেষী থাকিবে না, পরস্পর টানাটানি থাকিবে না। বিবাদ হয় কেন? একজন বলিল, তোমার ধর্ম্মভাব ভুল; বিশ্বাসীর বিশ্বাস সামান্য কথা নহে। সে অমনি লগুড়াহত নিদ্রিত কালভুজঙ্গের ন্যায় চক্র ধরিয়া তথনি তাহার আততায়ীর বক্ষে দংশন করিতে চেষ্টা করে, দংশন জ্বালায় উভয়ে জ্বলিয়া মরে। উভয়ের অশান্তি অগ্নিতে উভয়কে পুড়িয়া মারে। পরমহংসদেব যে অসাম্প্রদায়িকতা শিক্ষা দিয়া সম্প্রদায় গঠন করিবার পত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা যথন সকলে প্রাণে প্রাণে অনুধাবন করিতে পারিবেন তথন যে কি সুখ ও শান্তির রাজ্য স্থাপন হইবে, তাহা মনে করিলেও হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে। ইহার ভিতরে কঠিন কিছুই নাই। কেবল নিজ নিজ অভিমান কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করিতে পারিলেই হয়। দুই পাতা গীতা উল্টাইয়া যদ্যপি গীতাই অবলম্বন করিতে আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে কথা নিতান্ত উপহাসজনক হইয়া দাঁড়াইবে। যদ্যপি ভাগবতের স্কন্ধ বিশেষ পাঠ করিতে শিখিয়া কেবল লীলা কথা ছড়াইয়া বেড়ান হয়, তাহা হইলে কিরূপে সকলে তাঁহার কথার অনুবর্ত্তী হইতে পারিবে। ঘোষপাড়ারা ত জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছেন। ফি কথায় টোক্কর, প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রতি বিদ্রূপাত্মক কথা। কেনরে বাপু! যাহা ভাল বুঝিয়াছ কর, অন্যের বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ কেন? ব্রাহ্মেরা দেশ ছাড়া করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তোমরা পরিত্রাণ পাইয়া থাক, ভালই আমরা সকলে না হয় নিম্নগতি লাভ করিব—বিবাদ কেন? গালাগালি কেন? আর কি কার্য্য নাই? সাকার কি করিয়াছেন? সাধ্যমত করিতে

ত্রুটী হইতেছে না; কিন্তু করিয়াছ কি? বৌদ্ধধর্ম্ম এক সময়ে প্রবল হইয়াছিল; কিন্তু তাহা অদ্য কোথায়? তাহা চীন, বর্ম্মা প্রভৃতি দেশ আশ্রয় করিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা কোন পক্ষেরই লাভ নাই, সমূহ অমঙ্গল। উভয়ের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম, উভয়েই তাহা করিতেছে। উভয়ের উদ্দেশ্য শান্তি তাহাও হইতেছে। যদি না হইত, যদ্যপি বিশ্বাসীর প্রাণে আরাম না থাকিত, যদ্যপি বিশ্বাসীর বিশ্বাসে প্রকৃত ঈশ্বর ভাব না থাকিত, তাহা হইলে আজ কি প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুস্থানে অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজ করিতে পারে?

সত্য কখন নষ্ট হইবার নহে। যেমন জড়জগতের জড় পদার্থ কখন বিনষ্ট হয় না। কোহিনুর অদ্যাপি ব্রিটিস্ মস্তকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; তাহার ধর্ম্ম সমভাবে রহিয়াছে; কিন্তু হিন্দুস্থানে নাই—নাই বলিয়া কি কোহিনুরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে? হিন্দু বিশ্বাস অবিকল সেই প্রকার। হিন্দু, বিজাতীয় অনুকরণ করিতে শিখিয়া আপন বাস, আপন রীতি, আপন নীতি, আপনধর্ম্ম ছাড়িল, সে ভাব অপর স্থানে যাইয়া প্রকাশ পাইবে। জড়জগতের রূঢ় পদার্থ যেমন স্বভাব সিদ্ধ ভাব রাজ্যের ভাবও তেমনি রূঢ় ধর্ম্মাক্রান্ত। আমার ঘরের রূপা সোনা বিক্রয় করিলাম, আমি নিস্ব হইলাম, তাই বলিয়া রূপা সোনা অদৃশ্য হইয়া যাইবে না, কোথায় না কোথায়, কোন না কোন প্রকারে অবশ্যই থাকিবে। এই নিমিত্ত বলা হইতেছে যে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ, কি অন্য মতাবলম্বী, কেহ কাহার ভাবে নিন্দা কিম্বা আপন ভাবে তাহাকে আনিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইও না। যেমন সকলে এক জাতীয় পদার্থ সম্ভূত হইয়া ভিন্নাকার, ভিন্নভাব, প্রাপ্ত হইয়াছ, ধর্ম্ম ভাবও সেইরূপ সকলের স্বতন্ত্র জানিতে হইবে। মাতাল যেমন সকলকে মাতাল করিতে পারে না, যাহারা সুরা স্পর্শ না করেন, তাহারাও মাতালদের আপন ভাবে পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম নহেন। সাধু চোরকে চুরি করা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন না। চোরও সাধুকে আপন মতাবলম্বী করিতে অসমর্থ হয়, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাবগত ধর্ম্ম জন্মকালেই প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। ঈশ্বর সকলের পরিত্রাতা। তিনি তাহার ব্যবস্থা না করিয়া কি প্রেরণ করিয়াছেন? অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বক্তৃতার হিল্লোলে

অনেকেই আপন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া পরিশেষে পরিতাপ যুক্ত হইয়া নিজ পূর্ব্বভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে এ প্রকার দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। এজন্য বলিতেছিলাম যে, পরমহংসদেবের ধর্ম্মভাব সকলেরই কল্যানকর। অনেকের মুখে শ্রবণ করা যায় যে একজনকে ডুবিয়া যাইতে দেখিলে আর একজন কি তাহাকে উত্তোলন করিবে না? দেখিতেছি যে সকলে ভ্রমান্ধ হইয়া কতকগুলি কুসংস্কারের কুহকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় প্রায় বিঘূর্ণিত হইয়া বেড়াইতেছে। আমরা এ সকল বিষয়ে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইব না, তাহা স্থানান্তরে আলোচনার বিষয়। একথার আলোচনা করিতে হইলে আর একখানি পুস্তক লিখিতে হয় তাহা পরের কথা। ফলে পরমহংসদেব যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা সুবোধ সুবুদ্ধি এবং পরিপক মস্তিষ্ক-সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই অতি আদরের সহিত হৃদয়ে যে ধারণ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে আজ কাল অপরিপক যুবকদিগের হাতে লেখনী পড়িয়া বিভ্রাটের দ্বিতীয় পন্থা হইয়াছে। যাঁহাদের অদ্যাপি ধর্ম্ম প্রয়োজন হয় নাই, যাঁহারা ধর্ম্মের লাভালাভ কি তাহা তিলমাত্রও বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা ধর্ম্ম লইয়া নাড়াচাড়া ও মতামত প্রকাশ করিতে চাহেন, তাঁহাদের দ্বারা অনেক ব্যক্তির দিক্‌ভ্রম হইয়া থাকে।

এক্ষণে কথা হইতেছে, পরমহংসদেব কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তি?

অনেকের বিশ্বাস এবং আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত যে পরমহংসদেব সাধারণ সাধু কিম্বা সিদ্ধ পুরুষ নহেন। চৈতন্য, মহম্মদ, ঈশা প্রভৃতি যে শ্রেণীর ব্যক্তি রামকৃষ্ণও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া ধর্ম্মরাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তির মত। হিন্দুধর্ম্ম সংক্রান্ত সাধু শাস্তেরা একথা স্বীকার করিবেন; তাহাতে কোন কথা না হইতে পারে, কিন্তু অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা যখন সিদ্ধ পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, তখন সে কথা নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। কেশব বাবুর মনোভাব ইতি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সাধারণ সমাজের প্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকটে আমরা একদিন পরমহংসদেবের ধর্ম্মভাব বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া, গমন করিয়াছিলাম। তাঁহার কথায়, বলিতে কি পরমহংসদেবের প্রতি আমাদের ভক্তি সহস্রগুণে বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার

সে দিনকার সেরূপ কথা না শুনিলে হয় ত পরমহংসদেবকে বিশ্বাস করিতে আমাদের আরও বিলম্ব হইত। তিনি বলিয়াছিলেন যে, পরমহংসদেব যাহা উপদেশ দেন, সে সকল কথা কোন না কোন পুস্তকে লিখিত আছে; সেজন্য তাঁহার মহত্বতা না থাকিতে পারে; তবে মহত্বতা কোথায়? তিনি যে অনুরাগে গঙ্গাতীরে পতিত হইয়া মা মা বলিয়া কাঁদিতেন, সে অনুরাগ কাহার আছে? এই প্রকার অনুরাগ চৈতন্যের ছিল। তিনি কৃষ্ণ দর্শনের জন্য কেশোৎপাটন এবং মুখ-ঘর্ষণ করিতেন। সেই রূপ অনুরাগ ঈশার ছিল। তিনি চল্লিশ দিন অনাহারে ছিলেন, সেইরূপ অনুরাগ মহম্মদের ছিল, তিনি গুহাভ্যন্তরে বসিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী নিকটে যাওয়ায়, তাঁহাকে তরবারি দ্বারা কাটিতে আসিয়াছিলেন। ঈশ্বরের জন্য আত্ম-সমর্পণ, ঈশ্বরের জন্য জগৎ সুখ জলাঞ্জলী দেওয়া, এমন অনুরাগ নিতান্ত বিরল। ঈশার উপাসকেরা ঈশাকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদের লবণ স্বরূপ। কোন পদার্থ লবণ বিরহিত হইলে যেমন আস্বাদন বিহীন হয়, তেমনি প্রকৃত সাধু সাধারণ জীবের বিষয়াত্মক মনে প্রেম শিক্ষা দিয়া তাহাদের জীবনের বলাধান করিয়া থাকেন। পরমহংসদেবও তদ্রূপ। এমন ধর্ম্মাত্মা চারি শত বৎসরান্তে যে প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন, সে দেশের ধর্ম্মের অভাব হয় না।

পরমহংসদেবের জনৈক ভক্ত, গাজিপুরের পাহাড়ীবাবা নামক প্রসিদ্ধ সিদ্ধযোগীর নিকটে গমন করিয়াছিলেন। তিনি পরমহংসদেবের নাম শ্রবণ করিয়া কহিয়াছিলেন, তিনিত অবতার। এই সাধুর নিকটে পরমহংসদেবের একখানি ফটোগ্রাফ্ আছে। পরমহংসদেব এই নিমিত্ত হিন্দুমতে অবতার বিশেষ, সাধু কিম্বা ভক্ত নহেন এবং অন্য শ্রেণীর মতে তিনি সাধারণ সাধু অপেক্ষা যে শ্রেণীর ব্যক্তিরা মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আচার্য্য বিশেষ কার্য্য করিয়া ধর্ম্ম ভাবের তরঙ্গ উঠাইয়া দিয়া থাকেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সেই শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন। ফলে উভয় শ্রেণীর মত এক প্রকারই দাঁড়াইতেছে; কেবল কথার অর্থের কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। সে যাঁহা হউক, আমরা সর্ব্ব প্রথমে অবতার কাহাকে বলে, তাহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমাদের শাস্ত্রের আভাসে দুই প্রকার অবতারের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম বিশেষ অবতার এবং দ্বিতীয় খাণ্ডাবতার। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে

দশ অবতারের উল্লেখ আছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবতারের পরিমাণ করা হয় নাই, তাহা সংখ্যাতীত। এই নিমিত্ত প্রয়োজন মতে নূতন অবতার অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কহিয়া গিয়াছেন যে, শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। এই নিমিত্ত নূতন অবতার না হইবার কোন কারণ নাই। অবতার কাহাকে কহে? যেমন জড় জগতে সকল প্রকার পদার্থই প্রস্তুত হইয়া আছে। কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত নহে। যখন কোন অজ্ঞাত পদার্থ কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই ব্যক্তিকে আবিষ্কারক কহা যায়। যাহারা তাঁহাদের উপদেশ মতে উহা শিক্ষা করিয়া থাকে, সেই বিষয়ে তাহাদের পণ্ডিত কহে। চৈতন্য রাজ্যেও তদ্রূপ। অবতারেরা আবিষ্কারকদিগের ন্যায় এবং সিদ্ধপুরুষেরা পণ্ডিতদিগের সমতুল্য। যেমন আবিষ্কারকের সীমা নাই এবং তাহা হইবার নহে। কারণ কে কখন কোন পদার্থ আবিষ্কার করিবেন তাহা কে বলিতে পারে? সেই প্রকার অবতারেরও সীমা হইতে পারে না। ভগবান্ বিশ্বপতি তাঁহার বিশ্ব সংসারের অনন্ত ব্যাপারে ও অনন্ত কাণ্ডকারখানায় কোথায় কোন সময়ে কিরূপ প্রয়োজন মতে কার্য্য করেন বা করিবেন, তাহা মনুষ্য কখন ইয়ত্তা করিতে পারে না এবং তাহাতে প্রয়াস পাইলেও মূর্খতার প্রকাশ পাইয়া থাকে। তবে দূরদর্শী ব্যক্তিরা কার্য্যের পদ্ধতি দেখিয়া আভাসে কিছু বলিতে পারেন, তাহা সর্ব্বদা সম্পূর্ণ হইতে পারে না, এবং হইতেও দেখা যায় না।

দেশ কাল পাত্র বিচার পূর্ব্বক অবতারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। যখন অধর্ম্মের প্রাবল্য ও ধর্ম্মের সঙ্কোচিতাবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই অবতারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। যখন ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের কার্য্য হইতে আরম্ভ হয়, যখন লোকে পাপের সীমা অতিক্রম করিয়াও যাইতে উদ্যত হয়, যখন প্রত্যেক ব্যক্তি ধর্ম্মের বর্ণমালা না পড়িয়া ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া দাঁড়ায়, যখন শাস্ত্র বাক্য বিকৃত করিয়া আপনার সুবিধা মত অর্থ করিয়া অনর্থপাত ঘটাইতে আরম্ভ করে, তখনই ধর্ম্ম বিপ্লব কহা যায় এবং সেই বিপ্লবের তাড়নায় প্রকৃত ধার্ম্মিকেরা নিতান্ত ক্লেশ পাইতে থাকেন। ধর্ম্মরাজ্যের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যখন কোন অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন, তখনকার অবস্থা অবিকল ঐ প্রকার হইয়াছিল। যখন কংশের অধর্ম্মাচারে পৃথিবী

উত্যক্তা ও উৎপীড়িতা হইয়া ছিলেন, ভূভারহারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। রাবণের উৎপাতে রামচন্দ্রের অবতরণ; যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারে পশু হনন নিবারণের নিমিত্ত বুদ্ধের জন্ম; অদ্বৈত জ্ঞান বিলুপ্ত প্রায় হইয়া পৌরাণিক তেত্রিশ কোটি দেব দেবীর ভাব বিকৃত হওয়ায় শঙ্করের উদয়; তান্ত্রিক মতের বামাচার পদ্ধতির কদাকারের স্রোত প্রবাহিত হওয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গদেব হরিনাম বিতরণ করিয়া গৌরাঙ্গীয় প্রণালী প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন এবং বর্ত্তমান ভাব-শঙ্কর-কালে প্রকৃত ধর্ম্মভাব পুনঃ স্থাপন হওয়া প্রয়োজন, তাহার সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত এখন অবতারের প্রয়োজন? আমরা প্রথমে পরমহংসদেবকে সাধুর হিসাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেছি। সাধু যাহাদের বলে, তিনি তাহা ছিলেন না। তিনি যদিও পূর্ব্ব প্রচলিত ধর্ম্ম প্রণালী সাধন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কখন আবদ্ধ থাকিতেন না। শাক্ত হউন, শৈব হউন, বৈদান্তিক হউন, কিম্বা অন্য কোন মতাবলম্বীই হউন, তাঁহারা কেহ কখন তাঁহাদের মত পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কারণ মনুষ্য খণ্ড এবং ভাব অনন্ত। এই নিমিত্ত আমাদের দেশে যিনি যখন যে মতে সাধু কিম্বা সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি সেই মতের শিষ্যই করিয়া গিয়াছেন। পরমহংসদেবের তাহা ছিল না। এই নিমিত্ত তাঁহাকে সিদ্ধ বলা যায় না। সিদ্ধ বলিলে যাঁহাকে বুঝায়, তিনি কিন্তু তাহা ছিলেন এবং সিদ্ধ পুরুষেরা যাহা নহেন, তিনি তাহাও ছিলেন। অর্থাৎ সকল প্রকার মতে তাঁহার অধিকার ছিল। যে মতে যে কেহ সাধন ভজন করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তিনি তখনি তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন এবং যে কেহ সাধন কার্য্যে অশক্ত হইয়াছেন, তিনি নিজে তাহা সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। এ প্রকার সিদ্ধ পুরুষ কস্মিন্ কালে কেহ দেখেন নাই এবং শ্রবণও করেন নাই। এক ব্যক্তি মুসলমানকে মুসলমান ধর্ম্মে শিক্ষা দিতেছেন, সেই ব্যক্তি খৃষ্টানকে উপদেশ দিতেছেন, এবং সেই ব্যক্তি হিন্দু ধর্ম্মের বৃহৎ, শাখা এবং প্রশাখা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের গুরু রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। এ প্রকার সিদ্ধ পুরুষ কোন্ জাতিতে এবং কোন্ সম্প্রদায়ে ছিলেন বা আছেন? সুতরাং তিনি সাধারণ সিদ্ধ পুরুষ নহেন; কিন্তু তিনি যে, সকল মতেই সিদ্ধ ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই।

যে সকল সম্প্রদায়দিগের সহিত পরস্পর কস্মিন্ কালে মিল নাই এবং তাহা হইবার সম্ভাবনা নহে; যথা শাক্ত ও বৈষ্ণব, হিন্দু এবং মুসলমান ইত্যাদি এ প্রকার বিভিন্ন মতের লোকেরাও তাঁহার নিকটে তৃপ্তিলাভ করিতেন? কেবল তৃপ্তি নহে, সাধন লব্ধ বস্তু লাভ করিয়াছেন। কেবল তাহাও নহে, তাঁহাকে সেই সেই ভাবের অদ্বিতীয় গুরু রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এ প্রকার সিদ্ধ পুরুষের বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এক্ষণে কথা হইতেছে, তবে তিনি কি? কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তি? সাধারণ সিদ্ধ পুরুষ নহেন; তিনি মনুষ্য হইয়া এত ভাব এত মত, মনুষ্য যাহা কখন সক্ষম হয় নাই, তাহা আয়ত্ত করিলেন কিরূপে? পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, তোতাপুরী ৪১ বৎসরে কুম্ভকাদি সাধন করিয়া সমাধি প্রাপ্ত হন। পরমহংসদেব তাহা তিন দিনে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। এ কথা সামান্য রহস্যের নহে? একথা সাধু ব্যতীত কি আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিধারী অথবা তদ্‌পল্লিস্থ ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে? না আকাট সাম্প্রদায়ীক গোঁড়াদিগের বুদ্ধি বৃত্তি ধারণা করিতে সক্ষম হইবে? হঠযোগের একটী আসনে সিদ্ধ হইতে হইলে ক্লেশের পরিসীমা থাকে না, তাহা যাঁহারা করেন তাঁহারাই জানেন। প্রাণায়ামের বায়ু ধারণা করিতে কত লোকের কাশ রোগের উৎপত্তি হইয়া গিয়াছে, নেতি ধৌতি প্রক্রিয়ায় অন্ত্র রোগে কত সাধকের জীবনান্ত হইয়া গিয়াছে, এই সকল ক্রিয়ায় সিদ্ধ হইলে, তবে মনোসংযম হইতে পারে এবং সেই সংযত মন ক্রমে সমাধি প্রাপ্ত হয়। অতএব সমাধি কথাটা কথার কথা নহে? যত প্রকার সাধন আছে, তাহাদের প্রত্যেকটী নিতান্ত ক্লেশকর। সামান্য বর্ণ পরিচয় শিক্ষা করিতে কত ক্লেশ, সামান্য অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিতে কত যন্ত্রণা পাইতে হয়, তখন ঈশ্বর সাধনা কি মুখের কথা? না কেবল বিচারের বিষয়?

পরমহংসদেব প্রত্যেক সাধন প্রণালীতে সিদ্ধ ছিলেন তাহার আরও প্রমাণ আছে। যে ব্যক্তি যে বিষয়ের বিচক্ষণ সে ব্যক্তি সেই বিষয়ের উপদেশ এমন সরল ভাবে প্রদান করিতে পারেন যে, তাহা পঞ্চম বর্ষীয় বালকেও বুঝিতে পারে এবং যে বিষয়ে যে নিজে অজ্ঞ সে তাহা কাহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও কিছুই বুঝাইতে পারে না। আমি কাশি চক্ষে দেখি নাই; আমার দ্বারা কাশীর বর্ণনা যেরূপ

হওয়া সম্ভব, অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট উপদেশও তদ্রূপ। পরমহংসদেব গভীর ব্রহ্ম-তত্ত্ব, চলিত ভাবে চলিত রহস্য ছলে বুঝাইয়া দিয়াছেন, এই জন্য তিনি সিদ্ধ ছিলেন। যে ব্যক্তি সর্ব্ব ধর্ম্মে সিদ্ধ তিনি কে? তাঁহাকে সাধারণ সাধু বলা যায় না। সিদ্ধ পুরুষদিগের নিকটে সাধন ভজন আছে। তথায় কেহ শিষ্য হইলে তাহাকে নিয়মিত সাধন ভজন করিতে হয়, কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট তাহা ছিল না; সকলকেই বিনা সাধনে ও ভজনে তত্ত্বজ্ঞানী করিতে চাহিতেন, কিন্তু কালের বিচিত্র গতি, তাহাতে সকলের মনোমত হইত না; এমন কি কত লোকের জপের থলি তিনি নিজে কাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, সহস্রবার বলিয়াছেন, "বিশ্বাস কর, কোন চিন্তা নাই, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কখন মিথ্যা হইবার নহে।" তাহারা কোন মতে সেকথা লইল না। পুনরায় সাধন ভজন আরম্ভ করিল। তিনি আক্ষেপ করিয়া কতবার বলিয়াছেন, "গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণবের তিনের দয়া হল, একের দয়া না হ'তে জীব ছারে খারে গেল।" তথাপি তাঁহার কথা লইল না। সময়ে সময়ে বলিতেন, "এসে ঠেকেছি যে দায়, সে দায় কব কায়, যার দায় সেই জানে, পর কি জানে পরের দায়।" লোকে বিশ্বাস করিয়াও করিতে পারিল না। যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে, অদ্য তাহারা সুখ দুঃখ সমভাবে সহ্য করিয়া যাইতেছে। সম্পদে যেমন বিপদেও তেমন। সম্পদে তাঁহাকে মঙ্গলময় বলিয়া যেমন আনন্দ করিতে পারে, বিপদেও তাঁহাকে মঙ্গলময় রূপে দর্শন করে। এই বিশ্বাসী ভক্তদিগের সাধন নাই, ভজন নাই, তথাপি পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী। তাঁহার প্রসাদে যাহা হইবার নহে, তাহাও সচ্ছন্দে হইয়া গিয়াছে। অতএব তিনি সাধারণ সাধু কিম্বা সিদ্ধ ছিলেন না। সিদ্ধ ব্যক্তিদিগের নিকট পবিত্রতা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন। অপবিত্র কিম্বা দুশ্চরিত্র পাষণ্ডদিগের তথায় গমন করিবার অধিকার নাই। তথায় কার্য্য এবং অকার্য্য বলিয়া দুইটী তালিকা আছে। কতকগুলি কার্য্য করিলে পুণ্য হয় এবং কতকগুলি কার্য্য দ্বারা পাপ হয়। কতকগুলি কার্য্য নিষেধ এবং কতকগুলি কার্য্য প্রতিপালন করিতে হয়। সকল সম্প্রদায়ে কার্য্যের নিয়ম আছে। পরমহংসদেবের নিকটে তাহাও ছিল এবং তাহার বহির্ভূত ভাবেও কার্য্য হইত। সমাজ ছাড়া, ধর্ম্ম ছাড়া, জ্ঞান ছাড়া, কর্ম্ম ছাড়া পাষণ্ডগুলির ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব এ প্রকার

শক্তি সাধারণ সাধু বা সিদ্ধ পুরুষদিগের হইতে পারে না, তাহার দৃষ্টান্তও এ পর্য্যন্ত কেহ প্রাপ্ত হন নাই। সিদ্ধ বা সাধু ব্যক্তিরা যে অন্তর্যামী হইয়া থাকেন তাহার প্রমাণাভাব; কিন্তু তিনি অন্তর্যামী ছিলেন, তাহার পরিচয় অগ্রেই দিয়াছি। তিনি অঘটন সংঘটন করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা ভক্তের বিশ্বাসের জন্য কখন দেখাইয়াছেন, কিন্তু এ প্রকার শক্তি দেখান তাঁহার নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমেই হইত।

আমাদের শাস্ত্রে যদিও লিখিত আছে যে, সে কালের মুনি ঋষিরা যোগবলে ত্রিভুবন দেখিতে পাইতেন। তাঁহারা সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরের সমাচার প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। মুনি ঋষিরা মনুষ্য, অতএব অন্তর্যামী হইলেই সিদ্ধ বা সাধু বলা যাইবে না, তাহার হেতু কি? মুনি ঋষিরা সাধন করিয়া সে শক্তি পাইতেন এবং যোগাবলম্বন ব্যতীত সে শক্তি থাকিত না; কিন্তু পরমহংসদেবের ভাব স্বতন্ত্র প্রকার ছিল। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি সম্বন্ধে যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাতে যোগাবলম্বন কিম্বা কোন প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা যে অপরের মনোভাব জ্ঞাত হইতেন, এ প্রকার কোন ঘটনা প্রকাশ নাই। এই নিমিত্ত তাঁহাকে সাধারণ সিদ্ধ শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। যদিও কেহ কেহ বলেন যে, সিদ্ধ পুরুষেরা মনের কথা বলিতে পারেন; তাহা স্বীকার করিলেও সকল শক্তির সমষ্টি ধরিলে মিলিবে না। সিদ্ধ ব্যক্তিদিগের যে সকল শিষ্য থাকে, তাহারা স্থানান্তরে ইচ্ছা করিলে গুরুর সাক্ষাৎকার পাইতে পারে না। এ প্রকার প্রবাদ আছে যে, কোন কোন শিষ্য তাঁহার ভক্তির জোরে গুরুর দর্শন পাইয়াছেন। সে ক্ষেত্রে ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার গুরু সে বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। ভগবান্ গুরুর কার্য্য সম্পন্ন করেন। পরমহংসদেবের তাহা ছিল না। তিনি কখন ঢাকায় যাইয়া বিজয় বাবুর সম্মুখে বসিয়াছেন, আবার কখন রাণিগঞ্জের পাহাড়ে বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। কখন বলিতেন যে, "আমি স্বপ্নে দেখি যে, কত সাধু ভক্ত আমার নিকটে আসে।" আবার সাধু ভক্তেরা কহিতেন যে, পরমহংসদেব আমাদের নিকটে সর্ব্বদাই আগমন করিয়া কৃতার্থ করিয়া যান। তাঁহার সেই চৌদ্দপোয়া দেহটী এক স্থানে রাখিয়া এক সময়ে চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, ইহা সাধারণ সিদ্ধ ব্যক্তির শক্তিতে সঙ্কুলান হয় না।

সিদ্ধব্যক্তিরা ঈশ্বরের ঐশ্বরিক শক্তি কিঞ্চিৎ লাভ করেন বলিয়া, তাঁহাদের মধ্যে সেই শক্তির বিকাশ কখন কখন দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদের ভিতর দিয়া যে শক্তির কার্য্য হয়, তাহা হইতে পরমহংসদেবের শক্তির কার্য্য স্বতন্ত্র প্রকার। সিদ্ধব্যক্তির নিকটে যে যাহা প্রার্থনা করে, তাঁহারা প্রসন্ন হইলে, নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন। যেমন কেহ পুত্রার্থী হইলে পুত্র পায়, ধন চাহিলে ধন পায় এবং সাধন ভজন করিতে চাহিলে, তাহাও পাইয়া থাকে। কিন্তু এক সময়ে ঐশ্বর্য্য এবং সাধন তাঁহারা প্রদান করিতে পারেন না। পরমহংসদেবের সে শক্তি ছিল। এই মর্ম্মে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে নেপালের রাজপ্রতিনিধি বিশ্বনাথের কথা উল্লেখ কালীন বলা হইয়াছে যে, তিনি সর্ব্ব প্রথমে ঘুসড়ীর শালকাষ্ঠের কারখানায় গোমস্তা বিশেষ ছিলেন। পরমহংসদেবের নিকট যখন যাতায়াত করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে তহবিল তছরূপ অপরাধে নেপাল দরবারে হাজির হইবার জন্য আজ্ঞা করা হইয়াছিল। উপাধ্যায়ের মস্তকে এই সংবাদ অশনি পতন প্রায় বোধ হইল। তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন যে, তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, ইতস্ততঃ চিন্তা করিয়া তিনি পরমহংসদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং চরণে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেবের দয়া হইল। তিনি বলিলেন, "কালীর ইচ্ছায় আবার তুমি আসিবে।" তিনি কখন নিজ শক্তি দেখাইতেন না। বিশ্বনাথ নেপালে যাইয়া এমন হিসাব নিকাস দিয়াছিলেন যে, তিনি পুনরায় রাজপ্রতিনিধি হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। উপাধ্যায় ছিলেন রাখাল, হ'লেন রাজা। কিন্তু তিনি বিষয়ে লিপ্ত হইয়াও নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। এই প্রকার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি আছে, তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। এ প্রকার শক্তি কি সাধারণ সিদ্ধপুরুষে সম্ভবে?

সিদ্ধ পুরুষেরা মনে করিলেই লোকের মন পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া তাহাকে একেবারে অন্য প্রকার ছাঁচে ঢালিয়া নূতন গঠন দিতে পারেন না, এ কথা অস্বীকার করে কে? সিদ্ধপুরুষেরা আপন ভাবে বোধ হয়, চেষ্টা করিলে আর একজনকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকে নূতন নূতন ভাবে রঞ্জিত করা তাঁহাদের শক্তির বহির্ভূত কথা। পরমহংসদেবের সে শক্তি ছিল, সেই জন্য তাঁহাকে সাধারণ সিদ্ধপুরুষ বলিলে অযৌ-

ক্তিক কথা বলা হইবে। তর্কচ্ছলে সিদ্ধপুরুষদিগের এই সকল শক্তি স্বীকার করিলেও সে কথা আমাদের হিসাবের বাহিরে যাইতেছে। কোন্ সিদ্ধ-পুরুষ দুঃখী, তাপী, পাপীর জন্য চিন্তিত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে-ছেন? কোন্ সিদ্ধপুরুষ অজ্ঞান ভবঘোরাক্রান্ত নরনারীর জ্ঞানচক্ষু ফুটা-ইয়া দিবার জন্য আপন ইচ্ছায়, অনুসন্ধান করিয়া, তাহার বাটীতে যাইয়া কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন? কোন্ সাধুর প্রাণ, অনাথ অনাথিনীর জন্য কাঁদে? পামর, দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের তাড়না অঙ্গের ভূষণ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, তাহারা বাটীতে যাইতে দিবে না, পবিত্রতা লইবে না, তথাপি জোর্ করিয়া কোন্ সাধু যাইয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন? যিনি সিদ্ধ তিনি সিদ্ধ, তাহাতে তোমার আমার কি? যে ধনী, সে আপন বাটীতে বড়, তাহাতে কি আমার উদর পূর্ণ হইবে? কিন্তু যে ব্যক্তি মুক্ত হস্ত হইয়া দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন, তাঁহাকেই দাতা বলে। তিনিই লোকের উপকারী বন্ধু, তিনিই প্রকৃত ধনী।

পরমহংসদেব নিজে যে সাধন কষ্ট পাইয়াছেন, তিনি তাহার পুরস্কার কত পাইয়াছিলেন? লক্ষ্মীনারায়ণের দশ হাজার, মথুর বাবুর পঞ্চাশ হাজার অন্তত এ সকল টাকায় তিনি কত সুখ সম্ভোগ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া অতি সামান্য ভাবে থাকিয়া সাধারণের হিতসাধনেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এ প্রকার সাধু বা সিদ্ধ কস্মিন্ কালে কেহ আসেন নাই। অতএব পরমহংসদেব কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তি? গৌরাঙ্গ প্রভৃতি অবতারদিগের যে রূপ স্বভাব ছিল, পরমহংসদেবের স্বভাব প্রায় সেই প্রকার ছিল। গৌরাঙ্গদেব যেমন জীবের দুঃখে সর্ব্বদাই কাতর থাকিতেন, পরম-হংসদেব সে সম্বন্ধে তাঁহা অপেক্ষা কোন মতে কমি নহেন। জগাই মাধাই কর্ত্তৃক গৌরাঙ্গদেব যে প্রকার উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, পরমহংসদেব সে বিষয়ে নিতান্ত অব্যাহতি পান নাই। গৌরাঙ্গদেব বিদ্যাবলে সার্ব্বভৌম প্রভৃতি পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করিয়া মহিমা বিস্তার করিয়াছিলেন, পরমহংসদেব নিরক্ষর হইয়া কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রোফেসার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকদিগকে বিচারবলে পরাজয় করিয়া গিয়াছেন। গৌরাঙ্গদেব অলৌকিক কার্য্য দ্বারা অবিশ্বাসীর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পরমহংসদেবের সে শক্তির ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। গৌরাঙ্গদেব ষড়ভুজাদি দেখাইয়াছিলেন, পরমহংসদেব মথুর বাবুকে কালা-

রূপে এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে অন্য রূপে দেখা দিয়াছেন। এই সকল লক্ষণের সহিত উভয়ের সাদৃশ্য দেখিয়া সকলেই তাঁহাদের এক শ্রেণীতে আবদ্ধ করিতে চাহেন। মোট কথা অবতারদিগের যে সকল লক্ষণ যথা ;—

১ম জীবে দয়া, ২য় সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান, ৩য় পতিত ব্যক্তির উদ্ধার কর্ত্তা, ৪র্থ ধর্ম্মের সামঞ্জস্যভাব, ৫ম পরম বৈরাগী, ৬ষ্ঠ জৈবধর্ম্ম বিবর্জ্জিত, ৭ম অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন, ৮ম আদিষ্ট ধর্ম্মের নূতন ভাব, ৯ম অবতারদিগের নিকটে কর্ম্ম থাকে না। পরমহংসদেবের এ সকল লক্ষণই ছিল। এইজন্য তিনি অবতারের শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া দেখা যাইতেছে।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, আমাদের শাস্ত্রের দ্বারা এই অবতারের প্রমাণ করা যায় কি না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া কিরূপে মানবগণ সংসারে থাকিয়া যোগ, ভোগ, এককালীন সাধন করিতে পারিবে, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আপনি দেখাইয়া গিয়াছেন। সংসারে থাকিতে হইলে ভাব আশ্রয় ব্যতীত কেহ বাঁচিতে পারে না। সেইজন্য তিনি বৃন্দাবনে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি পঞ্চবিধ ভাবের পূর্ণ ভোগ এবং তাহা হইতে এককালে বিরত হইয়া মথুরাদি স্থানে লীলা বিস্তার কালীন যোগ বা বৈরাগ্য ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় কার্য্য এইরূপ যোগ ভোগের দৃষ্টান্ত স্থল। আপনি যদুবংশ বিস্তার করিয়া তাহা নিজ কৌশলে সংহার করিয়াছেন। কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধে উভয় কুল নির্ম্মূল হইবে জানিয়াও অর্জ্জুনকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাহাতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতারের পূর্ব্বোক্ত ভাবের কার্য্য দ্বারা লোকে তাঁহাকে পূর্ণাবতার বলিয়া থাকে। কেবল যোগ ভোগের নিমিত্ত যে তাঁহাকে পূর্ণাবতার কহা যায় তাহা নহে। তাঁহাকে যে কেহ যে কোন ভাবে, যে কোন নামে ডাকিবে সেই সাধকদিগের সেই ভাবে ও সেই নামে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ইহাতেই পূর্ণ ভাবের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ সংসারে থাকিয়া বৈরাগ্য শিক্ষা যে সুন্দর রূপে দিয়া গিয়াছেন, তাহা গীতায় প্রকাশ রহিয়াছে। শরীর সম্বন্ধে ভোগ অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধ বিশেষে কার্য্য করা দেহের ধর্ম্ম এবং ভগবানে যোগ, তাহা মনের কর্ম্ম। অর্থাৎ মনে ঈশ্বর দেহে সংসার, ইহাকেই পরমহংসদেব নির্লিপ্ত ভাব কহিতেন। তাহার দৃষ্টান্ত যথা "বাটীর পরিচারিণী ; গৃহস্থের সকল কাজ

কর্ম্ম সে আপনার ন্যায় সমাধা করে, সন্তানাদিকে স্নেহ ও যত্ন করে, মরিয়া গেলে কাঁদে; কিন্তু মনে জানে যে এরা তাহার কেহ নহে। তাহার দেশ, ঘর বাড়ী ছেলে পুলে স্বতন্ত্র আছে।”

শ্রীকৃষ্ণ যোগ ভোগ শিক্ষা দিয়া সরাট এবং বিরাট রূপ দেখাইয়া পরে বলিয়াছিলেন, “যে আমায় যেরূপে উপাসনা করে, আমি তাহার মনোরথ সেইরূপে পূর্ণ করিয়া থাকি, হে অর্জ্জুন! পৃথিবীর লোকেরা যদিও নানা মতাবলম্বী কিন্তু তাহারা আমারই উপাসনা করিতেছে।”

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা তিনি কার্য্য করিয়া দেখাইলেন না, কারণ তখন তাহার সময় উপস্থিত হয় নাই। বহু মত, বহুভাব, বহু সম্প্রদায় না হইলে ও কথার প্রয়োজন হইবে না; কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইবে তিনি জানিয়া প্রস্তাবনা করিয়া গিয়াছিলেন। প্রস্তাবনা না করিলে তাহা এক্ষণে লোকের বুঝিবার পক্ষে গোলযোগ হইত। সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ একথা না বলিলে আজ কি আমরা পরমহংসদেবের ভাব অনুধাবন করিতে পারিতাম?

কৃষ্ণাবতারের পর গৌরাঙ্গ অবতার। কৃষ্ণাবতারে যাহা সবিশেষ করিয়া জীবের শিক্ষা হেতু প্রদান করেন নাই, তাহা অভিনয় করাই তাঁহার অবতীর্ণ হইবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ তিনি সাধক হইয়া কিরূপে নাম সাধন করিতে হয় এবং তাহার ফলই বা কিরূপ, তাহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট জাতিভেদ, মান অপমান, ধনী নির্ধনী সকলই সমান, তাহারও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। অবতারের নিকট সাধন ভজন করিতে হয় না। একবার যে ভাগ্যবান্ তাঁহার সাক্ষাৎ পায়, তাহার সকল বিষয়ই সিদ্ধ হইয়া যায়। গৌরাঙ্গ-লীলায় তাহার সবিশেষ প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। তিনি অদ্বৈত, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ এই তিন রূপে মানবদিগের আধ্যাত্মিকতত্ত্বের শিক্ষা বিধান করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ সাধকদিগের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে যে অবস্থার প্রয়োজন, তাহা উপরোক্ত রূপত্রয় দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে। জীব, একমেবা দ্বিতীয়ং, অর্থাৎ দ্বৈতভাব বিরহিত হইলে, তাহার তখন সর্ব্বত্রে চৈতন্যোদয় হইয়া থাকে। সর্ব্বচৈতন্যময় যাঁহার বোধ হয়, তিনিই তখন নিত্য বস্তু লাভ করেন; সুতরাং নিত্য আনন্দ তাঁহারই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব নামের মহিমা, জাতি ভেদ চূর্ণ করিয়া সর্ব্বজীবে সম দয়া দ্বারা প্রেমের অপূর্ব্ব

ভাব, অপবিত্র, পতিত, পাপপরায়ণ এবং পূর্ণ পাপিষ্ঠদিগকে উদ্ধার করিয়া পতিত পাবন নাম এবং অদ্বৈত, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ দ্বারা জীবের আধ্যাত্মিকভাব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যেমন বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি দ্বারা ব্রহ্ম এবং হ্লাদিনী শক্তির কার্য্যের ভাব দেখাইয়াছেন অর্থাৎ তথায় আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই। সখিদিগের কার্য্য দ্বারা মনোবৃত্তিদিগের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,সেইরূপ ঐ তিন রূপে জীবগণের তিনটী ভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। জীবের যে পর্য্যন্ত অদ্বৈত জ্ঞান লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের চৈতন্যোদয় হইতে পারে না। অদ্বৈত জ্ঞান হইলে সে ব্যক্তির তখন সর্ব্বত্রে চৈতন্য স্ফূর্ত্তি পায় অর্থাৎ "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূরে"। যাঁহার সর্ব্বচৈতন্যজ্ঞান হয়, তাঁহার সুতরাং নিত্য আনন্দ সর্ব্বদাই সম্ভোগ হইয়া থাকে, নিত্যানন্দ দ্বারা জীবের এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আর যে সকল ভাব অবশিষ্ট ছিল, তাহা তিনি তৎকালে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বোধ না করিয়া, পুনরায় দুই বার আসিবেন, এই প্রকার স্পষ্ট আভাষ দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কিরূপে এবং কোন সময়ে, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পরমহংসদেব নূতন দুইটী ভাব সম্পূর্ণ করিয়াছেন। গীতার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" শ্লোকটীর তাৎপর্য্য তিনি আপনি সাধন করিয়া এই বর্ত্তমান ধর্ম্ম-প্রলয় কালে শান্তি বিধান হইবার উপায় করিয়া গিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন যেমন "কোন পুষ্করিণীর ৪টী ঘাট আছে, এক ঘাটে হিন্দু, এক ঘাটে মুসলমান, অপর ঘাটে অপর ব্যক্তিরা জল পান করিতেছে। এক জলাশয়ের ৪টী ঘাট এই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ঘাটে জল পান করিলেও কাহার দোষ হইতেছে না কিম্বা কাহার পিপাসা নিবারণের ব্যতিক্রম হইতেছে না। অথবা গঙ্গায় কত বিভিন্ন জাতি স্নান করিতেছে, জল পান করিতেছে, তাহাদের ইচ্ছামত ঘাটও নির্ম্মাণ করিতেছে। হিন্দুর ঘাট, মুসলমানের ঘাট, সাহেবদের ঘাট প্রভৃতি কত ঘাট রহিয়াছে কিন্তু তাহাতে এক অদ্বিতীয় গঙ্গার কি পরিবর্ত্তন হয়? হিন্দু দেখে পতিত পাবনী গঙ্গা, তাঁহাদের প্রাণ মন সেই ভাবে বিভোর হইয়া যায়, অন্য জাতিতে দেখে সুন্দর নদী, তাহাদের সেই ভাবে আনন্দ হয়; অতএব এক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন প্রকার কার্য্য হয়। যদিও ইতিপূর্ব্বে কোন কোন শাস্ত্রে এবং আধুনিক রামপ্রসাদ, তুলসী দাস ও কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণ, সকলই একের কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া

গিয়াছেন; কিন্তু গীতার ভাব ঠিক তাহা নহে। গীতার প্রকৃত ভাব পরমহংসদেবের পূর্ব্বে কোন ঋষি মুনিও তাহা জানিতেন কিনা সন্দেহের বিষয়; তাহা হইলে তাহার কার্য্য হইতে দেখা যাইত। পরমহংসদেব যেরূপে গীতার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের শিক্ষা দিয়াছেন, সে প্রকার কার্য্য হইলে কি আজ এ দেশে ঘরে ঘরে স্বতন্ত্র ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া পরস্পর কলহ ও বিবাদ হইতে পারিত? পরমহংসদেব প্রদর্শিত ভাবটী কার্য্যে পরিণত হইতে যে কত দিন লাগিবে, তাহা এখন বলা যায় না, কারণ তাঁহারই শিষ্য বৃন্দের মধ্যে অদ্যাপি অনেকেই তাহার মর্ম্ম সম্যকরূপে আয়ত্ব করিতে পারেন নাই। তাঁহারা এখন যে যাঁহার মতে সাধন করিতেছেন, তাহাতে সিদ্ধ হইলে এই ভাবে রঞ্জিত হইবে। এ কথা আমাদের নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা সিদ্ধান্ত করিলাম। কথিত রামপ্রসাদ প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষেরা, সকল মূর্ত্তি ও ভাব একের স্বীকার করিয়া আপনাপন ভাবে পর্য্যবসিত করিয়া গিয়াছেন; সিদ্ধ পুরুষদিগের নিকট ইহার অতীত কিছুই প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। রামপ্রসাদ কহিয়াছেন "কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে" ইত্যাদি। এ স্থানে কালীতে অর্থাৎ প্রসাদের নিজ ভাব দ্বারা কৃষ্ণকে দেখিতেছেন। যেমন আমার ঘাট যে পুষ্করিণীতে, সেই পুষ্করিণীতে তুমি জলপান করিতেছ; কিন্তু গীতার ভাব তাহা নহে। কারণ ঘাট হইতে পুষ্করিণী হয় না, পুষ্করিণী হইতে অনন্ত ঘাটের উৎপত্তি হইতে পারে। কালী হইতে কৃষ্ণ নহেন, শিব নহেন, রাম নহেন। কারণ কালী বলিলে ভাব বিশেষ বুঝায়। আদি শক্তি পুষ্করিণী বিশেষ। অনন্ত রূপাদি বা ভাব, ঘাটের ন্যায় বুঝিতে হইবে। অথবা যেমন সূর্য্য এক মধ্যবিন্দু। তাহার রশ্মি ছটা ঐ বিন্দু হইতে পরিধি পর্য্যন্ত সরল-রেখা বিশেষ। এই পরিধির বিন্দু হইতে সরল-রেখা দ্বারা সূর্য্য দেখা যায় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া পরিধির বিন্দু অপর বিন্দুর উৎপত্তির কারণ বলা যাইতে পারে না। সূর্য্য হইতে সকল বিন্দুর উৎপত্তি হয়। এই জন্য সকল বিন্দুই সত্য। যেমন "গঙ্গার ঢেউ হয়, ঢেউয়ের গঙ্গা হয় না" কিম্বা মাতা হইতে সন্তান জন্মে সন্তান হইতে পিতামাতার উৎপত্তি হয় না। সেইরূপ এক আদি স্থান হইতে সকল ভাব ও রূপাদি জন্মিয়া থাকে, ভাব বা রূপাদি হইতে অন্য ভাব বা রূপাদি হয় না। যেমন মাটী হইতে বাসন প্রস্তুত করা হয়। মৃণ্ময় পাত্র বিশেষ অন্যান্য পাত্রের আদি কারণ নহে।

যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল, ইহার দ্বারা পরমহংসদেব এই দেখাইয়া-

ছেন যে, ভাবটী স্বতন্ত্র কিন্তু যাহা হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, তাহা স্বতন্ত্র নহে। তেমনি যিনি কালী, তিনি শিব, তিনিই রাম বটেন। কিন্তু কালী, শিব, রাম এক বলিলে ভাবের ভুল হয়। এই নিমিত্ত রামপ্রসাদের "কালী হলি মা রাসবিহারী।" কথার ভাবে দোষ ঘটিয়াছে। যেমন এক স্বর্ণ হইতে নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত হয়। যত গুলি যে ভাবের অলঙ্কার হউক না কেন উপাদান কারণ স্বর্ণের তারতম্য হয় না। এস্থানে এক সোনা সকল অলঙ্কারের আদি কারণ; কিন্তু কর্ণাভরণ কণ্ঠাভরণের উৎপত্তি কারণ বলিলে ভাবের ভুল হয়। তেমনি তুলসী দাসের কথায় দেখা যায়, "ওই রাম দশরথ্‌কি বেটা, ওই রাম ঘট্ ঘট্‌মে লেটা, ওই রাম জগৎপসেরা, ওই রাম সব্‌সে নেহারা" তুলসী দাস এস্থলে দশরথাত্মজ রামকে সর্ব্বত্রে দেখিতেছেন। ফলে কর্ণাভরণকে কণ্ঠাভরণ কহার ন্যায় হইতেছে। যদ্যপি একথা বলা হয় যে, আদি কারণ ধরিয়া তাঁহারা কহিয়াছেন, তাহা হইলে দশরথাত্মজ শব্দ প্রয়োগ করায় ভাবের দোষ ঘটিয়া গিয়াছে। দশরথাত্মজ পরিধির বিন্দু বিশেষ তাহা মধ্য বিন্দু সূর্য্য স্বরূপ নহে। পরমহংসদেবের ভাব এই জন্য বলিতে হইতেছে গীতার ভাবের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়াছে। এই ভাবটী সেইজন্য একটী নূতন সুতরাং তিনি অবতার।

দ্বিতীয় নূতন ভাব এই যে, তিনি একাধারে অদ্বৈত, চৈতন্য এবং নিত্যানন্দের ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে সর্ব্বত্রে এক দেখিতেন, এক জানিতেন এবং এক ভাবেই কার্য্য করিতেন। তাঁহার উপদেশ এই যে, "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।" অর্থাৎ সাধনই কর আর ভজনই কর, যে পর্য্যন্ত অদ্বৈত জ্ঞান লাভ না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই হইবে না। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবার পক্ষে বিঘ্ন ঘটিবে। ঈশ্বর এক এবং তিনিই বহু, এ জ্ঞান না থাকিলে এবং না থাকার নিমিত্ত, আমাদের দেশে এত দলাদলি ও দ্বেষাদ্বেষী জন্মিয়াছে; কিন্তু পরমহংসদেব কি বলিয়াছেন যে, যেমন করে ইচ্ছা ধর্ম্ম সাধন কর, যেমন ভাবে হউক, যেমন রূপেই হউক, এক ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া যে উপাসনা করে, তাহার উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। তিনি এই নিমিত্ত বলিতেন, এক জ্ঞান অর্থাৎ এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, এই জ্ঞানকে প্রকৃতি জ্ঞান কহিতেন এবং যে স্থানে বহু জ্ঞান থাকিবে সে স্থানে অজ্ঞান কহিতে হইবে। যেমন আলোক

দেখিলে এক সূর্য্যেরই জ্ঞান হয়, তেমনি বহু জ্ঞান থাকিলেও এক জ্ঞানে তাহা পর্য্যবসিত করা উচিত। ঈশ্বর তত্ত্ব লাভ করিতে হইলে যাহাতে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত একমেবাদ্বিতীয়ং জ্ঞান ধারণা না হয়, সে পর্য্যন্ত তত্ত্ব বোধ হইতে পারে না। একের দৃষ্টান্ত, তিনি এই নিমিত্ত কহিতেন, মনুষ্যজাতি এক, জল সর্ব্বত্রে এক, বায়ু সর্ব্বত্রে এক, সোনা, রূপা, লৌহ, সর্ব্বত্রে এক। একের বহু যথা, মনুষ্যজাতি এক হইয়াও কেহ কাহার সহিত সমান নহে। এক মাতৃগর্ভের দুইটী সহোদর এক প্রকার নহে। জল এক জাতি, কিন্তু বরফ বাষ্প এক প্রকার নহে। পাতকোয়া, খাত, নদী, সমুদ্র, এক প্রকার নহে; সেইরূপ ধর্ম্মও এক বটে, কিন্তু আধার বিশেষে রূপান্তর দেখায় মাত্র। অতএব যাহার অদ্বৈত জ্ঞান থাকিবে সে কখন ধর্ম্মের ভাল মন্দ বিচার করিতে পারিবে না।

ধর্ম্ম যদ্যপি এক হয় তাহা হইলে যে যাহা করিবে, সে তাহার আপন অবস্থানুসারে পরিচালিত হইবে। সে অবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার কাহারও অধিকার কিম্বা সাধ্য নাই। তাহার দৃষ্টান্ত আজ শতাধিক বৎসর অতীত হইল খৃষ্টানেরা এদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা হউক কয়জনকে খৃষ্টান করিতে পারিয়াছেন? যাহারা ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহাদের কিছুই ধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না। এরূপ ভাবে প্রচার না করিয়া যদ্যপি ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেন, তাহা হইলে বাস্তবিক কার্য্য হইত; কিন্তু সে ভাব পাইবেন কোথায়? পরমহংসদেব যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার দ্বারা কাহার না প্রাণ উত্তেজিত হয়? কাহার মস্তক না তাঁহার চরণ তলে আপনি যাইয়া পতিত হয়? এক ঈশ্বরের, শক্তি বিশেষ জ্ঞান করিয়া যে যাহা করিবে, তাহাতেই তাহার পরিত্রাণ হইবে। তিনি এ পর্য্যন্ত বলিয়া দিয়াছেন যে, যদিই ভাবে কোন প্রকার দোষ থাকে, তাহা অকপট এবং সরলতায় পূর্ণ থাকিলে ভগবান নিজে তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন। কারণ তিনি সৎ অসৎ নহেন, তিনি অন্তর্যামী সুতরাং মনের ভাব লইয়া তাঁহার কার্য্য। ভাবের ঘরে চুরি না থাকিলে ঈশ্বর প্রাপ্তির কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না।

তিনি সর্ব্বত্রে চৈতন্যময় দেখিতেন। তাহা তাঁহার সাধনকালীন বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাকে যে যখন যেমন অবস্থায় দেখিয়াছেন, আনন্দ বিরহিত

বলিয়া কখন দেখা যায় নাই। তবে সাধকাবস্থায় কিম্বা অন্য কোন সময়ে যদিও সাময়িক ভাবান্তর দেখাইয়াছেন, তাহা জীবশিক্ষার্থ লীলা-বিশেষ।

পরমহংসদেব, পূর্ব্বাবতারের অসম্পূর্ণ ভাব সকল সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহার নিজের শক্তিও দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, "যে কেহ এস্থানে কিসে ঈশ্বরকে জানিব, কিসে তত্ত্বজ্ঞান হইবে, এই উদ্দেশ্যে আসিবে, তাহারই মনোরথ পূর্ণ হইবে।" এ কথা স্বয়ং পরিত্রাতা ভিন্ন অন্য কাহার বলিবার অধিকার নাই। মহাসিদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াও আপনাকে কেহ কখন আর একজনের জন্য দায়ী করিতে পারেন না। পাপীর পাপ লইয়া, এক ভগবান্ ভিন্ন জীবকে পরিত্রাণ করিতে কে পারেন? অবতারেররা এক জাতি। তাঁহারা যে দেশে যেরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য ধারা যেন সকলেরই এক প্রকার। যীশু যেমন পাপিদিগের পরিত্রাণের জন্য আপনার শোণিত দান করিয়াছিলেন, পরমহংসদেবের ব্যাধি অবিকল তদনুরূপ। ইহা তাঁহার শ্রীমুখের কথা।

পরমহংসদেব যে সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে সময়টীকে বাস্তবিক ধর্ম্ম-বিপ্লব কাল কহা যায়। ধর্ম্ম কোথায়? কোন্ সম্প্রদায়ে পূর্ণ ধর্ম্মভাব আছে? যে সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিকে প্রকৃত ব্যবসাদার ব্যতীত অন্য নামে উল্লেখ করা যায় না। তাঁহারা নিজে ধর্ম্মের বর্ণমালা কণ্ঠস্থও করিতে পারেন নাই, তাঁহারা দেশের জন্য ব্যতিব্যস্ত। আমরা নানা স্থানে দেখিয়াছি, তাঁহারা উপাসনা করেন, ভ্রাতা ভগিনীর জন্য, দেশ বিদেশস্থ ছোট বড় নরনারীর জন্য, কিন্তু আপনি পরক্ষণেই ভিক্ষা প্রাপ্তির নিমিত্ত হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। এ সকল অধর্ম্মের ভাব। নিজে অসিদ্ধ, নিজে মূর্খ, অপরকে সিদ্ধ করিবার জন্য, অপরকে পণ্ডিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা হইতেছে, ইহার অর্থ কি?

এই স্থানে আমাদের স্ব-সম্পর্কীয় সাধারণ হিন্দুদিগকে দু' কথা বলিয়া এই গ্রন্থ পরিসমাপ্তি করিব, কারণ আপনারা নিজে দৃষ্টান্ত স্বরূপ না গঠিত হইতে পারিলে, অপরকে তাহা বলা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমাদের ত কথাই নাই, পুরাতন বনিয়াদি পরিবার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে যেমন হয়, আমরা তদ্রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ বিষ নাই, কুলোপানা চক্র। হিন্দুর আচার ভ্রষ্ট, ব্যবহার ভ্রষ্ট, ভাব ভ্রষ্ট ও কার্য্য ভ্রষ্ট হইয়া পুরাতন কথাগুলি লইয়া মস্তক নাড়িয়া আস্ফালন করিয়া থাকি।

অবসর, সুবিধা এবং স্বার্থ হিসাবে আপনাকে তদনুরূপ পরিচয় দেওয়া বর্ত্তমান হিন্দুদিগের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনাতে আর্য্যের এক পরমাণু লক্ষণ নাই, আর্য্য আর্য্য বলিয়া মেদিনী বিকম্পিত করা হইতেছে। যাহা হইবার নহে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত গলাবাজী কিম্বা কলমবাজী করা যার পর নাই মূর্খতার কার্য্য তাহাও হইতেছে। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এ কালে আর নাই বলিলে প্রকৃত কথা বলা হয়। বাহ্যিক ধূমধামই হ'ল কাল ধর্ম্ম। বক্তৃতা, ভোজন, বস্ত্রদান, পয়সা দিয়া বক্তা আনয়ন, ধর্ম্মের চূড়ান্ত হইয়া গেল। হরিসভাগুলি এই মর্ম্মে সংগঠিত হইয়াছে। বিলাতী ঢংএ ব্রাহ্ম সমাজ গঠিত হয়, তাহার নকল হরিসভা। হিন্দুদিগের কোন্ শাস্ত্রে কোন্ কালে সভা ছিল? সভা থাকিবে কি? ধর্ম্ম সাধন করা ত দেখাইবার নহে, তাহা প্রাণের কথা, সময়ের নিয়মাধীন নহে। গৌরাঙ্গদেব সভার আভাস দেন নাই। তিনি নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই হউক, বক্তৃতা কেন? এ ইংরাজী ঢং হরিসভায় না প্রকাশ করাইলে কি চলিত না। আমরা দেখিয়াছি যে, ১২ বৎসরের শিশু কোন হরিসভায় বক্তৃতা করিয়াছে। সে দুগ্ধপোষ্য বালক আজও স্কুলে পাঠ করিতেছে। ধর্ম্মের মর্ম্ম হয় ত তাহার পিতামহ আজও বুঝেন নাই, সে বালক বক্তৃতা দিল, হরিনামের মহিমা বিস্তার করিল, চতুর্দ্দিকের কর তালীতে তাহাকে মাতাইয়া তুলিল।

বিদ্যালয়ে গমন পূর্ব্বক বিদ্যাভাস না করিয়া কেহ কি কখন সভায় গমন করিতে পারেন? না তথায় কোন বিষয়ের মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার হয়? ধর্ম্ম সভাদিও তদ্রূপ। ধর্ম্ম শিক্ষা কর, ধর্ম্ম কি জান, তাহার পর বাহ্যিক আড়ম্বর করিতে যদি ভাল লাগে ত করিও। বৃথা সময় অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য নহে। দিন দিন গণা দিন কমিতেছে। যাইতে হইবে। কোন সময়ে, কখন, তাহার স্থিরতা নাই। জীবন খাতা খানা একবার খুলিয়া দেখ, কোন খাতে কত জমা এবং খরচের খাতেই বা কি লিখিত হইতেছে। বাল্যকালে খেলা ধূলায়, কৈশোরে অর্থকরী বিদ্যোপার্জ্জনে, যুবায় রসক্রীড়ায়, প্রৌঢ়াবস্থায় সন্তান সন্ততির পরিণাম চিন্তায় এবং অর্থোপার্জ্জনের গোলযোগে কাটিয়া গেল, পরে বার্দ্ধক্য,—তখন সকল শক্তি ফুরাইয়া আসিল। ব্যাধি, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি নানা উপদ্রব আসিয়া জুটিল; তখন উপায় কি হইবে ভাবিয়া যে আর কুল কিনারা দেখা যায় না। কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্মের জন্য চিন্তা কি? আমরা ইচ্ছা করিয়া আপনারা ক্লেশ পাইব, ইচ্ছা

করিয়া ভাব বিকৃত করিব, ইচ্ছা করিয়া বাহিরের লোকের নিকট উপদেশ লইব, তাহাতে কষ্ট না হইয়া আর কি হইবে? প্রত্যেক পরিবারের কুল গুরু আছেন, বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের নিকট দীক্ষিত হউন; একমনে আপন ইষ্ট চিন্তা করুন, দেখিবেন, কি সুখের পারাবার উপস্থিত হইবে। ভাল জিজ্ঞাসা করি, এত দিন ত খৃষ্টানেরা এ দেশে আসেন নাই, এত দিন ত ব্রাহ্মদল বাঁধে নাই, এতদিন ত ধর্ম্মের রূপক অর্থ বাহির হয় নাই, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা কি সকলেই নিম্নগামী হইয়া গিয়াছেন? যদ্যপি তাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের মানসিক শক্তির একটা দৃষ্টান্ত, কেহ মনে করেন তাহা হইলে দেখিবেন যে, তাঁহারা কি ছিলেন এবং সেই গুণে তাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন সুখে দিন যাপন করিয়া গিয়াছেন। এ কথা কেন বলিলাম? দ্বেষভাবে নহে। আমরা হিন্দুসন্তান, হিন্দুস্থানে জন্ম, হিন্দু শোণিত ও হিন্দু ভাবে জন্ম; সুতরাং এ অবস্থায় ইংরাজী ধর্ম্মভাব আমাদের সম্পূর্ণ বিদেশীয়। আমাদের শারীরিক কিম্বা মানসিক কোন ধর্ম্মের সহিত ইউরোপীয়দিগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে? যদিও কতকগুলি বৃত্তি বা ধর্ম্মের, এক মনুষ্য জাতীয় হিসাবে স্থূল ভাবে মিলিবে, কিন্তু সূক্ষ্মাদিতে কখনই মিলিতে পারে না। এই নিমিত্ত হিন্দু হইয়া যাঁহারা ইউরোপীয় ভাব লইতে যান, তাহা কেবল অনুকরণ হইয়া যায়। যে পর্য্যন্ত সেই হিন্দুশোণিত পরিবর্ত্তিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত সে ভাব কখনই প্রস্ফুটিত হইতে পারিবে না। এই জন্য ভাব বিকৃত হইবার ভয়ে এ প্রকার কথা বলা হইল।

আমরাও এখনকার লোক তাহার পরিচয় দিয়াছি। আমরাও সভা ঘুরিয়াছি, বিজ্ঞান শাস্ত্র পড়িয়াছি, পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি প্রসূত ধর্ম্মকথা শুনিয়াছি কিন্তু সে সকল তৃণ অপেক্ষাও মুল্য বিহীন বলিয়া ধারণা এবং প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করিবার জন্য বেশী বুদ্ধি, বেশী বিদ্যা, বেশী জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। পরমহংসদেব তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই শিক্ষা দিবার জন্য তিনি জন্মিয়াছিলেন। যদিও তাঁহাকে আমরা অবতার বলিলাম কিন্তু সে কথা অন্যে এক্ষণে নাও বলিতে পারেন, তাঁহাকে একজন মনুষ্য বলিয়া তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন কি সুন্দর ভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, যদ্যপি কেহ তাহাই আদর্শ স্বরূপ রাখিয়া দেন, তাহা হইলেও কল্যাণের ইয়ত্তা থাকিবে না। এতদ্দ্বারা এ কথা তিনি স্পষ্ট বুঝিবেন যে, ঈশ্বরের

হাতে পড়িয়া থাকিলে তিনি অতি সামান্য ব্যক্তিকেও অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিতে পারেন। পরমহংসদেবকে কি গুণে আমরা ঈশ্বর স্থানে বসাইয়াছি? অবশ্য তাহার কারণ আছে। কারণ না থাকিলে আমরা সর্ব্ব সাধারণের সমক্ষে হাস্যাস্পদ হইব, এ কথা কি এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান হয় নাই? এ কথা কি বুঝিতে অপারক যে, ইহা দ্বারা সামাজিক প্রতিপত্তির কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইবে। বন্ধু বান্ধবেরা মনুষ্য-পূজক বলিয়া গাল কাত করিয়া হাসিবে। কিন্তু এ সকল কথা আমাদের বিশ্বাসের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতেছে। মনে হয়, যাহাদের এই প্রকার ভাব, তাহারা নিতান্ত অজ্ঞান, ঈশ্বর বিমুখ ব্যক্তি বলিয়া তাহাদের জন্য দুঃখিত হইয়া থাকি।

যদ্যপি কাহারও গুরু না থাকেন, তিনি ঈশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিলে একদিন অবশ্য গুরু মিলিবেই মিলিবে: আমরা জীবনে তাহা দেখিয়াছি। সাবধান! অবিশ্বাসীর উপায় নাই, তার্কিকের কল্যাণ নাই, গোঁড়াদিগের পরিণাম অতিশয় ভয়াবহ।

পরমহংসদেব সর্ব্বদা যে গীতগুলি গান করিতেন, তাহার কয়েকটী এই স্থানে প্রদত্ত হইল।

শক্তি বিষয়ক।

শ্যামা মা কি কল ক'রেছে, কালী মা কি এক কল করেছে;
চৌদ্দ পুয়া কলের ভিতর, কত রঙ্গ দেখাতেছে।
যে কলে চিনেছে তারে, কল হ'তে হবে না তারে,
কোন কলের ভক্তি ডোরে, আপ্‌নি শ্যামা বাঁধা আছে।
যতক্ষণ কালী কলে রয়, কলের কল স্ববশে রয়,
কমল বলে কালী গেলে, কেউ না যায় সে কলের কাছে।

কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী;
লম্ফে ঝম্ফে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দেও জননী।
লম্ফে ঝম্ফে কম্ফে ধরা, অসি ধরা করালিনী,
তুমি ত্রিগুণধরা, পরাৎপরা ভয়ঙ্করা কাল কামিনী;
সাধকেরই বাঞ্ছা পূর্ণ, কর নানারূপ ধারিণী,
কভু কমলের, কমলে নাচ মা, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী।

শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়ি-খানি উড়্‌তেছিল ;
কলুষের কু-বাতাস পেয়ে, গোঁপ্তা খেয়ে প'ড়ে গেল।
মায়া কান্নি হ'লো ভারি, আর আমি উঠাতে নারি ;
দারা সুত কলের দড়ি, ফাঁস্ লেগে সে ফেঁসে গেল।
জ্ঞান-মুণ্ড গ্যাছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অম্‌নি পড়ে ;
মাথা নেই সে আর কি উড়ে, সঙ্গের ছ'জন জয়ী হ'ল।
ভক্তি ডোরে ছিল বাঁধা, খেল্‌তে এসে লাগ্‌লো ধাঁধা ;
নরেশচন্দ্রের হাসা কাঁদা, না আসা এক ছিল ভাল।

ভাবিলে ভাবের উদয় হয়, ভাবিলে ভাবের উদয় হয় ;
যে জন কালীর ভক্ত, জীবন্মুক্ত, নিত্যানন্দময়।
যেমন ভাব, তেমন লাভ, মূল সে প্রত্যয়।
কালী পদে সুধা হ্রদে চিত্র * ডুবে রয়, যদি চিত্র ডুবে রয়,
তবে জপ যজ্ঞ পূজা বলি কিছুই কিছু নয়।

আপনাতে আপনি থেকো, যেও না মন কার ঘরে।
যা চাবি তাই ব'সে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে,
পরম ধন এই পরেশ মণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
কত মণি প'ড়ে আছে, আমার চিন্তামণির নাচদুয়ারে।

---

* পরমহংসদেব চিত্ত শব্দ প্রয়োগ না করিয়া চিত্র শব্দ ব্যবহার করিতেন বলিয়া অনেকেই তাহার উচ্চারণ দোষ ধরিতেন ; কিন্তু স্থূল বুদ্ধি ব্যক্তিরা ভাবুকের ভাব উপলব্ধি করিতে কোন কালেই সক্ষম নহেন। চিত্ত শব্দে মন। কালী পাদপদ্মে মন মগ্ন হইলে যে, সকল কার্য্য স্থগিত হইয়া যায়, তাহা নহে। কারণ, মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই তিন লইয়া মনুষ্যদিগের কার্য্য হয়। কোন বিষয়ে মন সংযোগ হইলে বুদ্ধি এবং অহঙ্কারের কার্য্য রহিত হইয়া যায় তাহা নহে। অতএব কালীপদে মন মগ্ন হইলেই যে কার্য্য উঠিবে তাহার হেতু নাই। চিত্র শব্দের দ্বারা প্রকৃত ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। চিত্র অর্থে ছবি। মনুষ্য রূপের প্রতিরূপ জীবাত্মাকে কহা যায়। সেই জীবাত্মা, মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কারের সমষ্টিকে নির্দ্দেশ করা হয়। জীবাত্মায় পরমাত্মায় মিলনকে সমাধি কহে। তদবস্থায় আর বহির্জ্ঞান থাকে না, কার্য্য করিবে কে ?

যা অনায়াসে হয় তাই কর রে ?
কাজ কি আমার কোশাকুশি, আয় মন বিরলে বসি,
ভাব শ্যামা এলোকেশী, বারাণসী পাবি রে।
ভস্মমাখা ত্রিলোচন, শিবের কোন পুরুষে ছিল ধন,
শ্যামা নিধনের ধন, তাই সদা জপ রে।

তার তারিণী।
এবার ত্বরিত করিয়ে, তপন তনয়-ত্রাসে-ত্রাসিত প্রাণ যায়।
জগত অম্বে জন পালিনী, জন মোহিনী জগত জননী ;
যশোদা জঠরে জনম লইয়ে, করিলে হরি লীলে।
বৃন্দাবনে রাধা বিনোদিনী, ব্রজবল্লভ বিহার কারিণী ;
রসরঙ্গিনী রসময়ী হ'য়ে, রাস করিলে লীলাপ্রকাশ।
গিরিজা গোপজা, গোবিন্দ মোহিনী, তুমি মা গঙ্গে গতি দায়িনী ;
গান্ধার্ব্বিকে গৌরবরণী, গাওয়ে গোলকে গুণ তোমার।
শিবে সনাতনী, সর্ব্বাণী, ঈশানী, সদানন্দময়ী সর্ব্বস্বরূপিণী ;
সগুণা নির্গুণা সদাশিব প্রিয়া, কে জানে মহিমা তোমার।

যশোদা নাচা'ত গো মা ! বলে নিলমণি ; গো মা—
সে বেশ লুকালে কোথা করাল বদনী।
একবার নাচ গো শ্যামা,—
হাসি বাঁসি মিশাইয়া ; মুণ্ডমালা ছেড়ে, বনমালা পরে ;
অসি ছেড়ে বাঁশি লয়ে ; আড়্ নয়নে চেয়ে চেয়ে ; গজমতি নাশায় ছুলুক ;
যশোদার সাজান বেশে ; অলকা আবৃত মুখে ; অষ্ট নায়িকা, অষ্ট সখি হোক ;
যেমন করে রাসমণ্ডলে নেচেছিলি ; হৃদি বৃন্দাবন মাঝে ; ললিত ত্রিভঙ্গঠামে ;
চরণে চরণ দিয়ে ; গোপীর মন ভুলান বেশে ; তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে ;
(দেখে নয়ন মন সফল করি) বড় সাধ আছে মনে ;
তোর শিব বলরাম হোক, (হেরি নীলগিরি আর রজত গিরি)
একবার বাজা গো মা ;—(সেই মোহন বেণু)
যে বেণু রবে ধেনু ফিরাতিস্ ; সেইমোহন বেণু,
যে বেণু রবে যোগীর মন ভুলাতিস্ ; যে বেণু রবে যমুনায় উজান ধরিত ;

বাজুক তোর বেণু বলায়ের শিঙ্গে।
শ্রীদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে গো মা;
তা থেইয়া তা থেইয়া তা তা, থেই থেই বাজত নূপুর ধ্বনি।
শুন্‌তে পেয়ে, আস্‌তো ধেয়ে, ব্রজের রমণি ॥ (গো মা)
গগণে বেলা বাড়িত, রাণী ব্যাকুল হইত;
বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর ননী।
এলাইয়ে চাঁচর কেশ রাণী বেঁধে দিত বেণী ॥ (গো মা)

এবার কালী তো'কে খাব।
গণ্ড যোগে জনমিলে সে যে হয় মাথেকো ছেলে;
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা! দুটোর একটা করে যাব ॥
ডাকিনী যোগিণী দুটো, তরকারী বানায়ে খাব।
তোর মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সাম্ভার চড়াবো। (বনমলা পরাইব)
খাব খাব বলি গো মা! উদরস্থ না করিব,
হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মন মানসে পূজিব।
হাতে কালী মুখে কালী মা! সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব;
যখন আস্‌বে শমন ধত্তে কেশে, সেই কালী তার মুখে দিব।

এবার আমি ভাল ভেবেছি;
ভাল ভাবীর কাছে ভাব পেয়েছি।
যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি;
আমি কিবা রাত্রি কিবা দিবা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা ক'রেছি।
সোয়াগা গন্ধক দিয়ে খাসা রং চড়াইয়েছি;
এবার ভাল ক'রে মেজে ল'ব অক্ষ দুটী ক'রে কুঁচি।

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে, আনন্দে মগনা;
সুধা পানে ঢল ঢল কিন্তু ঢলে পড়ে না মা!
বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগল পারা, লজ্জা ভয় ত মানে না মা!

আয় মন বেড়াতে যাবি ; (যদি না বেড়ালে তুই রইতে নারিস্)
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা ভক্তি খোঁটায় বেঁধে থুবি ;
জ্ঞান খড়্গো বলি দিয়ে উভয়ে কৈবল্যে দিবি।
শুচি অশুচীরে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি ;
দুই সতীনে পিরীত হলে, তবে শ্যামা মাকে পাবি।
রামপ্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথায় রেখেছি ;
এবার কালীর নাম ব্রহ্ম জেনে কর্ম্মাকর্ম্ম সব ছেড়েছি।

সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী ব'লে ;
মন মাতালে মাতাল বলে, সব মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মসলা দিয়ে মা !
জ্ঞান শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটি, পান করে মোর মন মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা, আমি শোধন করি বলে তারা মা,
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে।

মা ! ত্বং হি তারা। (আমার)
তুমি ত্রিগুণ ধরা পরাৎপরা।
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদি মূলে গো মা,—
থাক সর্ব্ব ঘটে, অক্ষপুটে, সাকার আকার নিরাকারা।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা,—
সর্ব্বজীবের ত্রাণকর্ত্রী, সদা শিবের মনোহরা।

(মা তোদের) ক্ষেপার হাট বাজার, গুণের কথা ক'ব কার।
তোরা দুই সতীনে, কেউ বুকে কেউ, মাথায় চড়ে তাঁর।
কর্ত্তা যিনি ক্ষেপা তিনি, ক্ষেপার মূলাধার ; (মা তারা)
চাকলা ছাড়া চ্যালা দুটো সঙ্গে অনিবার।
গজ বিনে গো আরোহণে, ফিরিস্ কদাচার, (মা তারা)
মণি মুক্তা ছেড়ে পরিস্ গলে, নর-শির হার।
শ্মশানে মশানে ফিরিস্, কার্ বা ধারিস্ ধার, (মা তারা)
রাম প্রসাদকে ভব-ঘোরে কর্ত্তে হবে পার।

মজ্‌লো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে।
বিষয় মধু তুচ্ছ হ'লো, কামাদি রিপু সকলে॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালোয় কাল মিশে গেল;
পঞ্চ তত্ত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে।
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এতদিনে,
দুখসুখ সমান হ'ল, আনন্দ সলিল স্থলে॥

গয়া গঙ্গা প্রভাস আদি, কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে, অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সেকি চায়।
সন্ধ্যা যার সন্ধানে ফিরি, কভু সন্ধি নাহি পায়॥
কালী নামে কত গুণ, কেবা জান্তে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব পঞ্চ মুখে গুণ গায়॥
জপ যজ্ঞ পূজা বলি, আর কিছু না মনে লয়।
মদনের জপ যজ্ঞ, ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥

যখন যেরূপে কালী রাখিবে আমারে।
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে॥
বিভূতি বিভূষণ, রতন মণি কাঞ্চন।
বৃক্ষ মূলে বাস, রতন সিংহাসনোপরে॥

নামেরই ভরসা কেবল কালী গো তোমার।
কাজ কি আমার কোষাকুশি, দেঁতোর হাসি লোকাচার॥
নামেতে কাল পাশ কাটে, জোটে তা দিয়েছে র'টে;
আমি তো সেই জ'টের মুটে, হ'য়েছি আর হ'ব কার।
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে;
নিতান্ত ক'রেছি শিবে, শিবের বচন সার॥

দুর্গা দুর্গা বলে, মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।

আমি নাশি গো, ব্রাহ্মণ; হত্যা করি ভ্রূণ, সুরা পান আদি বিনাশি নারী,—
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি॥

গো আনন্দময়ী হয়ে মা! আমায় নিরানন্দ করো না।
তপন-তনয়, আমায় মন্দ কয়, কি বলিবি তাকে বল না॥
ভবানী বলিয়ে, ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা;
অকূল পাথারে ডুবাবি আমারে, স্বপনেও তাতো জানি না,
আমি অহর্নিশি, দুর্গা নামে ভাসি, দুঃখ রাশি তবু গেল না;
আমি যদি মরি, ও হরসুন্দরী, দুর্গা নাম কেউ লবে না॥

বল রে শ্রীদুর্গা নাম।

দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, পথে চলে যায়, শূল হস্তে মহাদেব রক্ষা করেন তায়।
শঙ্করী হইয়ে মাগো গগনে উড়িবে, মীন হয়ে রব জলে নখে তুলে লবে।
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যাবে এ পরাণী, সে সময়ে দিও রাঙ্গা চরণ দু'খানি।
যখন বসিবে মাগো শিব সন্নিধানে, বাজন নূপুর হয়ে বাজিব চরণে।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি মা সকল,
তোমা হ'তে ব্রহ্মা বিষ্ণু, দ্বাদশ গোপাল।

কে! মা এলি গো, গিরে দাদার বেটী।
দোনো ছোক্‌রা বি সাথ্‌, দোনো ছুক্‌রী বি সাথ্‌
আর এক ব্যাটা জুল্‌পি কাটা কাম্‌ড়ে নিল টুঁটী॥

রাধা কৃষ্ণ ও অন্যান্য বিষয়ক গীত।

প্রেম নগরে রাই মহাজন, তস্য খাতক শ্রীহরি।
কস্য কর্জ্জ পত্র লিখে, দিয়েছেন বংশিধারী॥
খৎ দেখালে হবে বা কি? ওয়াশীল শূন্য বাকীর বাকী;
সম্ভাবন তার আছে বাকি, কেবল বাঁশের বাঁশরী।
পরিশোধের কথা আছে, দিবে ধড়া চূড়া বেচে;
তস্য খতে লেখা আছে, ইসাদী অষ্টমঞ্জরী॥

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই।
শুদ্ধ ভক্তি দিতে কাতর হই॥
আমার ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়, সে যে হয় রে ত্রৈলোক্য জয়ী।
ভক্তির কথা শুন বলি চন্দ্রাবলী, ভক্তি মিলে কভু ভক্তি মিলে কই;
ভক্তির কারণে পাতাল ভুবনে, বলির দ্বারে আমি দ্বারি হয়ে রই।
শুদ্ধ ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে, গোপ গোপী বিনে অন্যে নাহি জানে;
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে, পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই॥

কে জানে তোমার মায়া, ওহে শ্রীহরি।
পুরুষ প্রকৃতি হও কভু ত্রিপুরারী॥
কভু ব্যাঘ্র চর্ম্ম পর, কভু বা মুরলী ধর;
কভু হও নর-হর, রণস্থলে দিগম্বরী॥
তব মায়ায় বদ্ধ বলি, ত্রিপাদ ভূমি দিবে বলি,
ছলনা করিয়ে ছলি, পাঠাইলে নাগপুরী।
জয় বলে রামারাম, আকার ভেদ, ভেদ নাম,
যেই শ্যামা সেই শ্যাম, ভাব মন ঐক্য করি॥

এসে ঠেকেছি যে দায়, সে দায় কব কায়।
যার দায় সেই জানে, পর কি জানে পরের দায়॥
হয়ে বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি;
ভয়ে মরি লাজে মরি, নারী হওয়া একি দায়।

আমার কি ফলের অভাব, তোরা এলি বিফল ফল যে লয়ে;
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল, রাম কল্পতরু রোপিছি হৃদয়ে।
শ্রীরাম কল্পতরু বৃক্ষ মূলে রই, যে ফল বাঞ্ছা করি, সে ফল প্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কই, ও ফল গ্রাহক নই, যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে।

ভাব শ্রীকান্ত নর-কান্ত কারীরে।
নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবি॥
ভাবিলে ভব ভাবনা যায় রে—তারে অপাঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে

এলি কি তত্ত্বে, এ মর্ত্ত্যে, কুচিত্ত কুবৃত্ত করিলে কি হবে রে,—
উচিত তো নয় দাশরথিরে ডুবাবি রে;
কর এ চিত্ত, প্রাচিত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে।

কীর্ত্তন।

দে দে দে, মাধব দে।
আমার মাধব, আমায় দে, দিয়ে বিনা মূলে কিনে নে—
মীনের জীবন, জীবন যেমন, আমার জীবন মাধব তেমন।
তুই লুক্কাইয়ে রেখেছিস্ (ও মাধবী)—
আমি বাঁচি না, বাঁচি না,
(মাধবী ও মাধবী মাধব বিনে, মাধব অদর্শনে).

শ্যাম যদি মোর হ'তো মাথার চুল।
যতন ক'রে বাঁধতুম্ বেণী সই, দিয়ে বকুল ফুল।
(কেশব-কেশ যতনে বাঁধতুম্ সই,
কেউ নকৃতে পারত না সই,—শ্যাম কাল আর কেশ কাল)—
কেউ নকৃতে পারত না—
কালয় কাল মিশে যেতো গো—কেউ নকৃতে;—
শ্যাম যদি মোর ব্যাসর হইতো, নাসা মাঝে সতত রহিতো,—
অধর চাঁদ অধরে র'ত, সই।
যা হ'বার নয়, তা মনে হয় গো—
শ্যাম কেন ব্যাসর হবে সই?—
শ্যাম যদি মোর কঙ্কন হ'তো, বাহুমাঝে সতত রহিত—
কঙ্কন নাড়া দিয়ে চলে যেতুম সই, (বাহু নাড়া দিয়ে)
শ্যাম কঙ্কন হাতে দিয়ে, চলে যেতুম সই, (রাজপথে)—

ঘরে যাবই না গো।
যে ঘরে কৃষ্ণ নামটী করা দায়;—
যেতে হয় তো তোরাই যা, গিয়ে বলবি,
যার রাধা তার সঙ্গে গেল।

তোদের হ'ল বিকি কিনি, আমার হ'ল নীলকান্তমণি।
যদি কারুর বাড়ী যাই, বলে এল কলঙ্কিনী রাই।
যদি চাই মেঘপানে, বলে কৃষ্ণকে পড়েছে মনে।
যদি পরি নীল বসন, বলে ঐ কৃষ্ণের উদ্দীপন।
যখন থাকি রন্ধন শালে, কৃষ্ণ জপ মনে হ'লে, আমি কাঁদি সখি ধূঁয়ার ছলে।

দে দে দে, বাঁশী দে।
বাঁশী তো মথুরার নয়,—
রাধা নামের সাধা বাঁশী, বাঁশী তো মথুরার নয়—
তুই থাক্ না কেন শ্যাম, বাঁশী দে—
বাঁশী দে, চূড়া দে, তোর মা বলেছে, পীত ধড়া দে,—
(যে ধড়ায় ননী বেঁধে দিতো রে,)
তোর মা নন্দরাণী, এখন তো বিনে পথের কাঙ্গালিনী; তোর মা বলেছে,—
দে দে রেয়ের গাঁথা চিকণ মালা দে, তোর পিরীতি ফিরায়ে নে।

একটী নবীন রাখাল।
তোমার শ্রীদাম হবে কি সুবল হবে॥
সে যে কাঁদ্‌ছে যমুনার ঘাটে, একটী নূতন বৎস কোলে লয়ে।
কানাই কানাই বল্‌তে চায়, তার "কা" বই কানাই বেরায় না।

বল্‌তে ডরাই, না বল্লেও ডরাই;
জ্ঞান হয় তোমায় হারাই হারাই।
আমরা জানি যে মন্‌তোর্, দিলাম তোকে সেই মোন্তর্
এখন মন তোর্, আমরা যে মন্ত্রে বিপদে তরি তরাই।

কে কানাই নাম ঘুচালে তোর।
কোথায় রে তোর পীত ধড়া, কে নিল তোর মোহন চূড়া,
নদে এসে ন্যাড়া মূড়া, প'রেছ কৌপীন ডোর।
অশ্রু কম্প স্বর ভঙ্গ, পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ, সঙ্গে লয়ে সাঙ্গ পাঙ্গ,
হরি নামে হ'য়ে ভোর।

তোমরা দু'ভাই পরম দয়াল হে প্রভু গৌর নিতাই।
(অধম তারণ হে প্রভু গৌর নিতাই)
আমি গিয়েছিলাম কাশীপুরে, আমায় কয়ে দিলে বিশ্বেশ্বরে,
সেই নন্দের নন্দন শচীর ঘরে। (আমি জেনেছি হে)
আমি গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই, কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই।
(তোমাদের মত)
তোমরা ব্রজে ছিলে কানাই বলাই, এখন নদে এসে হ'লে গৌর নিতাই।
(সে রূপ লুকায়ে)
তোমার ব্রজের খেলা ছিল দৌড়াদৌড়ি, এখন নদের খেলা ধূলায় গড়াগড়ি।
(হরি বোল বলে।)
তোমার ব্রজে ছিল উচ্চ রোল, এখন নদে এসে কেবল হরি বোল।
(ওহে গৌর নিতাই)
তোমার সকল অঙ্গ গেছে ঢাকা, কেবল চেনা আছে দুটী নয়ন বাঁকা।
(ওহে দয়াল গৌর)
তোমার পতিত পাবন নাম শুনে, বড় ভরসা করেছি মনে।
(ওহে পতিত পাবন)
বড় আশা করে এলুম ধেয়ে, আমায় রাখ চরণ ছায়া দিয়ে।
(ওহে দয়াল গৌর)
জগাই মাধাই তরে গেছে, প্রভু সেই ভরসা আমার আছে।
তোমরা আচণ্ডালে দাও কোল, কোল দিয়ে বল হরি বোল।
(ওহে কাঙ্গাল ঠাকুর)

আমার গৌর নাচে।
নাচে সঙ্কীর্ত্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, ভক্তগণ সঙ্গে ॥
হরি বোল বলে বদনে গোরা, চায় গদাধর পানে;
গোরার অরুণ নয়নে, (আমার গোরার) বহিছে সঘনে,প্রেম ধারা হেম অঙ্গে।

নাচেরে।
শ্রীগৌরাঙ্গ আমার, রাধা প্রেমে বলে হরি হরি॥

উথলিল প্রেম সিন্ধু ব্রজলীলা মনে করি;
গোরা ক্ষণে বৃন্দাবন, করয়ে স্মরণ, ক্ষণে ক্ষণে বলে কোথায় প্রাণেশ্বরী।

যা'দের হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে তারা দু'ভাই এসেছে রে।
তারা—তারা দু'ভাই এসেছে রে।
যা'রা জীবের দুঃখ সৈতে নারে।
যা'রা ব্রজের মাখন চোর, যা'রা জাতি বিচার নাহি করে,
যা'রা অপামরে কোল দেয়, যা'রা আপনি মেতে জগৎ মাতায়,
যা'রা হরি হ'য়ে হরি বলে, যা'রা জগাই মাধাই উদ্ধারিল,
যা'রা মার খেয়ে প্রেম বিলায়, যা'রা আপন পর নাহি বাচে,
জীব তরাতে তারা দু'ভাই এসেছে রে। (নিতাই গৌর)

মধুর হরি নাম নিশেরে। জীব যদি সুখে থাক্‌বি।
সুখে থাক্‌বি বৈকুণ্ঠে যাবি ওরে মোক্ষ ফল সদা পাবি। (হরি নামের গুণে রে)
যে নাম শিব জপে, জপে দিবা নিশি, আজ সেই হরি নাম দিব তোকে।
দয়াল নিতাই ডাকে রে—
নারদ ঋষি—ঋষি দিবানিশি, যে নাম বিনা যন্ত্রে গান করে।
ও জীব আয় রে ও জীব আয় রে, কে পারে যাবি আয় রে;
হরি নামের তরি ঘাটে বাঁধা রে; আমার প্রেম দাদা নিতাই ডাকে।

রাধে গোবিন্দ বল।
রাধে গোবিন্দ বল, শ্রীরাধে গোবিন্দ বল।
রাধে রাধে রাধে বল, নাম ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে প্রাণ গেলেও ভাল থাক্‌লে ভাল।
রাধা নামে বাঁধ ভেলা, এড়াবি শমনের জ্বালা।
রাধা নাম সুধা নিধি, পান কর নিরবধি।
রাধা রাধা বল মুখে, জনম যাইবে সুখে।
রাধা নাম বল সদা, যাবে তোর ভবের ক্ষুধা।

তারে কৈ পেলুম সৈ আমি যার জন্যে পাগল।
ব্রহ্মা পাগল বিষ্ণু পাগল, আর পাগল শিব।

তিন পাগলে যুক্তি ক'রে ভাঙ্গ্‌ল নবদ্বীপ॥
আর এক পাগল দেখে এলুম বৃন্দাবন মাঝে।
রাইকে রাজা সাজাইয়া আপনি কোটাল সাজে
আর এক পাগল দেখে এলুম নবদ্বীপের পথে।
রাধা প্রেম শুধাবে বলে করোয়া কিস্তি হাতে।

সুরধনী তীরে হরি বলে কে রে।
প্রেম দাতা নিতাই এসেছে। (বুঝি)
তা নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে। (নিতাই নৈলে) (দয়াল নৈলে)

প্রেমধন বিলায় গৌর রায়।
দয়াল নিতাই ডাকে আয় আয় আয়।
শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেষে যায়।
আপনি পড়িয়ে নিতাই বলে সামাল রে ভাই। (প্রেমের বন্যা এলরে

বাউল সঙ্গীত।

আয় গো আয় গোষ্ঠে গোচারণে যাই।
শুন্‌চি নিধুবনে, রাখাল রাজা হবেন রাই, হায় শুন্‌তে পাই।
পীত ধড়া মোহন চুড়া, রাইকে পরাবে, হাতে বাঁশরি দিবে—
রাইকে রাজা সাজাইয়ে, কোটাল হবে প্রাণ কানাই।
ললিতা বিশাখা আদি অষ্ট সখি গণ রাখাল হবে পঞ্চজন—
তারা আবা দিয়ে বনে বনে ফিরাবে ধবলী গাই।

গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
তার হিল্লোলে পাষণ্ড দলন, এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়॥
মনে করি ডুবে তলিয়ে রোই, গৌর চাঁদের প্রেম কুমীরে গিলেচে গো সোই।
এমন ব্যাথার ব্যথী কে আর আছে, হাত ধরে টেনে তোলায়।